গীতা প্রতিটি মানুষেরই ধর্মশাস্ত্র। - মহর্ষি বেদব্যাস

শ্রীকৃষ্ণকালীন মহর্ষি বেদব্যাসের পূর্বে কোন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল না। শ্রুতজ্ঞানের এই পরম্পরা ভঙ্গ করে তিনি চার বেদ, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, ভাগবত এবং গীতার মত গ্রন্থগুলিতে পূর্বসঞ্চিত ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশিকে সঙ্কলিত করে শেষে নির্ণয় করলেন যে, '**সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ**।' সমস্ত বেদের প্রাণ, উপনিষদ্‌গুলিরও সার হল গীতা, যা গোপাল শ্রীকৃষ্ণ দোহন করে, অশান্ত জীবকে পরমাত্মার দর্শন এবং সাধনের স্থিতি, শাশ্বত শান্তির স্থিতিপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। সেই মহাপুরুষ নিজের গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতাকে শাস্ত্রের পরিভাষা দিয়ে স্তুতি করছেন এবং বলেছেন,

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈ: শাস্ত্রবিস্তরৈ:।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনি:সৃতা।।

(ম. ভা., ভীষ্মপর্ব, অ. ৪৩/১)

গীতা উত্তমরূপে মনন করে হৃদয়ে ধারণ করার যোগ্য, যা পদ্মনাভ ভগবানের শ্রীমুখ নি:সৃত বাণী, তাহলে অন্যশাস্ত্র সংগ্রহের কি প্রয়োজন?

গীতার সারাংশ নিম্নপ্রদত্ত শ্লোকটিতে স্পষ্ট হয়–

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম্,
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।

একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি,
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।।

(গীতা মাহাত্ম্য)

অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্র গীতারই দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীমুখে গায়ন করেছেন। প্রাপ্ত করার যোগ্য দেব একজন। সেই গায়নতে যে সত্য সম্বন্ধে বলেছেন, তা হল আত্মা। আত্মা ব্যতীত কিছুই শাশ্বত নয়। সেই গায়নতে মহাযোগেশ্বর কি জপ করতে বলেছেন ? ওঁ। অর্জুন ! ওঁ অক্ষয় পরমাত্মার নাম। ওঁ জপ কর ও ধ্যান আমার স্বরূপের কর। ধর্ম একটাই, গীতায় বর্ণিত পরমদেব একমাত্র পরমাত্মার সেবা। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক নিজের হৃদয়ে ধারণ কর। অতএব শুরু থেকেই গীতা আপনার শাস্ত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার বছর পরে পরবর্তী যে মহাপুরুষগণ একমাত্র ঈশ্বরকে সত্য বলেছেন, তাঁরা গীতারই সংবাদবাহক। ঈশ্বরের কাছ থেকেই লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখের কামনা, ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া, অন্য কাউকে ঈশ্বর না ভাবা–এ পর্যন্ত তো প্রত্যেক মহাপুরুষ বলেছেন; কিন্তু ঈশ্বরীয় সাধনা, ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, এটা কেবল গীতাশাস্ত্রেই ক্রমবদ্ধভাবে সুরক্ষিত। গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নে সুখ-শান্তি তো লাভ হয়ই, তার সঙ্গে এই শাস্ত্র অক্ষয় অনাময় পরমপদও প্রদান করে। প্রাপ্তির জন্য অধ্যয়ন করুন গীতার গৌরবপ্রাপ্ত টীকা '**যথার্থ গীতা**'।

যদ্যপি বিশ্বে সর্বত্র গীতা সমাদৃত, তথাপি এই শাস্ত্র কোন ধর্ম অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের সাহিত্য হতে পারেনি; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায় কোন না কোন কুরীতিতে জড়িত। ভারতবর্ষে প্রকাশিত গীতাশাস্ত্র বিশ্বের মনীষীদের কাঙ্ক্ষিত গ্রন্থ। গীতাশাস্ত্র আধ্যাত্মিক দেশ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গচ্ছিত গ্রন্থ। অতএব এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রের সম্মান দিয়ে উঁচু-নীচু, ভেদভাব এবং কলহ-পরম্পরায় পীড়িত বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তি প্রদান করার চেষ্টা করুন।

।। ওঁ।।

ধর্ম-সিদ্ধান্ত - এক

১. সকলেই প্রভুর পুত্র—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।।১৫/৭।।

সকল মানব ঈশ্বরের সন্তান।

২. মানব দেহের সার্থকতা—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।।৯/৩৩।।

সুখরহিত, ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু দুর্লভ মনুষ্য দেহলাভ করেছ আমার ভজন কর অর্থাৎ ভজনের অধিকার মনুষ্য মাত্রের।

৩. মানুষের জাতি কেবল দুটি—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ।।১৬/৬।।

দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব এই দুই প্রকার মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। যাঁর হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ কার্য করে তিনি দেবতা ও যার হৃদয়ে আসুরী সম্পদ্ কার্য করে সে অসুর। তৃতীয় কোন জাতি সৃষ্টিতে নেই।

৪. প্রত্যেক কামনা ঈশ্বর থেকে সুলভ—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-

মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ।।৯/২০।।

আমাকে ভজনা করে লোকে স্বর্গপর্যন্ত কামনা করে, আমি তাদের দিয়েও থাকি। অর্থাৎ সবকিছু একমাত্র পরমাত্মা থেকে সুলভ।

৫. ভগবানের শরণদ্বারা পাপনাশ–

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।।৪/৩৬।।

সকল পাপী থেকেও অধিক পাপিষ্ঠ জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হবে।

৬. জ্ঞান–

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ।।১৩/১১।।

আত্মার আধিপত্যে আচরণ, তত্ত্বের অর্থরূপ পরমাত্মার (আমার) প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান ও এর বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান। অতএব ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই জ্ঞান।

৭. ভজনের অধিকার সকলেরই–

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। ৯/৩০।।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।।৯/৩১।।

অত্যন্ত দুরাচারীও আমার ভজন করে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় ও সদা বিরাজমান শাশ্বত শান্তিলাভ করে। অতএব ধর্মাত্মা তিনি, যিনি একমাত্র পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত।

৮. ভগবৎপথে বীজের নাশ নেই–

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।।২/৪০।।

এই আত্মদর্শন ক্রিয়ার অল্পমাত্র আচরণও জন্মমৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে।

৯. ঈশ্বরের নিবাস–

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্‌সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ।।১৮/৬১।।

ঈশ্বর সকল ভূতপ্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌ ।।১৮/৬২।।

সর্বতোভাবে সেই একমাত্র পরমাত্মার শরণাগত হও। যাঁর কৃপাতে তুমি পরমশান্তি, শাশ্বত পরমধাম লাভ করবে।

১০. যজ্ঞ–

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ।।৪/২৭।।

সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম, মনের চেষ্টা জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত আত্মাতে সংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতীরুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।।৪/২৯।।

বহু যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন এবং কোন কোন যোগী প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন। অবস্থা উন্নত হওয়ার পর অপর প্রাণ এবং অপানবায়ুর গতিরোধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। এই প্রকার যোগসাধনার বিধি-বিশেষের নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ম।

১১. যজ্ঞ করবার অধিকার–

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌।

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ।।৪/৩১।।

যজ্ঞহীন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার মনুষ্যদেহ লাভ করে না অর্থাৎ যজ্ঞ করবার অধিকার তাদের সকলেরই, যারা মনুষ্যদেহ লাভ করেছে।

১২. ঈশ্বর দর্শন সম্ভব–

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ।।১১/৫৪।।

অনন্য ভক্তিদ্বারা আমি প্রত্যক্ষ করতে, জানতে এবং প্রবেশের জন্য সুলভ।

আশ্চর্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ।। ২/২৯।।

এই অবিনাশী আত্মাকে কোন বিরল ব্যক্তিই আশ্চর্যের মত দেখেন অর্থাৎ এটাই প্রত্যক্ষ দর্শন।

১৩. আত্মাই সত্য ও সনাতন–

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।।২/২৪।।

এই আত্মা সর্বব্যাপক, অচল স্থির এবং সনাতন। আত্মাই সত্য।

১৪. বিধাতা ও তাঁর সৃষ্টি নশ্বর–

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।। ৮/১৬।।

ব্রহ্মা ও তাঁর নির্মিত সৃষ্টি, দেবতা ও দানব দুঃখের কারণ, ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর।

১৫. দেবপূজা–

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ।। ৭/২০।।

কামনাদ্বারা যাদের বুদ্ধি অভিভূত, এরূপ মূঢ়গণই পরমাত্মা ভিন্ন অন্যান্য দেবতার পূজা করে।

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ।। ৯/২৩।।

দেবতাদিগের পূজারী আমারই পূজা করে; কিন্তু তা অবিধিপূর্বক সম্পাদিত হয়, তা-ই নষ্ট হয়ে যায়।

শাস্ত্রবিধির ত্যাগ-

অর্জুন! শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষগণ দেবতার, রাজসিক পুরুষ যক্ষ-রাক্ষসের এবং তামসিক পুরুষ ভূত-প্রেতের পূজা করে; কিন্তু-

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাং চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ।। ১৭/৬।।

তারা দেহরূপে স্থিত ভূতসমুদায়কে এবং অন্তর্যামী রূপে স্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) কৃশ করে। এদের তুমি অসুর জানবে অর্থাৎ দেবতাগণের পূজকগণও অসুরবৃত্তির অন্তর্গত।

১৬. অধম–

তানহং দ্বিষত: ক্রূরান্সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।।১৬/১৯।।

যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কল্পিত বিধিদ্বারা যজন অর্থাৎ যজ্ঞ করে, তারা ক্রুরকর্মা, পাপাচারী এবং মনুষ্য মধ্যে অধম। অন্য কেউ অধম নয়।

১৭. নির্ধারিত বিধি কি?

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ।। ৮/১৩।।

ওঁ যা অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, এর জপ ও একমাত্র পরমাত্মাকে (আমাকে) স্মরণ, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সংরক্ষণে ধ্যান।

১৮. শাস্ত্র—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্‌স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারত ।। ১৫/২০।।

এইরূপ অতি গোপনীয় শাস্ত্র আমার দ্বারা বলা হল। একথা স্পষ্ট হল যে, শাস্ত্র গীতা।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ।। ১৬/২৪।।

কর্তব্য-অকর্তব্যের নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব গীতার নির্ধারিত বিধিদ্বারা আচরণ করুন।

১৯. ধর্ম—

সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।।১৮/৬৬।।

সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণই ধর্মের মূলতত্ত্ব, সেই প্রভুকে লাভ করার নির্ধারিত বিধির আচরণই ধর্মাচরণ। (অধ্যায় ২, শ্লোক ৪০)

এবং যে আচরণ করে, সে অত্যন্ত পাপী হলেও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়। (অধ্যায় ৯, শ্লোক ৩০)

২০. ধর্ম কোত্থেকে লাভ করবেন?—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।।১৪/২৭।।

সেই অবিনাশী ব্রহ্মের, অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং অখণ্ড একরস আনন্দের আমিই আশ্রয় অর্থাৎ পরমাত্মস্থিত সদ্‌গুরুই এই সকলের আশ্রয়।

নোট ঃ বিশ্বের সমস্ত ধর্মের সত্যধারা গীতারই প্রসারণ।

।। ওঁ ।।

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধিপর্যন্ত মনীষীগণ দ্বারা প্রদত্ত কাল-ক্রমানুসারে সন্দেশ

শ্রী পরমহংস আশ্রম জগতানন্দ, গ্রাo-পোo বরৈনী, কছবা, জেলা-মির্জাপুর (উoপ্রo) নিজের নিবাস অবধিতে স্বামী অড়গড়ানন্দজী প্রবেশ দ্বারের নিকট এই তালিকাটি গঙ্গা দশহরার (১৯৯৩) পবিত্র পর্বে বোর্ডে অঙ্কিত করিয়েছিলেন।

ওঁ

।। বিশ্বগুরু ভারত।।

* **সৃষ্টির আদিশাস্ত্র-**

  'ইমং বিবস্বতে যোগম্' (গীতা ৪/১)– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই অবিনাশী যোগ আমি কল্পের আরম্ভে সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য নিজপুত্র মনুকে বলেছিলেন, যাঁর অনুসারে একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, পরমতত্ত্ব; তিনি প্রতিটি রেণুতে ব্যাপ্ত। যোগ-সাধনা দ্বারা সেই পরমাত্মা দর্শন, স্পর্শ এবং প্রবেশের জন্য সুলভ। ভগবান দ্বারা উপদিষ্ট সেই আদিজ্ঞান বৈদিক ঋষিগণ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অক্ষুন্নরূপে প্রবাহিত।

* **বৈদিক ঋষি (অনাদিকাল–নারায়ণ সূক্ত)**

  প্রতিটি অণু পরমাণুতে ব্যাপ্ত ব্রহ্মই সত্য। তাঁকে না জানা পর্যন্ত মুক্তিলাভের আর অন্য কোন উপায় নেই।

* **ভগবান শ্রীরাম (ত্রেতা- লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে-রামায়ণ)**

  একমাত্র পরমাত্মার ভজন না করে যে কল্যাণকামনা করে সে মূঢ়।

* **যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (৫২০০ বছর পূর্বে -গীতা)**

  পরমাত্মাই সত্য। চিন্তনের পূর্তিকালে সেই সনাতন ব্রহ্মের প্রাপ্তি সম্ভব। দেবী-দেবতাগণের পূজা মূঢ়বুদ্ধির পরিচয়।

*** মহাত্মা মূসা (৩০০০ বছর পূর্বে-ইহুদী ধর্ম)**

তুমি ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা আরোপ না করে তাঁর মূর্ত্তি গড়েছ-সেই জন্য তিনি অসন্তুষ্ট। প্রার্থনা কর।

*** মহাত্মা জরথুস্ত্র (২৭০০ বছর পূর্বে-পারসী ধর্ম)**

অহুরমজ্দার (ঈশ্বরের) উপাসনা করে হৃদয়স্থিত বিকারগুলির নাশ কর, এই বিকারগুলিই দুঃখের কারণ।

*** ভগবান মহাবীর (২৬০০ বছর পূর্বে-জৈন গ্রন্থ)**

আত্মাই সত্য। কঠোর তপস্যাদ্বারা তাঁকে এই জন্মেই জানা সম্ভব।

*** গৌতম বুদ্ধ (২৫০০ বছর পূর্বে–মহাপরিনিব্বান সুত্ত)**

আমি সেই অবিনাশী পদলাভ করেছি, যা পূর্ব মনীষীগণ লাভ করেছেন। এটাই মোক্ষ।

*** যীশু খ্রিষ্ট (২০০০ বছর পূর্বে–খৃষ্টান ধর্ম)**

ঈশ্বরকে প্রার্থনা দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। আমার অর্থাৎ সদ্গুরুর সান্নিধ্যে যাও, তাহলে ঈশ্বরের পুত্র নামে অভিহিত হবে।

*** হজরত মহম্মদ সলল্লাহু০ (১৪০০ বছর পূর্বে–ইসলাম ধর্ম)**

‘লা ইলাহ ইল্লল্লাহ মুহম্মদুর রসুলল্লাহ্’–প্রতিটি অণু-পরমাণুতে খোদা (ঈশ্বর) পরিব্যাপ্ত, একমাত্র তিনিই পূজনীয়। মহম্মদ আল্লার সংবাদবাহক।

*** আদি শঙ্করাচার্য (১২০০ বছর পূর্বে)**

জগৎ মিথ্যা, সত্য কেবল হরি ও তাঁর নাম।

*** সন্ত কবীর (৬০০ বছর পূর্বে)**

‘রাম নাম অতি দুর্লভ, অওরন তে নহিঁ কাম। আদি মধ্য অওর অন্তহুঁ, রামহিঁ তে সংগ্রাম।।’ রামের সঙ্গে সংঘর্ষ কর, তিনিই কল্যাণ করেন।

* **গুরু নানক (৫০০ বছর পূর্বে)**

“**এক ওঁকার সতগুরু প্রসাদী।**” একমাত্র ওঁকারই সত্য; কিন্তু সেটা সদ্‌গুরুর কৃপাসাপেক্ষ।

* **স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (২০০ বছর পূর্বে)**

অজর, অমর, অবিনাশী একমাত্র পরমাত্মার উপাসনা কর। সেই ঈশ্বরের মুখ্য নাম ওঁ।

* **স্বামী শ্রী পরমানন্দজী (১৯১১-৬৯ খ্রীঃ)**

ভগবান যখন দয়া করেন, তখন শত্রু মিত্র হয়ে যায়, বিপত্তি সম্পত্তি হয়ে যায়। ভগবান সর্বত্র থেকে দেখেন।

।।ওঁ।।

অনুক্রমণিকা

।। ওঁ ।।

প্রাক্কথন

বস্তুতঃ গীতাশাস্ত্রের উপর টীকা (ভাষ্য, ব্যাখ্যা) লেখার এখন আর কোন প্রয়োজন বলে মনে হয় না, তার কারণ এর উপর শতাধিক টীকা লেখা হয়ে গেছে, সে সকলের মধ্যে পঞ্চাশের উপর কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। গীতার বিষয়-বস্তু নিয়ে আনুমানিক পঞ্চাশ মত থাকা সত্ত্বেও সকলেরই আধারশিলা একমাত্র এই গীতা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কেবল একটি বিষয়, সেই ঈশ্বর-জ্ঞান তত্ত্ব, আত্মজ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধেই গীতায় উল্লেখ করেছেন, তবে এইরূপ মতভেদ কেন? বস্তুতঃ বক্তা সর্বদা এক নিশ্চিত ভাবকেই ব্যক্ত করেন; কিন্তু শ্রোতা দশজন হলে তাঁরা তাঁদের ভিন্নভিন্ন ধারণা-শক্তির জন্য দশ প্রকারের ভাবার্থ গ্রহণ করে থাকেন। ব্যক্তির বুদ্ধির উপর তামসিক, রাজসিক অথবা সাত্ত্বিক গুণের যতটা প্রভাব থাকে, তিনি সেই স্তর থেকেই বিষয়-বস্তু গ্রহণ করতে পারেন। এর বেশী তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। অতএব মতভেদ হওয়াটা স্বাভাবিক।

বিভিন্ন মতবাদের জন্য অথবা কখনও কখনও একটা সিদ্ধান্তকেই ভিন্নভিন্ন কালে ও ভিন্নভিন্ন ভাষাতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার জন্য সাধারণ মানুষ সংশয়ে পড়ে যায়। বহু টীকার মধ্যে সেই সত্যধারাও প্রবাহিত, কিন্তু শুদ্ধ অর্থযুক্ত একখানি টীকা যদি সহস্র টীকার মধ্যে রাখা থাকে, তবে, চেনা দুঃসাধ্য হবে যে, যথার্থ কোনটি? বর্তমানে গীতার অনেক টীকা বাজারে উপলব্ধ এবং প্রত্যেক টীকাকার স্ব স্ব অভিমতদ্বারা সত্যের উদ্‌ঘোষ করে চলেছেন; কিন্তু একথা সত্য যে, গীতার বাস্তবিক অর্থ থেকে তারা প্রায় সকলেই বহুদূরে আছেন। নিঃসন্দেহে কিছু মহাপুরুষ সত্যের স্পর্শ করেছেন, কিন্তু যে কোন কারণে হোক তাঁরা সেটি সমাজের সমক্ষে প্রস্তুত করতে পারেন নি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশয় হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন মহাযোগসিদ্ধ পুরুষ। তিনি যে স্তরের বক্তব্য দিয়েছেন ক্রমশঃ চলে সেই স্তরে পৌঁছলেই বলা যেতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন,

তখন তাঁর মনোগতভাব কি ছিল? অন্তঃস্থিত সমস্তভাব ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তার কিছু অংশ ভাষায় ব্যক্ত হয়, কিছু ভাব-ভঙ্গিমা দ্বারা ও অবশেষ ক্রিয়াত্মক– সাধনা পথের পথিকই সেই নিশ্চিত ক্রিয়াত্মক পদ্ধতিদ্বারা অগ্রসর হওয়ার পর বিষয়-বস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করতে পারেন। যে স্তরে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছেছিলেন, নির্দিষ্ট ক্রিয়াত্মক পদ্ধতির সাহায্যে অগ্রসর হতে হতে সেই পূর্ণ অবস্থা বা স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষই জানতে পারেন যে, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এই গীতা বাস্তবিকে কি বলছে? উক্ত স্থিতিপ্রাপ্ত, যোগযুক্ত মহাপুরুষ কেবল গীতার পঙ্‌ক্তিসমূহই পুনরাবৃত্তি করেন না, বরং তার আভ্যন্তরিক অর্থও বলে দেন; কারণ যে দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে ছিল, বর্তমানের সেই স্তরের মহাপুরুষের সমক্ষেও সেই দৃশ্যই বিদ্যমান, তাই যা তিনি সম্যক্ দেখছেন, অনুগামীদেরও দেখিয়ে দেবেন এবং হৃদয়াভ্যন্তরে সেই ভাব জাগিয়েও দেবেন ও সুনির্দিষ্ট মঙ্গলময় পথে পরিচালনও করবেন।

‘পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ’ও উক্ত স্তরের মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর বাণী ও অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা গীতার যে শাশ্বত ভাবার্থ প্রাপ্ত হয়েছে, তারই সঙ্কলন এই ‘যথার্থ গীতা’। এর মধ্যে স্বীয় কোন অভিমত নেই। এই গীতার সম্পূর্ণ বিষয় ক্রিয়াত্মক। সাধনে প্রবৃত্ত প্রত্যেক পথিককে সেই নিশ্চিত পরিধি অতিক্রম করতে হয়। যতক্ষণ সেই সুনিশ্চিত পথ থেকে সাধক দূরে, ততক্ষণ একথা সত্য এবং স্পষ্ট যে, সে ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত নয়, বরং কোন না কোন প্রকার ব্যর্থ ঢোল অবশ্যই পিটিয়ে চলেছে। অতএব কোন মহাপুরুষের আশ্রয় নিন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোন সত্য বলেননি, বরং বলেছেন, ‘**ঋষিভির্বহুধা গীতম্**’। ঋষিগণ বহুবার যে কথা বলেছেন, সেই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। তিনি একথা কখনও বলেননি যে, “সনাতন-শাশ্বত-সত্য জ্ঞানসম্বন্ধে কেবল আমিই জানি বা আমিই বলব।” বরং বলেছেন, “তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হও এবং নিষ্কপট সেবা-যত্নদ্বারা সেই জ্ঞানলাভ কর।” শ্রীকৃষ্ণ কেবল মহাপুরুষগণ দ্বারা ঘোষিত শাশ্বত সত্যই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

মূল গীতা সুবোধ্য সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ। শুধু এতে নিহিত যথার্থকেই গ্রহণ করেন, তবুও অতি সহজেই আপনাদের সকলের বোধগম্য হবে; কিন্তু আপনারা যেমন আছে ঠিক তেমনিই অর্থ গ্রহণ করেন না। উদাহরণার্থ, শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছেন–

'যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম।' তবুও আপনারা বলেন কৃষি করা কর্ম। যজ্ঞের অর্থ আগে স্পষ্টই বলেছেন যে– এই যজ্ঞে বহু যোগী প্রাণকে অপানে ও আরও অন্য-অন্য যোগী অপানকে প্রাণে আহুতি দেন, আবার অন্যান্য যোগীগণ প্রাণ-অপান দু-ই রুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান, আবার অন্য বহু যোগীগণ ইন্দ্রিয়ের সকল প্রবৃত্তি সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন। এই প্রকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণ-অপানের) চিন্তনকে যজ্ঞ বলে। মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমই যজ্ঞ। শাস্ত্রকার এইভাবে যজ্ঞ শব্দের অর্থ স্পষ্ট বলেছেন, তা সত্ত্বেও আপনারা বলেন, "বিষ্ণুর নিমিত্তে স্বাহা বলা, অগ্নিতে যব, তিল ও ঘৃতের আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ।" শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ একটা শব্দও কোথাও বলেন নি।

তবে কেন আপনারা বুঝতে পারেন না? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করার পরেও শুধু বাক্য-বিন্যাসই আপনাদের সম্বল হয়, ও আপনারা নিজেদের যথার্থ জ্ঞান থেকে শূণ্যই পান কেন? বস্তুতঃ জন্ম নেওয়ার পর বড় হয়ে মানুষ পৈতৃক সম্পত্তির অর্থাৎ ঘর, দোকান, জমি-জায়গা, পদ-প্রতিষ্ঠা, গরু-মহিষ, যন্ত্র-উপকরণ ইত্যাদির অধিকারী হয়। ঠিক এইভাবে কিছু কুরীতি, পরম্পরা, পূজা-পদ্ধতিও পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে পেয়ে থাকে। তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতা তো বহু পূর্বেই গোনা হয়েছিল, সমস্ত বিশ্বে এদের অগণিত রূপ নাম। শিশু যেমন যেমন বড় হয়, তেমন তেমন মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীদের এই দেবী-দেবতারই পূজা করতে দেখে। পরিবারে প্রচলিত নানান পূজা-পদ্ধতির গভীর প্রভাব তার মস্তিষ্কে পড়ে। পরিবারে দেবী-পূজার প্রাধান্য থাকলে 'দেবী-দেবী' করেই তার জীবন কাটে, আর যদি ভূত-পূজার প্রাধান্য দেখে, তাহলে 'ভূত-ভূত' করে তার জীবন কাটে। কেউ শিব, কেউ কৃষ্ণ, কেউ আর কিছু ধরেই থাকে, তাদের কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

এরূপ ভ্রান্ত মানুষের হাতে যদি গীতার মত কল্যাণকারক গ্রন্থ পড়েও যায়, তবুও তা তার বোধগম্য হবে না। পৈতৃক সম্পত্তি সে কদাচিৎ ছাড়তেও পারে; কিন্তু এই সকল গোঁড়ামী ও ধর্মের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার কিছুতেই ছাড়তে পারে না। পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে আপনি শত-সহস্র কিলোমিটার দূরে চলে যেতে পারেন; কিন্তু মন ও মস্তিষ্কে অঙ্কিত এই গোঁড়া বিচারধারা গুলি সেখানেও সঙ্গেই থাকে।

আপনি আপনার মন ও মস্তিষ্ককে তো আলাদা করে রাখতে পারেন না, অতএব আপনি যথার্থ শাস্ত্রকেও সেই গোঁড়া রীতি-নীতি, মান্যতা ও পূজা-পদ্ধতির অনুরূপই দেখতে চাইবেন। আপনার বিচার-বুদ্ধির অনুরূপ হলে আপনি স্বীকার করবেন, না হলে সে সমস্ত আপনার কাছে মিথ্যা প্রতীত হবে। এই সকল কারণে গীতার রহস্য আপনি বুঝতে পারেন না, রহস্য রহস্য রূপেই থেকে যায়। একে বাস্তবিক পরখ করেন মহাপুরুষ অথবা সদ্‌গুরু, তিনিই বলতে পারেন গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? জনসাধারণের পক্ষে এই বিষয় বুদ্ধির অতীত। এরজন্য সহজ উপায় হল, কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে গিয়ে বিষয় বস্তুর তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া ও এই কথাই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বার বার উল্লেখ করেছেন।

গীতাশাস্ত্র কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি, মত, পন্থ, দেশকাল বা কোন গোঁড়া সম্প্রদায়ের জন্য নয়। গীতা সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ধর্মগ্রন্থ। গীতাগ্রন্থ প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক স্তরের স্ত্রী-পুরুষের জন্য, সকলের জন্য। মানুষ মাত্রের জন্য। কেবল কারও মুখে শুনে অথবা কারও প্রেরণা অথবা প্রভাবে মানুষকে এমন কোন নির্ণয় নেওয়া উচিত নয়, যার প্রভাব তার নিজের অস্তিত্বের উপর প্রত্যক্ষভাবে পড়ে। পূর্বাগ্রহমুক্ত সত্যান্বেষীর জন্য এই আর্যগ্রন্থ আলোক-স্তম্ভ। হিন্দু বর্গের কথন হল– 'বেদই প্রমাণ।' বেদের অর্থ হল জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মা বোধ। সেই পরমাত্মা না সংস্কৃত ভাষাতে আছে ও না সংহিতায়। পুস্তক তো কেবল তাঁর সঙ্কেত করে। বস্তুতঃ পরমাত্মা হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

বিশ্বামিত্র ভগবদ্-চিন্তনে মগ্ন ছিলেন। তাঁর ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন– "আজ থেকে তুমি ঋষি।" বিশ্বামিত্র এতে সন্তুষ্ট হন নি, পূর্ববৎ ধ্যানমগ্নই ছিলেন। কিছু কাল পরে দেবতাগণের সঙ্গে ব্রহ্মা পুনরায় এসে বলেছিলেন–"আজ থেকে তুমি রাজর্ষি।" কিন্তু এই বরেও তিনি সন্তুষ্ট হন নি। ধ্যানস্থ ছিলেন। ব্রহ্মা দৈবী সম্পদ্ নিয়ে (দেবতাগণের সঙ্গে) পুনরায় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন– "আজ থেকে তুমি মহর্ষি।" বিশ্বামিত্র বলেছিলেন– "না না, আমাকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মর্ষি বলুন।" ব্রহ্মা বলেছিলেন– "এখনও তুমি জিতেন্দ্রিয় হওনি।" বিশ্বামিত্র পুনরায় ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। তপপ্রভাবে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে প্রচণ্ড তপাগ্নি নিঃসৃত হচ্ছিল। দেবতাদের অনুনয় করাতে তিনি আবার এসে বিশ্বামিত্রকে

বলেছিলেন—“এখন থেকে তুমি ব্রহ্মর্ষি।” তখন বিশ্বামিত্র বলেছিলেন—“যদি আমি ব্রহ্মর্ষি, তবে বেদ আমাকে বরণ করুক।” বেদ বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে উদ্‌ভূত হয়েছিল অর্থাৎ তিনি পূর্ণজ্ঞানী হয়েছিলেন। যে তত্ত্ব জানা ছিল না, তার সম্যক্ জ্ঞান হয়েছিল। বস্তুতঃ বেদ কোন গ্রন্থ নয়, এই জ্ঞানকে বেদ বলে। বিশ্বামিত্র যেখানে থাকতেন, বেদও সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকত।

সেই একই কথা শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন যে, “সংসার এক অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষ। ঊর্ধ্বে পরমাত্মা যার মূল, নিম্নে প্রকৃতিপর্যন্ত এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। যিনি প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে পরমাত্মাকে লাভ করেন; তিনিই বেদবিৎ। অর্জুন! আমিও বেদবিৎ।” অতএব প্রকৃতির প্রসার ও বিনাশের সঙ্গে পরমাত্মার অনুভূতিকেই বেদ বলে। হৈ অনুভূতি ঈশ্বরপ্রদত্ত। সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাপুরুষগণ অপৌরুষেয় হন। তাঁদের মাধ্যমে পরমাত্মাই কথা বলেন। তাঁরা পরমাত্মার আদেশ-নির্দেশ প্রসারক (ট্রান্সমিটার) হয়ে যান। কেবল শব্দজ্ঞান দ্বারা তাঁদের বাণীর মধ্যে নিহিত যথার্থকে পরখ করা যেতে পারে না। তাঁকে তাঁরাই অনুভব করতে পারেন, যাঁরা সেই নিশ্চিত ক্রিয়াত্মক পথে চলে সেই অপৌরুষেয় স্থিতিলাভ করেন, যাঁর পৌরুষ (অহং) পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়।

বস্তুতঃ বেদ অপৌরুষেয়; কিন্তু এর বক্তা শ’ দেড়শ মহাপুরুষই ছিলেন। তাঁদের বাণীর সংকলনকেই বেদ বলা হয়। কিন্তু যখন কোন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাও তার নিয়ম-কানুনও সেটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। মহাপুরুষের নামে জনসাধারণ সেই সকল নিয়ম-পালন করতে থাকে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সে সবের কোন সম্পর্ক নেই। আজকের যুগে মন্ত্রীদের আগে-পিছনে ঘোরে যারা তারাও অধিকারীদের দিয়ে নিজেদের কিছু কিছু কাজ করিয়ে নেয়। যদিও মন্ত্রীরা এই ধরণের নেতাদের চেনে না পর্যন্ত। এই ভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকারেরা মহাপুরুষদের নামে নিজেদের সুখসুবিধার রাস্তাও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল ব্যবস্থার সামাজিক উপযোগিতা তৎসাময়িক, বেদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। চিরন্তন সত্য উপনিষদেই সংগৃহিত। এই সকল উপনিষদের সারাংশই হল যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী ‘গীতা’। সারাংশতঃ “গীতা অপৌরুষেয় বেদ-রসার্ণব থেকে সমুদ্‌ভূত উপনিষদ্-সুধার সার-সর্বস্ব।”

এইরূপ যে মহাপুরুষ যিনি একবার পরমতত্ত্বলাভ করেন, তিনিই ধর্মগ্রন্থস্বরূপ। তাঁর বাণীর সঙ্কলন বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকনা কেন, তা শাস্ত্র নামে অভিহিত হবে। কিছু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের বক্তব্য এই যে– "কোরানে যা আছে, তা-ই সত্য। পুনরায় কোরান রচনা অসম্ভব।", "যীশুখৃষ্টকে বিশ্বাস না করলে স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব, কারন তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ছিলেন।", "পুনরায় এই স্তরের মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব।"–এই সকল উক্তি গোঁড়ামীর পরিচায়ক। যদি একবার সেই শাশ্বত-সনাতন-সত্য তত্ত্বের সহিত কারও সাক্ষাৎকার হয় তবে পুনরায় তদ্রূপ উৎকৃষ্ট এবং কল্যাণকর বিচার-ব্যবস্থা সম্ভব।

'গীতা' একমাত্র সার্বভৌম ধর্মগ্রন্থ। ধর্মের নামে প্রচলিত বিশ্বের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতার স্থান অদ্বিতীয়। গীতা কেবল ধর্মশাস্ত্রই নয়, বরং অন্যান্য যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নিহিত সত্যের মানদণ্ড গীতা। গ্রন্থটির সিদ্ধান্ত ও মর্মকথা এতই মৌলিক যে, অন্য যে কোন ধর্মগ্রন্থে অনুস্যূত সত্য সহজে অনাবৃত হয়ে ওঠে, পরস্পর বিরোধী বিচারসমূহের সমাধান হয়ে যায়। অন্যান্য প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে সংসারে সসম্মানে বেঁচে থাকার কলা-কৌশল ও কর্মকাণ্ডের বাহুল্য দেখা যায়। জীবনের স্তর সুন্দর, উন্নত ও আকর্ষক করবার জন্য সেগুলি সম্পাদন করা অথবা না করার রুচিকর ও ভয়ঙ্কর কাহিনীতে পূর্ণ সকল ধর্মগ্রন্থই। কর্মকাণ্ডের এই পরম্পরাকেই জনসাধারণ ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে। জীবন-নির্বাহের কলা-কৌশলের জন্য নির্মিত পূজা-পদ্ধতির মধ্যে দেশকাল ও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। ধর্মের নামে সমাজে মতভেদ ও কলহের এটাই একমাত্র কারণ। 'গীতা' এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থাগুলির ঊর্দ্ধে আত্মিক পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্রিয়াত্মক অনুশীলন মাত্র, এর একটি শ্লোকও ভৌতিক জীবন-যাপনজন্য নয়। এর প্রতিটি শ্লোক আপনাকে আন্তরিক যুদ্ধ 'আরাধনা'য় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত গীতা আপনাদের স্বর্গ অথবা নরকপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে ভ্রান্ত না করে, বরং সেই সনাতন অমরত্বের উপলব্ধি করায়, যারপর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থাকে না।

প্রত্যেক মহাপুরুষ নিজস্ব শৈলী ও কিছু কিছু বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে 'কর্ম', 'যজ্ঞ', 'বর্ণ', 'বর্ণসঙ্কর', 'যুদ্ধ', 'ক্ষেত্র', 'জ্ঞান'

ইত্যাদি শব্দের উপর বার বার জোর দিয়েছেন। এই সকল শব্দের বিশিষ্ট অর্থও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। পুনরাবৃত্তিতেও ভাষার শৈলী ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। ভাষান্তরের সময় উক্ত শব্দাবলীর যথার্থ অর্থ প্রয়োগের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আবশ্যক স্থানে উচিত ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। নিম্নলিখিত প্রশ্ন গীতার বৈশিষ্ট্য যা অতি আকর্ষক, যার বাস্তবিক অর্থ আধুনিক সমাজ ভুলে যেতে বসেছে। 'যথার্থ গীতা'য় এর বাস্তবিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণার্থ–

১. **শ্রীকৃষ্ণ**– এক যোগেশ্বর ছিলেন।

২. **সত্য**– আত্মাই একমাত্র সত্য।

৩. **সনাতন**– আত্মাই সনাতন, পরমাত্মাই সনাতন।

৪. **সনাতন ধর্ম**– পরমাত্মার সহিত মিলনের একমাত্র প্রক্রিয়া।

৫. **যুদ্ধ**–দৈবী ও আসুরী গুণসমূহের সংঘষই যুদ্ধ। দৈবী ও আসুরী অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তিকে বলে এবং এই দুটি শান্ত হওয়াই পরিণাম।

৬. **যুদ্ধস্থান**– মানবদেহ এবং মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহই যুদ্ধস্থল।

৭. **জ্ঞান**– পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই জ্ঞান।

৮. **যোগ**– সংসারের সংযোগ-বিয়োগরহিত অব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত আত্মার মিলনের নামই যোগ।

৯. **জ্ঞানযোগ**– আরাধনাই কর্ম। নিজের উপর নির্ভর হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই জ্ঞানযোগ।

১০. **নিষ্কাম কর্মযোগ**– ইষ্টের উপর নির্ভর করে, সমর্পণের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্কাম কর্মযোগ।

১১. **শ্রীকৃষ্ণ কোন সত্যের বিষয়ে বলেছেন?**- তত্ত্বদর্শীগণ যা সম্যক্ অনুভব করেছেন ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন ও এরপরেও দেখবেন, সেই শাশ্বত সত্য সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উল্লেখ করেছেন।

১২. **যজ্ঞ**- সাধনার বিধি-বিশেষকে 'যজ্ঞ' বলে।

১৩. **কর্ম**- যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়া কর্ম।

১৪. **বর্ণ**- আরাধনার সেই একমাত্র বিধি, যাকে কর্ম বলে। সেই কর্মকে চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে, সেই চারটিই বর্ণ। সাধনা-পথে একজন সাধকেরই উঁচু-নীচু স্তর হল সেই বর্ণ। জাতি-বিশেষ নয়, যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত।

১৫. **বর্ণসঙ্কর**– পরমাত্ম-পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, সাধনায় ভ্রম উৎপন্ন হওয়াই বর্ণসঙ্কর।

১৬. **মানুষের শ্রেণী**– অন্তঃকরণের স্বভাবানুসারে মানুষের শ্রেণী দুটি- প্রথমটি দেবতার ও অন্যটি অসুরের। মানুষের জাতি দুটি, যা স্বভাবদ্বারা নির্ধারিত। এই স্বভাবের আবার ক্ষয়-বৃদ্ধিও হয়।

১৭. **দেবতা**– হৃদয়-ক্ষেত্রে পরমদেবের দেবত্ব অর্জন যাদের সাহায্যে করা হয়, সেই গুণসমূহই দেবতা। বাহ্য দেবতার পূজা মূঢ়তার পরিচয়।

১৮. **অবতার**– অবতারের আবির্ভাব পুরুষের হৃদয়ে হয়, বাইরে নয়।

১৯. **বিরাট দর্শন**– যোগীর হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রদত্ত অনুভূতি। ভগবান সাধকের হৃদয়ে দৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালে তবেই দেখা যাবে।

২০. **পূজনীয় দেব (ইষ্ট)**– একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মই ‘পূজনীয় দেব’। হৃদয়-দেশই হল তাঁকে খুঁজবার স্থান। অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত, প্রাপ্তিযুক্ত মহাপুরুষই পরাৎপর পরব্রহ্ম প্রাপ্তির একমাত্র স্রোত।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বোঝার জন্য তৃতীয় অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন আবশ্যক। ত্রয়োদশ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই সত্য স্পষ্ট হবে। সনাতন এবং সত্য একে অন্যের পরিপূরক যা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন; কিন্তু তবুও এই বিষয় পূর্তিপর্যন্ত যাবে। চতুর্থ অধ্যায় শেষ হতে হতে যুদ্ধ শব্দের অর্থ স্পষ্ট হতে শুরু হবে, একাদশ অধ্যায়পর্যন্ত সংশয় নির্মূল হবে; তবুও এই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য ষোড়শ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হবে। যুদ্ধস্থান বোঝার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায় বার বার অধ্যয়ন করুন।

জ্ঞানের অর্থ চতুর্থ অধ্যায় থেকে স্পষ্ট হবে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট জানা যাবে যে প্রত্যক্ষ দর্শনকেই জ্ঞান বলে। 'যোগ' শব্দের অর্থ ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, যদিও অষ্টাদশ অধ্যায়পর্যন্ত যোগের বিভিন্ন অঙ্গের পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। 'জ্ঞানযোগ' তৃতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'নিষ্কাম কর্মযোগ' দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে পূর্তিপর্যন্ত চর্চা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন, 'যজ্ঞ' স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

কর্মের নামোল্লেখ অধ্যায় ২/৩৯ শ্লোকে প্রথমবার করা হয়েছে। এই শ্লোক থেকে চতুর্থ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কর্মের অর্থ আরাধনা অথবা ভজন কেন? ষোড়শ অধ্যায় ও সপ্তদশ অধ্যায়ে সত্য বিচার দৃঢ় হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'বর্ণসঙ্কর' ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'অবতার' স্পষ্ট হবে। বর্ণ-ব্যবস্থা বোঝার জন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধ্যয়ন আবশ্যক, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়েও যথেষ্ট সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে দেবাসুর জাতির পরিচয় ষোড়শ অধ্যায়ে পাবেন। 'বিরাট দর্শন' দশম অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায়পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে। সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ অধ্যায়েও এবিষয়ে যথেষ্ট চর্চা করা হয়েছে। সপ্তম, নবম ও সপ্তদশ অধ্যায়ে বাহ্য দেবতার অস্তিত্বহীনতার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হৃদয়-দেশই পরমাত্মার পূজাস্থলী যার জন্য ধ্যান ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণ-অপানের) সহিত ইষ্ট-চিন্তন ইত্যাদি ক্রিয়া, যেটা নির্জনে বসে (মন্দিরে-মূর্তির সম্মুখে নয়) অভ্যাস করা হয়, সেটা তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়েছে। আর বেশী বিচার-বিবেচনারই বা কি প্রয়োজন, যদি কেবল ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্তই অধ্যয়ন করেন, তবুও যথার্থ গীতার মূল আশয় আপনাদের বোধগম্য নিশ্চয়ই হবে।

গীতা জীবিকা-সংগ্রামের সাধন নয়, এতে জীবন-সংগ্রামে শাশ্বত বিজয় লাভের ক্রিয়াত্মক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য গীতাশাস্ত্র যুদ্ধগ্রন্থ, যার সাহায্যে বাস্তবিক বিজয়লাভ করা সম্ভব। গীতোক্ত যুদ্ধ কামান, ঢাল-তরবারি, তীর-ধনুক, গদা, লাঙ্গল-কোদাল ও কাস্তে-হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়ে যে সাংসারিক যুদ্ধ করা হয়, তা নয়, এই সাংসারিক যুদ্ধে শাশ্বত বিজয়লাভ হয় না। এটা শুধু সৎ এবং অসৎ প্রবৃত্তি সমূহের সংঘর্ষ। পুরাকালে এই সকলের রূপকাত্মক বর্ণনার পরম্পরা ছিল।

বেদে ইন্দ্র ও বৃত্র, বিদ্যা ও অবিদ্যা, পুরাণে দেবাসুর সংগ্রাম, মহাকাব্যে রাম-রাবণ ও কৌরব-পাণ্ডবের সংঘর্ষকেই গীতায় ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র, দৈবী সম্পদ্-আসুরী সম্পদ্, সজাতীয়-বিজাতীয়, সদ্‌গুণ ও দুর্গুণ সমূহের সংঘর্ষ বলা হয়েছে।

এই সংঘর্ষ যেখানে হয়েছিল সেই স্থান কোথায়? গীতার ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র ভারতের কোন ভূখণ্ড নয়, স্বয়ং গীতাকারের বাণীতে- "**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**"- কৌন্তেয়! এই দেহটাই ক্ষেত্র, এর মধ্যে ভাল-মন্দ কর্মরূপ যে বীজবপন করা হয়, তা সংস্কাররূপে অঙ্কুরিত হতে থাকে। দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, পাঁচটি বিকার এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের বিকার হল-এই ক্ষেত্রের বিস্তার। প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণদ্বারা অভিভূত হয়ে মানুষ কর্ম করে। মানুষ ক্ষণমাত্রও কর্ম না করে থাকতে পারে না। "**পুনরপি জননম্ পুনরপি মরণম্ পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্**।" জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই ক্রিয়াই তো চলেছে। এটাই কুরুক্ষেত্র। সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে সাধক যখন সাধনার সঠিক পথে চলে পরমধর্ম পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়, তখন এই ক্ষেত্রই ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাই এই দেহটাই ক্ষেত্র।

এই শরীরের অন্তরালে অন্তঃকরণের দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান, সে দুটি হল–দৈবী সম্পদ্ ও আসুরী সম্পদ্। দৈবী সম্পদে আছে পুণ্যরূপ পাণ্ডু এবং কর্তব্যরূপ কুন্তী। পুণ্য জাগ্রত হবার আগে মানুষ কর্তব্য ভেবে যা কিছু করে, নিজের বুদ্ধি অনুসারে সে কর্তব্যই করে; কিন্তু তার দ্বারা কর্তব্য-পালন হয় না–কারণ পুণ্য ছাড়া কর্তব্য কি, তা বোঝা সহজ নয়। কুন্তী পাণ্ডুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার পূর্বে যাকে অর্জন করেছিল, সে ছিল 'কর্ণ'। আজীবন সে কুন্তীর পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধই করেছিল। পাণ্ডবদের দুর্ধর্ষ শত্রু যদি কেউ ছিল, তবে সে ছিল 'কর্ণ'। বিজাতীয় কর্মই 'কর্ণ', আবার এটা বন্ধনের কারণ, যার থেকে পরম্পরাগত গোঁড়ামীর চিত্রণ হয়–পূজা-পদ্ধতি মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলা যায় না। পুণ্য জাগ্রত হলে ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির, অনুরাগরূপ অর্জুন, ভাবরূপ ভীম, নিয়মরূপ নকুল, সৎসঙ্গরূপ সহদেব, সাত্ত্বিকতারূপ সাত্যকি, কায়াতে সামর্থ্যরূপ কাশিরাজ, কর্তব্যদ্বারা জগতে বিজয়রূপ কুন্তীভোজ ইত্যাদি ইষ্টোন্মুখ মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ হয়। যারা গণনায় সাত অক্ষৌহিনী। 'অক্ষ' দৃষ্টিকে বলা হয়। সত্যময় দৃষ্টিকোণ দিয়ে যার গঠন হয়, তাকেই

বলে দৈবী সম্পদ্। পরমধর্ম পরমাত্মাপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এই সাতটি সোপান, 'সাতটি ভূমিকা', কোন অন্য গণনা নয়। বস্তুতঃ এই প্রবৃত্তিসমূহ অনন্ত।

অন্যদিকে আছে কুরুক্ষেত্র, যাতে দশটি ইন্দ্রিয় ও একটী মন মিলিত হয়ে সেনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এগারো অক্ষৌহিনী। মন ও ইন্দ্রিয়গম্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে যার গঠন হয়, তাকে বলে আসুরী সম্পদ্। তার মধ্যে আছে অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র, যে সব সত্য জেনেও অন্ধ। তার সহচারিণী গান্ধারী– ইন্দ্রিয়ের আধারযুক্ত প্রবৃত্তি। তার সঙ্গে আছে মোহরূপ 'দুর্যোধন', দুর্বুদ্ধিরূপ দুঃশাসন, বিজাতীয় কর্মরূপ কর্ণ, ভ্রমরূপ ভীষ্ম, দ্বৈতের আচরণরূপ দ্রোণাচার্য, আসক্তিরূপ অশ্বত্থামা, বিকল্পরূপ বিকর্ণ, অপূর্ণ সাধনে কৃপার আচরণরূপ কৃপাচার্য, ও এদের মাঝে জীবরূপ 'বিদুর' আছে, অজ্ঞানের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি পাণ্ডবদের উপরই ছিল, পুণ্য থেকে প্রবাহিত প্রবৃত্তির উপর ছিল, কারণ আত্মা পরমাত্মারই শুদ্ধ অংশ। এই প্রকার আসুরিক সম্পদ্ও অনন্ত। ক্ষেত্র একটাই এই দেহটা; এর মধ্যে যুদ্ধে ইচ্ছুক প্রবৃত্তি দুটি–একটি প্রকৃতিতে বিশ্বাস এনে দেয়, যার ফলে নীচ-অধম যোনিতে জন্ম হয় ও অন্যটি পরমপুরুষ পরমাত্মাতে বিশ্বাস ও প্রবেশ দেয়। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সংরক্ষণে সাধনা করলে ক্রমশঃ দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ ও আসুরিক সম্পদের সর্বথা শমন হয়। মনে যখন কোন বিকার থাকে না তখন মন নিরুদ্ধ হয় শেষে এই নিরুদ্ধ মনেরও সম্পূর্ণ রূপে বিলয় হয়। এই অবস্থায় দৈবী সম্পদেরও আর কোন প্রয়োজন থাকে না। বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন দেখলেন যে কৌরব পক্ষের পরে পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধাও যোগেশ্বরের মুখ-গহ্বরে সমাহিত হচ্ছে। পূর্তিকালে অর্থাৎ সাধনার অন্তিম স্তরে দৈবী সম্পদ্ও বিলয় হয় এবং সনাতন-শাশ্বত-সত্য পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়। এর পরেও যদি মহাপুরুষগণ আচরণ করেন, তবে তা কেবল অনুগামীদের পথ-প্রদর্শনের জন্যই করেন।

জনহিতের জন্য মহাপুরুষগণ সূক্ষ্ম মনোভাব বর্ণনা স্থূলরূপে করেছেন। গীতাগ্রন্থ যদ্যপি ছন্দবদ্ধ এবং ব্যাকরণসম্মত তথাপি এর সকল পাত্র প্রতীকাত্মক, অমূর্ত যোগ্যতার মূর্তরূপ মাত্র। গীতার শুরুতেই ত্রিশ-চল্লিশজন পাত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে অর্দ্ধেক সজাতীয়, বাকী অর্দ্ধেক বিজাতীয়। কিছু পাণ্ডব পক্ষের ছিল, কিছু কৌরব পক্ষের ছিল। বিশ্বরূপ দর্শনের সময় এদের মধ্যে চার-ছয়

জনের নামই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথা সম্পূর্ণ গীতায় এই নামগুলির আর কোথাও উল্লেখ নেই। অর্জুন একমাত্র পাত্র, যিনি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যোগেশ্বরের সমক্ষে ছিলেন। সেই অর্জুনও কেবল যোগ্যতার প্রতীক, ব্যক্তি-বিশেষ নয়। গীতার শুরুতে অর্জুন সনাতন কুলধর্মের রক্ষার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এটাকে অজ্ঞান বলেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন–"আত্মাই সনাতন ও এই শরীর বিনাশলীল, সেইজন্য যুদ্ধ কর।" এই আদেশে একথা স্পষ্ট হচ্ছে না যে, অর্জুন কেবল কৌরব পক্ষের যোদ্ধাদেরই বধ করবেন, পাণ্ডবপক্ষেও তো দেহধারীই ছিল। দুই পক্ষেই আত্মীয় স্বজন ছিল। সংস্কারের উপর আধারিত দেহ কি তরবারিদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে সমাপ্ত করা সম্ভব? শরীর যখন বিনাশশীল, যার অস্তিত্বই নেই, তবে অর্জুন কে? শ্রীকৃষ্ণ কার রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন? তিনি কি কোন শরীরধারীর রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–"যে শরীরের জন্য পরিশ্রম করে, সে পাপিষ্ঠ মূঢ় ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে।" যদি শ্রীকৃষ্ণ শরীরধারীর রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে তো তিনিও মূঢ় ব্যক্তি, ব্যর্থই জীবন ধারণ করেছেন। বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন।

অনুরাগীর জন্য মহাপুরুষ সর্বদাই দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্জুন শিষ্য ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ সদ্গুরু ছিলেন। বিনয়াবনত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্মপথে মুগ্ধচিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, যা শ্রেয় (পরম কল্যাণকর) আমাকে সেই উপদেশ দিন। অর্জুন শ্রেয় চেয়েছিলেন, প্রেয় (ভৌতিক পদার্থ) নয়। তা-ই বলেছিলেন– "শুধু বলবেনই না অর্থাৎ কেবল উপদেশই দেবেন না, সেই পথে পরিচালনাও করুন এবং নিজের তত্ত্বাবধানেও রাখুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত।" এইরূপ গীতায় স্থানে-স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্জুন আর্ত অধিকারী ও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদ্গুরু। অনুরাগীর সঙ্গে সদ্গুরুর সর্বদা থাকেন, তার পথ-প্রদর্শন করেন।

ভাবুকতাবশতঃ যখন কোন ব্যক্তি 'পূজ্য মহারাজজী'র সান্নিধ্যে থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত, তখন তিনি বলতেন–"যাও, যেখানেই থাক কিছু আসে যায় না, মন থেকে আমার কাছে আস-যাওয়া করবে। প্রাতঃ, সন্ধ্যা রাম, শিব অথবা ওঁ কোন দুই আড়াই অক্ষরের নামজপ করবে ও হৃদয়ে আমার স্বরূপের ধ্যান করবে।

এক মিনিটও যদি স্বরূপ ধরে রাখতে সক্ষম হও, তবে যাকে ভজন বলে তা আমি তোমায় দেব। এর থেকেও বেশী সময় ধ্যানে স্বরূপ ধরে রাখতে পারলে, হৃদয়ে সারথী হয়ে সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব।” এইরূপ যখন মহাপুরুষের স্বরূপ ধ্যান যোগে স্থির হয়, তখন মহাপুরুষ আপনার হাত-পা-নাক-কান ইত্যাদির মত অতি কাছে বাস করেন। আপনি সহস্র কিলোমিটার দূরে থাকুন না কেন, তাঁকে সর্বদাই কাছে পাবেন। মনে কোন বিচার উদয় হওয়ার পূর্বেই তিনি পথ-প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবেন। অনুরাগীর হৃদয়-দেশে মহাপুরুষ সর্বদাই একাত্মা হয়ে জাগ্রত থাকেন। অর্জুন অনুরাগের প্রতীক।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখবার পর অর্জুন নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলির জন্য ক্ষমাযাচনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করেছিলেন এবং পুনরায় ভক্তের ইচ্ছানুরূপ সৌম্যরূপ ধারণ করে বলেছিলেন–“অর্জুন! আমার এই স্বরূপ এর পূর্বে কেউ দেখেনি ও ভবিষ্যতেও কেউ দেখবে না।” তবে তো গীতা আমাদের জন্য ব্যর্থ, কারণ উক্ত বিলক্ষণ রূপ দেখার যোগ্যতা একমাত্র অর্জুনের মধ্যেই ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সঞ্জয়ও সেই বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। এর পূর্বেও তিনি বলেছেন- “বহু যোগী জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার সাক্ষাৎ স্বরূপ লাভ করেছেন।” তাহলে তিনি বলতে কি চাইছেন? বস্তুতঃ অনুরাগই ‘অর্জুন’ যা আপনার হৃদয়ের ভাব-বিশেষ। অনুরাগবিহীন পুরুষ না কখনও সেই দিব্য স্বরূপ দর্শন করেছে, না ভবিষ্যতে কখনও করবে। “**মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা। কিয়ে জোগ তপ গ্যান বিরাগা**।।” অতএব অর্জুন প্রতীক মাত্র। যদি প্রতীকরূপে আপনি না মানতে পারেন, তবে গীতাপাঠ ব্যর্থ, গীতা আপনার জন্য নয়, তবে সেই দর্শনের যোগ্যতাও কেবল অর্জুনের মধ্যেই ছিল।

অবশেষে যোগেশ্বর স্বয়ং নির্ণয় করে বলেছেন– “অর্জুন! অনন্যভক্তি ও শ্রদ্ধাদ্বারা আমি এই প্রকার দেখার (যেমন তুমি দেখলে), তত্ত্বসহিত স্পষ্ট জানার ও প্রবেশ করার জন্যও সুলভ।” অনন্য ভক্তি অনুরাগেরই আরেকটি রূপ এবং এটাই অর্জুনেরও স্বরূপ। অর্জুন পথিকের প্রতীক। এইরূপ গীতার সকল পাত্র প্রতীকাত্মক, যথাস্থানে সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে।

হতে পারে, হয়তো ছিলেন কোন ঐতিহাসিক কৃষ্ণ ও অর্জুন, বিশ্বযুদ্ধ হয়ে থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু গীতাশাস্ত্রে ভৌতিক যুদ্ধের চিত্রণ নেই। সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের সমক্ষে দাঁড়িয়ে ভয়ভীত হয়েছিলেন কেবল অর্জুন, সেনা নয়। সেনা তো যুদ্ধোন্মাদে মত্ত, কেবল আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

যুদ্ধার্থ অর্জুনের মনকে প্রস্তুত করার জন্যই কি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন ? বস্তুতঃ সাধন লিপিবদ্ধ করা যায় না। সবটা পড়ে নেওয়ার পরেও এই পথে চলা বাকী থাকে। সেই প্রেরণাই প্রদান করবে এই 'যথার্থ গীতা'।

শ্রী গুরু পূর্ণিমা　　　　　　　　সদ্গুরু কৃপাশ্রয়ী, জগদ্বন্ধু

২৪ জুলাই, ১৯৮৩ খৃঃ।　　　　　　　　**স্বামী অড়গড়ানন্দ**

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

যথার্থ গীতা
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা)

।। অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ।।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ।। ১।।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন– "হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়ে আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করল?"

অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র এবং সংযমরূপ সঞ্জয়। অজ্ঞান মনের অন্তরালে থাকে। অজ্ঞানাবৃত মন ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ; কিন্তু সংযমরূপ সঞ্জয়ের মাধ্যমে তিনি দেখেন ও শোনেন। ধৃতরাষ্ট্র জানেন যে পরমাত্মাই একমাত্র সত্য, পুনশ্চ যতক্ষণ এর থেকে উৎপন্ন মোহরূপ দুর্যোধন জীবিত থাকে, ততক্ষণ এর দৃষ্টি সর্বদা কৌরবগণের উপরেই থাকে অর্থাৎ বিকারের উপরেই থাকে।

শরীর একটি ক্ষেত্র। যখন হৃদয়-দেশে দৈবী সম্পত্তির বাহুল্য ঘটে, তখন এই শরীর ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং যখন এতে আসুরিক সম্পত্তির বাহুল্য ঘটে, তখন এই শরীর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। 'কুরু' অর্থাৎ কর– এই শব্দ আদেশাত্মক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– "প্রকৃতিজাত তিনটি গুণের বশীভূত হয়েই মানুষ কর্ম করে।" সে ক্ষণমাত্রও কর্ম না করে থাকতে পারে না, গুণত্রয় তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও কর্ম বন্ধ হয় না, সেটিও সুস্থ দেহের আবশ্যক খোরাক মাত্র। এই

তিনগুণ মানুষকে দেবতা থেকে শুরু করে কীটপর্যন্ত দেহের বন্ধনেই আবদ্ধ করে। যতক্ষণ প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত গুণ জীবিত, ততক্ষণ 'কুরু' সক্রিয় থাকবে। অতএব জন্ম-মৃত্যুময় এই ক্ষেত্র, বিকারযুক্ত এই ক্ষেত্রই 'কুরুক্ষেত্র' এবং পরমধর্ম পরমাত্মাতে প্রবেশ প্রদান করতে পারে যে পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহ, সেই পুণ্যময় প্রবৃত্তি সমূহের (পাণ্ডবের) ক্ষেত্রই 'ধর্মক্ষেত্র'।

পুরাতত্ত্ববিদ্ পাঞ্জাবে, কাশী-প্রয়াগের মধ্যে এবং অন্যান্য বহু স্থানের কুরুক্ষেত্রের নির্দিষ্ট স্থান অনুসন্ধান কার্যে রত আছেন; কিন্তু গীতাকার স্বয়ং বলেছেন, যে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়েছিল সেই ক্ষেত্রটি কোথায়। **'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।'** (অ. ১৩/১)– "অর্জুন! এই দেহই ক্ষেত্র এবং যিনি একে জানেন এবং আয়ত্তের অধীনে আনতে পারেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।" এরপর তিনি ক্ষেত্রের বিস্তার সম্বন্ধে বললেন, যাতে দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পাঁচটি বিকার ও তিনটি গুণের বর্ণনা আছে। এই দেহই ক্ষেত্র, এক মল্লভূমি। এর মধ্যে যুদ্ধাভিলাষী প্রবৃত্তি দুটি– 'দৈবী সম্পদ্' ও 'আসুরী সম্পদ্', 'পাণ্ডুর সন্তানগণ' ও 'ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ', সজাতীয় ও বিজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহ।

তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হলে এই দুই প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, একেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ ও প্রকৃত যুদ্ধ বলা হয়। ইতিহাসের পাতা বিশ্বযুদ্ধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই সব যুদ্ধে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, তাঁরা কেউই শাশ্বত বিজয়ী হননি, এর মধ্যে প্রতিহিংসা ছিল। প্রকৃতিকে শান্ত করে প্রকৃতির ঊর্ধ্বের সত্তার দিগ্‌দর্শন করা এবং তাতে প্রবেশ করাই প্রকৃত বিজয়। এই হ'ল শাশ্বত বিজয় যার পশ্চাতে পরাজয় নেই। একেই বলে মুক্তি, যার পর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন নেই।

এইভাবে অজ্ঞানে আবৃত্ত প্রত্যেক মন সংযমের দ্বারা জানতে পারে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যুদ্ধের পরিণাম কি হয়? যার যেমন সংযমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি তাঁর দৃষ্টি খুলতে থাকে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢং দুর্যোধনস্তদা।

আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ।।২।।

সেই সময় রাজা দুর্যোধন ব্যূহরচনাযুক্ত পাণ্ডবগণের সেনাকে দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন–

দ্বৈতের আচরণই 'দ্রোণাচার্য'। যখন অনুভব হয় যে পরমাত্মা থেকে আমরা পৃথক্ (একেই বলে দ্বৈতবোধ) তখনই তাঁকে লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা জেগে ওঠে, তখনই আমরা গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। দুই প্রবৃত্তির মধ্যে একেই প্রাথমিক গুরু বলা যেতে পারে, যদিও পরে সদ্গুরু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হবেন, যিনি যোগের পূর্ণস্থিতি প্রাপ্ত মহাপুরুষ।

রাজা দুর্যোধন আচার্যের কাছে যান। মোহরূপ দুর্যোধন। মোহই সকল ব্যাধির মূল ও রাজা। দুর্যোধন–দুর অর্থাৎ দূষিত, যো ধন অর্থাৎ সেই ধন। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। তাতে যে আবিলতা সৃষ্টি করে, তা মোহ। এই মোহ প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট করে ও প্রকৃত জ্ঞানের জন্য প্রেরণাও প্রদান করে। মোহ আছে বলেই জানার প্রশ্নও আছে, অন্যথা সকলই পূর্ণ।

অতএব ব্যূহরচনাযুক্ত পাণ্ডবগণের সেনাকে দেখে অর্থাৎ পুণ্যজাত সজাতীয় বৃত্তিসমূহকে সংগঠিত দেখে মোহরূপ দুর্যোধন প্রথম গুরু দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন–

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।

ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ।। ৩।।

হে আচার্য! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা ব্যূহাকার রচিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিপুল সৈন্যসমাবেশ দর্শন করুন।

শাশ্বত অচল পদে আস্থা রাখতে পারে যে দৃঢ় মন তাকে বলে 'ধৃষ্টদ্যুম্ন'। একেই বলে পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহের নায়ক। '**সাধন কঠিন ন মন কর টেকা**'– সাধন কঠিন নয়, মন দৃঢ় হওয়া কঠিন।

এখন দেখুন সেনার বিস্তার–

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ।। ৪।।

এই সেনার মধ্যে ‘**মহেষ্বাসা**’– মহান্ ঈশ্বর তত্ত্বে অবস্থিতি প্রদান করতে সক্ষম, ভাবরূপ ‘**ভীম**’ এবং অনুরাগরূপ ‘**অর্জুন**’ এদের সমকক্ষ অনেক শূরবীর, যেমন– সাত্ত্বিকতারূপ ‘সাত্যকি’, ‘**বিরাটঃ**’– সর্বত্র ঈশ্বরীয় ভাবপ্রবাহের ধারণা, মহারথী রাজা দ্রুপদ অর্থাৎ অচল স্থিতি এবং–

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।

পুরজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ।। ৫।।

‘**ধৃষ্টকেতুঃ**’—দৃঢ় কর্তব্য, ‘**চেকিতানঃ**’– মন যেখানেই যাক বলপূর্বক সেখান থেকে আকর্ষণ করে ইষ্টে স্থির করা, ‘**কাশিরাজঃ**’–কায়ারূপ কাশীতেই সেই সাম্রাজ্য, ‘**পুরুজিৎ**’–স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে জয় করতে সাহায্য করে যে, সেই পুরুজিৎ, ‘**কুন্তিভোজঃ**’–কর্তব্যের দ্বারা জগতের উপর জয়লাভ, নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ‘**শৈব্য**’ অর্থাৎ সত্য ব্যবহার–

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ।। ৬।।

এবং পরাক্রমশালী ‘**যুধামন্যুঃ**’–যুদ্ধের অনুরূপ মনের বোধ, ‘**উত্তমৌজাঃ**’-শুভকামনায় মগ্ন, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু–শুভ আধারলাভ হলে মন ভয়মুক্ত হয়ে যায়– এরূপ শুভ আধারপ্রাপ্ত অভয় মন, ধ্যানরূপ দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র–বাৎসল্য, লাবণ্য, সহৃদয়তা, সৌম্যতা, স্থিরতা এরা সকলেই এক-একজন মহারথী। সাধন পথে সম্পূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে চলার শক্তি এরাই জোগায়।

এইভাবে রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবপক্ষের ১৫-২০টি নামের উল্লেখ করলেন, যেগুলি দৈবী সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিজাতীয় প্রবৃত্তির রাজা হওয়া সত্ত্বেও মোহই সজাতীয় প্রবৃত্তি সমূহকে অনুভব করতে বাধ্য করে।

দুর্যোধন নিজের পক্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করলেন। এই যুদ্ধ পার্থিব যুদ্ধ হলে, স্বসৈন্যদলের সংখ্যা বাড়িয়ে বলতেন। বিকারের সংখ্যা কম প্রদর্শিত করলেন যেহেতু এই বিকারগুলিকেই জয় করতে হবে, এরা বিনাশশীল। কেবল পাঁচ-সাতটি বিকার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যাদের অন্তরালে বহির্মুখী প্রবৃত্তিসমূহ বিদ্যমান। যেমন—

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ব্রবীমি তে ।। ৭।।

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যে সকল বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাঁদেরকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য তাঁদের নাম বলছি—

বাহ্য যুদ্ধে সেনাপতির জন্য 'দ্বিজোত্তম' সম্বোধন অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ গীতাশাস্ত্রে অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তির সংঘর্ষের বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে দ্বৈত-এর আচরণই হ'ল 'দ্রোণ'। যতক্ষণ আমরা লেশমাত্রও আরাধ্য থেকে পৃথক্, ততক্ষণ প্রকৃতি বিদ্যমান, দ্বৈত বিদ্যমান। এই 'দ্বি'-কে জয় করার প্রেরণা প্রথম গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে পাওয়া যায়। অপূর্ণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে জানার প্রেরণা প্রদান করে। এটা পূজাস্থান নয়, এখানে শৌর্যসূচক সম্বোধন হওয়া উচিত।

বিজাতীয় প্রবৃত্তির কে কে নায়ক?—

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ।। ৮।।

একজন স্বয়ং আপনি (দ্বৈতের আচরণরূপ দ্রোণচার্য), ভ্রমরূপ পিতামহ 'ভীষ্ম'ও আছেন। এই বিকারসমূহ ভ্রম থেকে উৎপন্ন হয়। শেষপর্যন্ত জীবিত থাকে, তাই পিতামহ। সম্পূর্ণ সেনার মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। শরশয্যায় অচৈতন্য অবস্থাতে ছিলেন, তবুও জীবিত ছিলেন। একেই বলে ভ্রমরূপ 'ভীষ্ম'। ভ্রম শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকে। এইরূপ বিজাতীয় কর্মরূপ 'কর্ণ' ও সংগ্রাম বিজয়ী 'কৃপাচার্য'। সাধনাবস্থায় সাধক অন্যের প্রতি যে কৃপার আচরণ করেন সেই কৃপাকেই 'কৃপাচার্য' বলে। ভগবান কৃপাধাম ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পর মহাপুরুষের স্বরূপও তদ্রূপ। কিন্তু সাধনাবস্থায় যতক্ষণ সাধক ও পরমাত্মা পৃথক্, বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি সক্রিয় ও মোহাচ্ছাদিত—এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধক যদি কৃপার আচরণ করেন, তবে তিনি নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যান। সীতা দয়া করেছিলেন, তার পরিবর্তে তাঁকে কিছুকাল লঙ্কায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। বিশ্বামিত্র দয়া করেছিলেন, তাই পতিত হয়েছিলেন। যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিও এই কথাই বলেছেন— **"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।" (যোগ০ ৩/৩৭)** অর্থাৎ ব্যুত্থানকালে সিদ্ধি (যোগলব্ধ শক্তি) প্রকট হয়। প্রকৃত পক্ষে সেগুলি সিদ্ধাই পরন্তু কৈবল্য প্রাপ্তির পথে এই সিদ্ধাই তত বড়ই বাধা, যতটা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি। গোস্বামী তুলসীদাসেরও সেই একই নির্ণয়—

ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া। বিঘ্ন অনেক করই তব মায়া।।

রিদ্ধি সিদ্ধি প্রেরই বহু ভাই। বুদ্ধিহিঁ লোভ দিখাবহিঁ আই।।

(রামচরিতমানস, ৭/১১৭/৬-৭)

মায়া অনেক বিঘ্নসৃষ্টি করে, শক্তি প্রদান করে, এমনকি সিদ্ধে পরিণত করে। এইরূপ সিদ্ধসাধক যদি পাস দিয়ে শুধু হেঁটে যান, তাহলে মরণাপন্ন রোগীও বেঁচে ওঠে। সেই রোগী যদিও সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু সাধক যদি সেটা নিজের অবদান বলে মনে করেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। একজন রোগীর স্থানে হাজার হাজার রোগী তাঁকে ঘিরে ধররে, ভজন-চিন্তনের ক্রম অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পথভ্রান্ত হতে হতে প্রকৃতির বাহুল্য হবে। যদি লক্ষ্য দুরে ও সাধক কৃপা করেন তবে কৃপার একেলার ব্যবহারই '**সমিতিঞ্জয়ঃ**'- সমস্ত সেনা-বাহিনীকে জয় করবে। এই কারণে যতক্ষণ সাধক পূর্ণতা লাভ না করছেন, ততক্ষণ এই সব থেকে সাবধান থাকা দরকার। '**দয়া বিনু সন্ত কসাই, দয়া করী তো আফত আই।**' অর্থাৎ দয়া না করলে সাধু কসাইয়ের সমতুল্য, আর দয়া প্রদর্শিত করলেও অধঃপতনের সম্ভাবনা। কিন্তু অপূর্ণ অবস্থায় এই হল বিজাতীয় প্রবৃত্তির দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

এইরূপ আসক্তিরূপ অশ্বত্থামা। জগৎ-এর যে কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণকেই আসক্তি বলে। দ্বৈত-এর আচরণই দ্রোণাচার্য। এই দ্বৈতই আসক্তির জন্মদাতা। শস্ত্রধারণ অবস্থাতে আচার্য দ্রোণকে বধ করা সম্ভব ছিল না। তিনি অজেয় ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—কৌরবপক্ষের একটি হাতির নাম অশ্বত্থামা, ভীম সেই হাতিটিকে বধ করে "অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে" এইরূপ ঘোষণা করুন। এই অপ্রিয় ঘটনার কথা শুনে আচার্য মর্মাহত হয়ে শিথিল হয়ে যাবেন, সেটাই তাঁকে বধ করার উপযুক্ত সময়। ভীম হাতিটিকে বধ করে প্রচার করেছিলেন, "অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে।" আচার্য দ্রোণ ভেবেছিলেন যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে, তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, ধনুক হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, তিনি হতাশ, নিশ্চেষ্ট হয়ে যুদ্ধভূমিতে বসে পড়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বধ করা হয়েছিল। পুত্রের প্রতি অত্যধিক আসক্তি তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অশ্বত্থামা দীর্ঘজীবী ছিলেন। নিবৃত্তির শেষ মুহূর্তপর্যন্ত বাধা দেয় তা'ই একে অমর বলা হয়েছে।

বিকল্পরূপ বিকর্ণ। সাধনার উন্নত অবস্থাতে মনে কিছু অসাধারণ কল্পনার উদয় হয়। মনে সঙ্কল্প-বিকল্প জাগে যে, স্বরূপলাভের পর ভগবানের তরফ থেকে কিরূপ সিদ্ধাই, অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হবে। সাধক ঈশ্বর চিন্তনের পরিবর্তে ঈশ্বরের-ঐশ্বর্যের চিন্তা করতে শুরু করেন। সাধককে একাগ্র হয়ে কর্ম করে যাওয়া উচিত। ফললাভের কামনা করা উচিত নয় কিন্তু যখন তিনি (সিদ্ধাই) যোগলব্ধ শক্তির কামনা করতে শুরু করেন তখন এইরূপ মনোভাব অর্থাৎ বিকল্পকেই বিকর্ণ বলে। এই কল্পনাগুলি অসাধারণ কিন্তু সাধনাতে ভয়ঙ্করভাবে বাধা দেয়।

ভ্রমোৎপাদক শ্বাসই ভূরিশ্রবা। সাধনার স্তর উন্নত হলে পরে সকলেই সাধকের প্রশংসা করতে শুরু করেন যে, ইনি মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ, দিব্যগুণের অধিকারী, তাঁর সমক্ষে লোকপালও বিনীত হয়ে যান। এইরূপ ব্যবহার, প্রশংসা দ্বারা সাধক যখন আনন্দের আতিশয্যে পথহারা হন তখন এইরূপ শ্বাসকেই ভূরিশ্রবা বলা হয়। পূজ্য গুরুদেব বলতেন-"সমাজ যদি পুষ্পবৃষ্টি করে, প্রশংসা করে, বিশ্ববন্দ্য জগদ্‌গুরু বলে তোমার তাতে কিছু লাভ হবে না, শুধু কান্নাকাটি করতে থাকবে, কিন্তু যদি ভগবান তোমাকে সাধুর আখ্যা দেন, তবে সর্বস্ব লাভ করবে, সমাজ বলুক অথবা না বলুক, তুমি সর্বস্ব লাভ করবে।" এইরূপ প্রশংসাতে অভিভূত হওয়াকেই ভ্রমোৎপাদক শ্বাস অর্থাৎ ভূরিশ্রবা বলে। অত্যধিক প্রশংসার ফলে সাধনার হ্রাস হয়। অতএব ভ্রমোৎপাদক শ্বাসই ভূরিশ্রবা। সংযমের স্তর উন্নত হলে পরে যে (বিকৃতি) বিকারগুলি বাধা দেয়, এগুলি তাদেরই নাম। এগুলি বহির্মুখী প্রবৃত্তির অঙ্গ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।। ৯।।

আমার জন্য প্রাণদান করতে কৃতসঙ্কল্প অনেক শূরবীর অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েছেন। সকলেই আমার জন্য প্রাণদান করতে সঙ্কল্পবদ্ধ; কিন্তু এদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা পরিগণিত হয়নি। এখন কোন কোন সেনা কি কি ভাবদ্বারা সুরক্ষিত? তা বলছেন—

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।। ১০।।

ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা সর্বপ্রকারে অজেয়; কিন্তু ভীমদ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবগণের সেনা জয় করা সহজ। পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্তের মত সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রয়োগ দুর্যোধনের আশঙ্কাই ব্যক্ত করছে। অতএব দেখতে হবে যে ভীষ্ম কোন সত্তা, যার উপর সম্পূর্ণ কৌরব নির্ভরশীল এবং ভীম কোন সত্তা যার উপর (দৈবী সম্পদ্‌) সম্পূর্ণ পাণ্ডব নির্ভরশীল। দুর্যোধন এবার নিজের সু-ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দিলেন–

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ।। ১১।।

এক্ষণে আপনারা সকলেই ব্যূহসমূহের প্রবেশদ্বারে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকেই সকলদিক্ থেকে রক্ষা করুন। যদি ভীষ্ম জীবিত থাকেন, তাহলে আমরা অজেয়, সেই জন্য আপনারা সকলে পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কেবল ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।

কেমন যোদ্ধা ছিলেন ভীষ্ম, যিনি স্বয়ং নিজের রক্ষা করতে অক্ষম, কৌরব সেনাকে তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল? এটা কোন বাহ্য যোদ্ধা নয়, ভ্রমই ভীষ্ম। যতক্ষন ভ্রম বিদ্যমান, ততক্ষণ বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি (কৌরব) অজেয়। 'অজেয়' শব্দের অর্থ এই নয় যে, অজেয়কে জয় করা যায় না। অজেয়র অর্থ হল দুর্জয়, একে জয় করা কষ্টসাধ্য। "**মহা অজয় সংসার রিপু, জীতি সকই সো বীর।**" **(রামচরিতমানস, ৬/৮০ ক)**

যখন ভ্রম মিটে যায়, তখন অবিদ্যা অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়ে। মোহ ইত্যাদি যা কিছু আংশিক পরিমানে টিকে থাকে, তাও শীঘ্রই শেষ হয়। ভীষ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু। ইচ্ছাই ভ্রম। ইচ্ছার সমাপ্তি ও ভ্রম দূর হওয়া একই ব্যাপার। একথাই সন্ত কবীর সরলভাবে বলেছেন–

ইচ্ছা কায়া ইচ্ছা মায়া, ইচ্ছা জগ উপজায়া।
কহ কবীর জে ইচ্ছা বিবর্জিত, তাকা পার ন পায়া।।

যেখানে ভ্রম নেই, তা অপার ও অব্যক্ত। এই দেহের জন্মের কারণ ইচ্ছা। ইচ্ছাই মায়া এবং ইচ্ছাই এই জগতের উৎপত্তির কারণ। [**'সোহকাময়ত' তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি।' (ছান্দোগ্য০ ৬/২/৩)**]। কবীর বলেছেন যে, যিনি সর্বপ্রকার

কামনারহিত, **'তিনকা পার ন পায়া'**- তিনি অপার, অনন্ত, অসীম তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। [**'যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪/৪/৬)**] যিনি কামনারহিত, আত্মাতে স্থির আত্মস্বরূপ, তাঁর কখনও পতন হয় না। তিনি ব্রহ্মে সঙ্গ একীভূত হন। সাধনের আরম্ভে ইচ্ছাগুলি অনন্ত হয়, এই অনন্ত ইচ্ছার শেষ হতে হতে অবশেষে পরমাত্ম-প্রাপ্তির ইচ্ছা শেষ থাকে। যখন এই ইচ্ছাও পূর্ণ হয়, তখন ইচ্ছার বিলুপ্তি ঘটে। যদি এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকত, তাহলে তা লাভ করার ইচ্ছা অবশ্যই জেগে উঠতো। যখন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তখন ইচ্ছাও সমূলে বিনষ্ট হয়। এই ইচ্ছার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমও নাশ হয়, একেই ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বলে। এইভাবে ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা সর্বপ্রকারে অজেয়। যতক্ষণ ভ্রম দূর না হয়, ততক্ষণ অবিদ্যা সক্রিয় থাকে। ভ্রম দূর হলে, অবিদ্যা ক্রিয়াহীন হয়ে যায়।

ভীমদ্বারা রক্ষিত এদের সেনাকে জয় করা সহজ। ভাবরূপ ভীম। **'ভাবে বিদ্যতে দেবঃ'**—ভাব-এ সেই ক্ষমতা আছে যা অবিদিত পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে। **'ভাব বস্য ভগবান, সুখ নিধান করুণা ভবন।' (রামচরিতমানস, ৭/৯২ খ)** শ্রীকৃষ্ণ একেই শ্রদ্ধা বলেছেন। ভাব-এর সাহায্যে ভগবানকেও বশ করা সম্ভব। এর দ্বারাই পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ হয়। এই ভাব পুণ্যের সংরক্ষক ও এত বলবান্ যে পরমদেব পরমাত্মাকেও গোচরে এনে দেয়, অন্যদিকে অতি কোমলও, আজকের ভাব কাল অভাব এ বদলাতে দেরী লাগে না। আজ আপনি বলছেন যে, মহারাজজী খুব ভালো। কাল হয়তো বলবেন— না, আমি দেখেছি, মহারাজজী ক্ষীর খান।

ঘাস পাত যে খাত হ্যাঁয়, তিনহি সতাবৈ কাম।
দুধ মলাই খাত যে, তিনকী জানে রাম।।

অর্থাৎ তৃণভোজীদেরও কাম তাড়না দেয়, যাঁরা দুধ-মালাই খান, ঈশ্বর তাদেরই শরণ দেন।

ইষ্টের আচরণে লেশমাত্রও ত্রুটিবোধ হলে ভাব টলে ওঠে, পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহ বিচলিত হয়, ইষ্টের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা ছিন্ন হয়, তাই ভীমদ্বারা রক্ষিত তাদের সেনা জয় করা সহজ। মহর্ষি পতঞ্জলিরও সেই একই নির্ণয়— **"স তু দীর্ঘকাল**

নৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢভূমিঃ।" (যোগসূত্র, ১/১৪)। অর্থাৎ দীর্ঘকালপর্যন্ত নিরন্তর শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক করে গেলেই সাধন দৃঢ় হয়।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ।। ১২।।

এই প্রকার সকলেই নিজের বলাবল নির্ণয় করে শঙ্খধ্বনি করলেন। এই শঙ্খধ্বনি হ'ল পাত্রের পরাক্রমের ঘোষণা, যুদ্ধ জয়ের পর কোন্ পাত্র আপনাকে কি দেবে? কৌরব পক্ষে বৃদ্ধ প্রতাপবান্ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করে উচ্চস্বরে সিংহনাদের সমান ভয়প্রদ শঙ্খ বাজালেন। সিংহ প্রকৃতির ভয়াবহ দিকের প্রতীক। ঘোর জঙ্গলের নিরবস্থানে নির্জনে সিংহের গর্জন যদি কানে আসে, তাহলে দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে, ভয়ে হৃদয় কাঁপতে শুরু করবে, যদিও সিংহ থেকে আপনি বহুদূরে। ভয় প্রকৃতিজাত, পরমাত্মায় তার স্থান নেই, কারণ পরমাত্মা অভয় সত্তা। ভ্রমরূপ ভীষ্ম বিজয়ী হলে প্রকৃতির যে ভয়ারণ্যের মধ্যে আপনি আছেন, তার থেকেও ভয়ঙ্কর ভয়ের আবরণে আপনাকে ঢেকে ফেলবে। ভয়ের আরও একটি স্তর বৃদ্ধি পাবে, ভয়ের আবরণ আরও ঘন হয়ে উঠবে। ভ্রম এছাড়া আর কিছু দিতে পারে না। অতএব প্রকৃতি থেকে নিবৃত্তিই গন্তব্যে যাওয়ার পথ। সংসারে প্রবৃত্তি ভবাটবী, ঘোর অন্ধকারময়। এর বেশী কোন ঘোষণা কৌরবদের নেই। কৌরব পক্ষ থেকে কয়েকটি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল; কিন্তু সেগুলিও ভয় প্রদান করা ছাড়া আর কিছু দিতে পারল না। প্রত্যেক বিকার কিছু না কিছু ভয়ই প্রদান করে। সেই জন্য তাঁরাও ঘোষণা করলেন—

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ।। ১৩।।

তদনন্তর অনেক শঙ্খ, ভেরী, ঢোল এবং নরশিঙ্গাদি রণবাদ্য যন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল, সেগুলির শব্দও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ভয়সঞ্চার করার অতিরিক্ত কৌরবদের কোন ঘোষণা নেই। বহির্মুখী বিজাতীয় প্রবৃত্তি সফল হলে মোহরূপ বন্ধন আরও ঘন করে দেয়।

এর পর পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহের দিক্ থেকে ঘোষণা করা হল। যার মধ্যে প্রথম ঘোষণাটি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের—

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।। ১৪।।

অতপর শ্বেতাশ্বযুক্ত (যাতে বিন্দুমাত্র কালিমা বা দোষ ছিল না, শ্বেতবর্ণ সাত্ত্বিক ও নির্মলতার প্রতীক) **'মহতি স্যন্দনে'**–উত্তমরথে উপবিষ্ট যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও অলৌকিক শঙ্খ বাজালেন। অলৌকিকের অর্থ, লোকাতীত। মৃত্যুলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, জন্ম-মৃত্যুর ভয় যতদূরপর্যন্ত সেই সমস্ত লোকের অতীত পারলৌকিক, পারমার্থিক স্থিতি প্রদান করার ঘোষণা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ করলেন। সোনা-রূপো অথবা কাঠের রথ ছিল না, সেই রথ অলৌকিক ছিল, শঙ্খ অলৌকিক ছিল, অতএব ঘোষণাও অলৌকিক ছিল। একমাত্র ব্রহ্ম সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে স্থিত। সরাসরি ব্রহ্মসঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাবার ঘোষণা করলেন। কিরূপে তিনি এই স্থিতি প্রদান করবেন?–

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ।। ১৫।।

'হৃষীকেশঃ'- যিনি হৃদয়ের সর্বস্বের জ্ঞাতা, সেই শ্রীকৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজালেন। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পঞ্চ তন্মাত্রার (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) রসে জড়িয়ে স্বজন অর্থাৎ ভক্তের শ্রেণীতে দাঁড় করাবার ঘোষণা করলেন। ভয়ঙ্করভাবে ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে সেবকের শ্রেণীতে দাঁড় করানো, হৃদয়ের প্রেরক সদ্গুরুর কৃপা। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর সদ্গুরু ছিলেন। **'শিষ্যস্তেহহম্'**- ভগবন্! আমি আপনার শিষ্য। বাহ্য বিষয়-বস্তুকে ত্যাগ করে ধ্যানে ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কিছু দেখা, শোনা ও স্পর্শ না করা সদ্গুরুর অনুভব সঞ্চারণের উপর নির্ভর করে।

'দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ'- দৈবী সম্পত্তিকে অধীনে করে যে অনুরাগ, সেই অনুরাগই অর্জুন। ইষ্টের অনুরূপ শ্রদ্ধা– যাতে বিরহ, বৈরাগ্য ও অশ্রুপাত হয়, **'গদ্গদ গিরা নয়ন বহ নীরা।'**– রোমাঞ্চ হয়, ইষ্ট ছাড়া অন্য কোন বিষয়-বস্তুর লেশমাত্রও সম্পর্ক হয় না, তখন এই অবস্থাকে 'অনুরাগ' বলা হয়। এতদূর সফল হ'বার, পরেই দৈবী সম্পদের উপর প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হয়, যা পরমদেব পরমাত্মাতে একীভূত হতে সাহায্য করে। এর আরেক নাম ধনঞ্জয়। এক ধন পার্থিব সম্পত্তি, যা দিয়ে শরীর নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়, আত্মার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ

নেই। এছাড়া স্থির আত্মিক সম্পত্তিই নিজ সম্পত্তি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ দিলেন যে– ধনসম্পন্ন পৃথিবীর স্বামীত্ব দ্বারাও অমৃততত্বের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এর উপায় হল আত্মিক সম্পত্তি।

ঘোরকর্মা ভীম **'পৌণ্ড্র'** অর্থাৎ প্রীতি নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। ভাবের উদ্গম ও নিবাসস্থান হৃদয়, তাই এর এক নাম 'বৃকোদর'। আপনাদের ভাব, স্নেহ ছোটদের প্রতি স্বভাবতই থাকে; কিন্তু সেই স্নেহ উৎপন্ন হয় আপনাদের হৃদয়ে, যা গিয়ে মূর্ত হয় ছোটদের প্রতি। এই ভাব অগাধ এবং মহাবলশালী, তিনি প্রীতি নামক শঙ্খ বাজালেন। এই প্রীতি ভাব-এর মধ্যেই নিহিত, তাই ভীম **'পৌণ্ড্র'** (প্রীতি) নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। ভাব অত্যন্ত শক্তিশালী; কিন্তু প্রীতির মাধ্যমে তা সঞ্চার হয়।

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তে প্রকট হোহিঁ মৈঁ জানা।।

(রামচরিতমানস, ১/১৮৪/৫)

অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বত্র সমান রূপেই বিদ্যমান; কিন্তু তাকে প্রকট করতে হ'লে চাই হৃদয়ে প্রেম।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ।। ১৬।।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্ত বিজয়' নামক শঙ্খ বাজালেন। কর্ত্তব্যরূপ কুন্তী ও ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির। ধর্মে স্থির থাকলেই **'অনন্ত বিজয়ম্'**–অনন্ত পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ হবে। যুদ্ধে স্থিরঃ সঃ যুধিষ্ঠিরঃ। প্রকৃতি পুরুষ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষে স্থির থাকেন, অত্যন্ত দুঃখেও বিচলিত হন না, তবেই একদিন যিনি অনন্ত যাঁর অন্ত নেই, সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম হন।

নিয়মরূপ নকুল 'সুঘোষ' নামক শঙ্খ বাজালেন। যেমন যেমন নিয়ম কঠোর হবে, তেমন তেমন অশুভ লক্ষণগুলি বিলয় হয়ে যাবে ও শুভ পরিস্থিতির উদয় হবে। সৎসঙ্গরূপ সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খ বাজালেন। মনীষীগণ প্রত্যেক শ্বাসকে বহুমূল্য মণির নাম দিয়েছেন। **'হীরা জৈসী শ্বাঁসা, বাতোঁ মেঁ বীতী জায়'**। বাহ্য সৎসঙ্গ সৎপুরুষের বাণী শ্রবণকে বলে, যা এক প্রকার সৎসঙ্গ; কিন্তু যথার্থ সৎসঙ্গ হয় আন্তরিক। শ্রীকৃষ্ণের মতে আত্মাই সত্য ও সনাতন। চিত্ত যখন স্থির হয়ে আত্মার সঙ্গত করে, তখনই হয় প্রকৃত সৎসঙ্গ। এই সৎসঙ্গ চিন্তন, ধ্যান ও সমাধির

অভ্যাস দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমন যেমন সত্যের সান্নিধ্যে স্মৃতি স্থির হবে, তেমন তেমন এক একটি শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ হতে থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মনও নিরুদ্ধ হয়ে আসবে। এইপ্রকার যখন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হবে, তখন বস্তুলাভ হবে। বাদ্য যন্ত্রের মত আত্মার ধ্বনির সঙ্গে চিত্তের ধ্বনি মিলিয়ে সঙ্গত করাই যথার্থ সৎসঙ্গ।

বাহ্য মণি কঠোর হয়, কিন্তু শ্বাসরূপ মণি পুষ্প থেকেও কোমল হয়। পুষ্প তো বিকশিত হওয়ার পর অথবা বৃন্তচ্যুত হলে শুকিয়ে যায়, কিন্তু আপনি এর পরের শ্বাসপর্যন্ত জীবিত থাকার গ্যারাণ্টি দিতে পারেন না। কিন্তু সৎসঙ্গ সফল হলে প্রত্যেক শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে লক্ষ্যপ্রাপ্তি সম্ভব। এর বেশী পাণ্ডবদের কোন ঘোষণা নেই; কিন্তু প্রত্যেক সাধন নির্মলতার পথে কিছু না কিছু দূরত্ব অতিক্রম করায়। অতপর বললেন—

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ।।১৭।।

কায়ারূপ কাশী। পুরুষ যখন চারিদিক্ থেকে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে কায়াতেই কেন্দ্রিত করেন তখন '**পরমেষ্বাসঃ**'—পরম ঈশে বাস করার অধিকারী হন। পরম ঈশ্বরতত্ত্বে অবস্থান দিতে সক্ষম কায়াকেই কাশী বলে। কায়াতেই পরম ঈশ্বরের নিবাস। পরমেষ্‌বাসের অর্থ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী নয় বরং পরম + ঈশ + বাস হয়।

শিখা-সূত্রের ত্যাগই 'শিখণ্ডী'। সাধনা পথের কিছু ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আজকাল মুণ্ডিত মস্তকে, সূত্রের নামে গলার উপবীত খুলে রাখে, অগ্নিত্যাগ করে এবং একেই সন্ন্যাস বলে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। বস্তুতঃ শিখা লক্ষ্যের প্রতীক, যেখানে আপনাকে পৌঁছাতে হবে এবং সূত্র সংস্কারের প্রতীক। যতক্ষণ পরমাত্মার প্রাপ্তির না হয়, ততক্ষণ সংস্কারের সূত্রপাত হতেই থাকে, ততক্ষণ ত্যাগ কোথায়? কি প্রকার সন্ন্যাস? এখনও তো তিনি পথিক। যখন প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি হয়, পূর্বের সমস্ত সংস্কারের সূত্র ছিন্ন হয়, এইরূপ অবস্থাতে সম্পূর্ণরূপে ভ্রম মিটে যায়। সেইজন্য শিখণ্ডীই ভ্রমরূপ ভীষ্মের বিনাশ করে। শিখণ্ডী চিন্তন-পথের বিশিষ্ট যোগ্যতারূপ মহারথীকে বলে।

'**ধৃষ্টদ্যুম্নঃ**'— দৃঢ় ও অচল মন এবং '**বিরাটঃ**'— সর্বত্র বিরাট ঈশ্বরের প্রসার দেখার ক্ষমতা ইত্যাদি হ'ল দৈবী সম্পদের প্রমুখ গুণ। সাত্ত্বিকতাই 'সাত্যকি'। সত্যের

চিন্তনের প্রবৃত্তি অর্থাৎ যদি সাত্ত্বিকতা বিদ্যমান, তাহলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, এই সংঘর্ষে পরাজয় হতে দেয় না।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ।। ১৮।।

অচল পদে প্রতিষ্ঠাদাতা দ্রুপদ এবং ধ্যানরূপ দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র সহৃদয়তা, বাৎসল্য, লাবণ্য, সৌম্যতা ও স্থিরতা এরা সাধন পথের শ্রেষ্ঠ সহায়ক মহারথী এবং দীর্ঘবাহুযুক্ত অভিমন্যু এঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজালেন। বাহু কার্যক্ষেত্রের প্রতীক। মন যখন ভয়মুক্ত হয়, তখন তার শক্তি বহু দূরপর্যন্ত প্রসার লাভ করে।

হে রাজন্! এঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজালেন। কিছু কিছু দূরত্ব সকলেই অতিক্রম করান, এদের পালন আবশ্যক, তাই এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু দূরত্ব, যেটুকু বাকী থাকে, তা মন এবং বুদ্ধির অতীত। ভগবান স্বয়ং অন্তঃকরণে জাগ্রত হয়ে তা অতিক্রম করান। দৃষ্টিরূপে আত্মা থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং সম্মুখে স্বয়ং দণ্ডায়মান হয়ে নিজের পরিচয় দেন।

স ঘোযো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ।।১৯।।

সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করল। সেনা পাণ্ডব পক্ষেও ছিল, কিন্তু হৃদয় বিদীর্ণ হল কেবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের। বস্তুতঃ পাঞ্চজন্য, দৈবী শক্তির উপর আধিপত্য, অনন্তকে জয়, অশুভ শান্তি ও শুভের আবির্ভাব নিরন্তর হতে থাকলে এই কুরুক্ষেত্রে, আসুরী সম্পদ্, বহির্মুখী প্রবৃত্তিগুলির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তাদের বল ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকবে। পূর্ণ সফলতা লাভ হলে মোহময়ী প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়।

অথ ব্যবস্থিতান্দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।। ২০।।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ।।২১।।

সংযমরূপ সঞ্জয় অজ্ঞানাবৃত মনকে বোঝালেন, যে, হে রাজন্! অতপর **'কপিধ্বজঃ'**– বৈরাগ্যরূপ হনুমান, বৈরাগ্যই যার ধ্বজ (ধ্বজকে রাষ্ট্রের প্রতীক বলা হয়। কারও কারও মতে পতাকা চঞ্চল ছিল, তাই কপিধ্বজ বলা হয়েছে; কিন্তু তা নয়, এখানে কপি সাধারণ বানর নয়, স্বয়ং হনুমানই ছিলেন, যিনি মান-অপমানের হনন করেছিলেন–**'সম মান নিরাদর আদরহীঁ।' (মানস, ৭/১৩/৮)** প্রকৃতির বিষয় বস্তু থেকে আসক্তির ত্যাগই 'বৈরাগ্য'। অতএব বৈরাগ্যই যার ধ্বজ), সেই অর্জুন ব্যবস্থিত রূপে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শস্ত্র চালনার মুহূর্তে ধনুক তুলে **'হৃষীকেশম্'**– যিনি হৃদয়ের সর্বস্বের জ্ঞাতা সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন—হে অচ্যুত! (যিনি কখনও চ্যুত হন না) আমার রথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন। এখানে সারথীকে আদেশ দেওয়া নয়, ইষ্টের (সদ্‌গুরুর) প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে। কেন স্থাপন করবেন?–

যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ।। ২২।।

যতক্ষণ আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত এঁদের উত্তমরূপে নিরীক্ষণ না করি যে, এই যুদ্ধোদ্যমে আমাকে কে কে সঙ্গে যুদ্ধ করার উচিত অর্থাৎ এই যুদ্ধ ব্যবসাযে কার কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ।।২৩।।

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে সকল রাজাগণ যুদ্ধ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি দেখতে চাই, সেইজন্য রথ স্থাপন করুন। মোহরূপ দুর্যোধন। মোহমুগ্ধ প্রবৃত্তিসমূহের হিতাকাঙ্ক্ষী যে সকল রাজাগণ যুদ্ধ করবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি দেখে নিই।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুডাকেশেন ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ।। ২৪।।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ।। ২৫।।

সঞ্জয় বললেন– নিদ্রাজয়ী অর্জুনের এইরূপ বলার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি হৃদয়ের জ্ঞাতা তিনি উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও **'মহীক্ষিতাম্'**– দেহরূপ পৃথিবীকে অধিকার করেছেন যে রাজাগণ, সেই সকল রাজাগণের মধ্যে উত্তমরথ স্থাপন করে বললেন– "হে পার্থ! সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন কর।" এখানে উত্তম রথের অর্থ সোনা, রূপোর নির্মিত রথ নয়। সংসারে উত্তমের পরিভাষা নশ্বর বস্তুর অনুকূলতা-প্রতিকূলতার উরপ দেওয়া হয়; কিন্তু এই পরিভাষা পূর্ণ নয়। যা আমাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপের সঙ্গে সর্বদা সহযোগিতা করে, তাই একমাত্র উত্তম, যারপর 'অনুত্তম' অর্থাৎ মলিনতা বলে কিছু থাকে না।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথপিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।। ২৬।।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।

অতপর সুনিশ্চিত লক্ষ্যযুক্ত, পার্থিব দেহকে যিনি রথস্বরূপ বিবেচনা করেছেন, সেই পার্থ উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্যগণকে, পিতামহগণকে, আচার্যগণকে, মাতুলগণকে, ভ্রাতাগণকে, পুত্রগণকে, পৌত্রগণকে, মিত্রগণকে, শ্বশুরগণকে ও সুহৃদ্‌গণকে অবস্থিত দেখলেন। উভয় সেনাদলের মধ্যে অর্জুন কেবল নিজের পরিবার, মামার পরিবার, শ্বশুরের পরিবার, সুহৃদ্ ও গুরুজনদের দেখতে পেলেন। মহাভারতকালের গণনানুসারে আঠারো অক্ষৌহিনী আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ্যের সমকক্ষ হবে, কিন্তু প্রচলিত গণনানুসারে আঠারো অক্ষৌহিনী আনুমানিক সাড়ে ছয় আরব সংখ্যায় হবে, যা আজকের বিশ্বের জনসংখ্যার সমকক্ষ। আজ সমগ্র বিশ্বে মাত্র ততই জনসমূহের জন্য বিশ্বস্তরে আবাস, খাদ্য ও জনসংখ্যার সমস্যা সমুপস্থিত। এই বিশাল জনসমূহ অর্জুনের তিন-চারটি আত্মীয়ের পরিবারই মাত্র ছিল। এতবিশাল পরিবার কি কারও হয়? কখনই না। এ সকলই হৃদয়-দেশের ছবি।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।। ২৭।।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

কুন্তীপুত্র অর্জুন সেই বন্ধুগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অত্যন্ত করুণাপূর্ণ হয়ে শোক করতে লাগলেন, কারণ দেখলেন এরা সকলেই তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজন, অতএব বললেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ।। ২৮।।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।।২৯।।

হে কৃষ্ণ! আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গা অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হচ্ছে। আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। কেবল এতটাই নয়—

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।। ৩০।।

হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে এবং চর্ম যেন দগ্ধ হচ্ছে। তিনি সন্তপ্ত হয়ে উঠেছেন যে, এই যুদ্ধ কি ধরনের, যার মধ্যে শুধু স্বজনই দাঁড়িযে? অর্জুনের ভ্রম হয়েছিল। তিনি বললেন—এখন আমি দাঁড়াতেও অসমর্থ, এখন এর বেশী দেখার সামর্থ্য নেই।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।। ৩১।।

হে কেশব! এই যুদ্ধের লক্ষণও বিপরীত দেখছি। যুদ্ধে আত্মীয়দের বধ করলে মঙ্গল হবে, এও দেখি না। কুলকে বধ করলে কল্যাণ কিরূপে সম্ভব?

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।। ৩২।।

সম্পূর্ণ পরিবার যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের যুদ্ধে বধ করে বিজয়, বিজয়ের দ্বারা প্রাপ্ত রাজ্য ও রাজ্যসুখ অর্জুন চান না। তিনি বললেন— হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাই না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি

প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণেই কি প্রয়োজন? কেন? এর উত্তরে বললেন—

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।। ৩৩।।

যাঁদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখাদি আমার অভিলষিত, সেই স্বজনগণই প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন। আমার রাজ্য অভিলষিত ছিল তো পরিবার নিয়ে, ভোগ-সুখ ও ধনাদির পিপাসা ছিল তো স্বজন ও পরিবারকে নিয়ে ভোগ করার ছিল; কিন্তু যখন তারা সকলেই প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তো আমার সুখ, ভোগ বা রাজ্যের প্রয়োজন নেই। এ সকলই এদের জন্য প্রিয় ছিল। এদের থেকে পৃথক্ হয়ে এ সকলের আমার আর প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পরিবার থাকে ততক্ষণ এই কামনাগুলিও থাকে। কুঁড়েঘরে বাস করে যে ব্যক্তি, সেও নিজের পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয়দের বধ করে বিশ্বের সাম্রাজ্য স্বীকার করবে না। অর্জুনের বক্তব্য এই যে ভোগ, যুদ্ধে জয়লাভ আমি চেয়েছিলাম; কিন্তু যাদের জন্য চেয়েছিলাম, যখন তারাই থাকবে না, তখন আর আমার ভোগের কি প্রয়োজন? এই যুদ্ধে আমি কাকে বধ করব?—

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।। ৩৪।।

এই যুদ্ধে আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও স্বজনগণই উপস্থিত হয়েছেন।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।। ৩৫।।

হে মধুসূদন! এঁরা আমাকে বধ করলেও, ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যও আমি এঁদের বধ করতে চাই না; পৃথিবী মাত্র রাজ্যের জন্য কি কথা?

আঠারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে অর্জুন কেবল নিজের পরিবারকেই দেখতে পেয়েছিলেন, এত অধিক স্বজন বাস্তবে কারা? বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। ভজনের শুরুতে প্রত্যেক অনুরাগীর সমক্ষে এই সমস্যাই দেখা দেয়। সকলেই চায় ভজন

করে, পরম সত্যকে লাভ করতে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সদগুরুর সংরক্ষণে অনুরাগী সাধক যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ অনুভব করেন, তাঁকে কার কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে বুঝতে পারেন, তখনই হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি চান তাঁর পিতার পরিবার, শ্বশুরের পরিবার, মামার পরিবার, সুহৃদ্, বন্ধু ও গুরুজন সঙ্গে থাকুন, সকলেই সুখী থাকুন এবং এঁদের সকলকে ব্যবস্থিত করে তিনি পরমাত্ম-স্বরূপ লাভও করে নেবেন। কিন্তু যখন জানতে পারেন, আরাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে পরিবার ত্যাগ করতে হবে, এই সম্বন্ধগুলির মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে, তখন তিনি অধীর হয়ে ওঠেন।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন- "মৃত্যু হওয়া ও সাধু হওয়া একই ব্যাপার। সাধুর জন্য এই পৃথিবীতে কেউ জীবিত থাকলেও; গৃহ সম্বন্ধীয় কেউই থাকবে না। যদি থাকে, তাহলে সম্বন্ধ বিদ্যমান, মোহ শেষ হয়েছে কোথায়? পূর্ণ ত্যাগ অর্থাৎ সম্বন্ধের অস্তিত্ব বিলীন হবার পরেই সাধক জয়লাভ করেন। এই সম্বন্ধগুলির প্রসারই জগৎ, অন্যথা জগতে আমার বলে কি আছে?" **'তুলসীদাস কহ চিদ্‌বিলাস জগ, বুঝত বুঝত বুঝৈ।' (বিনয়পত্রিকা, ১২৪)** অর্থাৎ মনের প্রসারই এই জগৎ। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মনের প্রসারকেই জগৎ বলে সম্বোধন করেছেন। যিনি এর প্রভাব রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি চরাচর বিশ্ব জয় করেছেন। **"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।" (গীতা, ৫/১৯)**

এমন কথা নয় যে কেবল অর্জুনই অধীর ছিলেন, সকলের হৃদয়েই অনুরাগ আছে। প্রত্যেক অনুরাগীই ব্যাকুল হন। আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করে। সাধনারম্ভে প্রত্যেক সাধক চিন্তা করেন যে ভজন করে কিছু লাভ হলে, এদের সঙ্গে তা ভোগ করা যাবে, সকলেই সুখী হবে; কিন্তু যখন এরা সঙ্গে থাকবে না, তখন সুখের আর কি প্রয়োজন? অর্জুনের দৃষ্টি রাজ্য-সুখপর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ত্রিলোকের সাম্রাজ্যকেই সুখের পরাকাষ্ঠা ভেবেছিলেন। এর বেশী কোন সত্য আছে, একথা অর্জুন এখনও জানেন না।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।। ৩৬।।

হে জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করলে আমাদের কি সুখ হবে? যেখানে ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ ধৃষ্টতার রাষ্ট্র, তার থেকে উৎপন্ন মোহরূপ দুর্যোধনাদিকে বধ করলে

আমাদের কি আনন্দ হবে? এই সকল আততায়ীকে বধ করলে আমাদেরকে পাপই আশ্রয় করবে। জীবন-যাপনের তুচ্ছ লাভের জন্য যে অনীতির সাহায্য নেয়, তাকে আততায়ী বলে; কিন্তু যে আত্মোন্নতির পথে অবরোধ সৃষ্টি করে, সে আরও বড় আততায়ী। আত্মদর্শনে বাধক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদিই আততায়ী।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ৩৭।।

অতএব হে মাধব! স্বীয় বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। স্ব-বান্ধব কিরূপে? তারা সকলেই তো শত্রু ছিল। বস্তুতঃ শরীরের আত্মীয়তা অজ্ঞানজনিত। ইনি মামা, শ্বশুরবাড়ি, স্বজন সমুদায় এসকলই অজ্ঞান। যখন এই দেহটাই নশ্বর, তখন এর কুটুম্বিতাই কি করে শাশ্বত হবে? যতক্ষণ মোহ, ততক্ষণই আমার সুহৃদ্, আমার পরিবার, আমার জগৎ। মোহ নেই তো কিছুই নেই। সেই জন্য অর্জুন শত্রুদেরও স্বজনরূপেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলছেন যে নিজ কুটুম্বকে বধ করে আমরা কিরূপে সুখী হব? যদি অজ্ঞান ও মোহ না থাকে তবে কুটুম্বেরও কোন অস্তিত্ব নেই। এই অজ্ঞানই আবার জ্ঞানেরও প্রেরক। ভর্তৃহরি, তুলসীদাস ইত্যাদি অনেক মহাপুরুষগণ বৈরাগ্যের প্রেরণা তাঁদের স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কেউ বা বিমাতার ব্যবহারে ব্যথা পেয়ে বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে গেছেন দেখা গেছে।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।। ৩৮।।

যদিও এরা লোভে অভিভূত হয়ে কুলনাশজনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহে যে পাপ হয়, তা দেখছে না, এ দোষ তাদের, তাসত্ত্বেও–

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।। ৩৯।।

হে জনার্দ্দন! কুলনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও আমরা এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হব না কেন? কেবল আমিই পাপ করছি এমন কথা নয়, আপনিও ভুল করছেন– শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করলেন। এখনও তিনি নিজেকে বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কম মনে করছেন না। প্রত্যেক নতুন সাধক সদ্‌গুরুর শরণাগত

হবার পরে এই ধরণের তর্ক করেন এবং নিজে যে কম জানেন তা ভাবেন না। একথাই অর্জুনও বলছেন যে এরা না বুঝুক, কিন্তু আমরা তো বুদ্ধিমান। কুলনাশজনিত দোষের উপর আমাদের অবশ্যই বিচার করা উচিত। কুলনাশে কি কি দোষ হয়?–

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।৪০।।

কুলনাশে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। অর্জুন কুলধর্ম, কুলাচারকেই সনাতন ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। ধর্ম নষ্ট হলে সম্পূর্ণ কুলকে পাপ দাবিয়ে দেয়।

অধর্মাভিভবাৎকৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।। ৪১।।

হে কৃষ্ণ! পাপের বৃদ্ধি হলে কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হয়। হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। অর্জুনের দৃষ্টিকোণে কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করে আরও বলছেন–"আমি অথবা স্বরূপস্থিত মহাপুরুষ যদি আরাধনা ক্রমে ভ্রম উৎপন্ন করেন, তাহলে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়। বর্ণসঙ্করের দোষের উপর অর্জুন আলোকপাত করছেন–

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।। ৪২।।

বর্ণসঙ্কর হলে কুলনাশকগণ এবং কুল নরকে পতিত হয়। যাদের পিণ্ডক্রিয়া লুপ্ত হয়েছে, তাদের পিতৃপুরুষগণও পতিত হন। বর্তমান নষ্ট হয়, পিতৃপুরুষগণ স্খলিত হন ও উত্তর পুরুষদেরও পতন হবে। কেবল এই নয়–

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।। ৪৩।।

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা কুল এবং কুলঘাতকগণের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়। অর্জুন মনে করতেন যে, কুলধর্ম সনাতন, কুলধর্মই শাশ্বত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একথা খণ্ডন করে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বললেন–"আত্মাই সনাতন, শ্বাশত ধর্ম।" বাস্তবিক সনাতন ধর্মকে জানার আগে মানুষ ধর্মের নামে কোন না কোন চিরাগত কুরীতি মেনে চলে। তেমনিই অর্জুনও যা জানতেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে তা কুপ্রথা।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকেঽনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।। ৪৪।।

হে জনার্দন ! যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে, তাদের অনন্তকাল নরকে বাস করতে হয়, এইরূপ আমি শুনেছি। কেবল কুলধর্মই নষ্ট হয় না, বরং শাশ্বত সনাতন ধর্মও নষ্ট হয়ে যায়। যাদের ধর্ম নষ্ট হয়, তাদের অনন্তকালপর্যন্ত নরকে বাস করতে হয়, এটা আমি শুনেছি। দেখিনি, কেবল শুনেছি।

অহো বত মহৎপাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। ৪৫।।

হায় ! দুঃখের বিষয় যে আমরা বুদ্ধিমান্ হয়েও মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। রাজ্যসুখের লোভে নিজকুলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি।

এখনও পর্যন্ত অর্জুন নিজেকে কম জ্ঞাতা বলে মনে করছেন না। শুরুতে প্রত্যেক সাধক এইরূপ বলেন। মহাত্মা বুদ্ধও বলেছেন যে— মানুষ আংশিক অবগত হলে, নিজেকে মহাজ্ঞানী বলে মনে করেন, ও যখন অর্ধেকের বেশী অবগত হন তখন নিজেকে মহামুর্খ বলে মনে করেন। তেমনিই অর্জুনও নিজেকে জ্ঞানীই ভাবছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছেন যে, এই পাপ থেকে পরমকল্যাণ হবে এমন কথাও নয়, কেবল রাজ্যসুখের লোভে পড়ে আমরা কুলনাশ করতে উদ্যত হয়েছি, খুব ভুল করছি। কেবল আমিই ভুল করছি এমন কথা নয়, আপনিও ভুল করছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করলেন। অবশেষে অর্জুন নির্ণয় করলেন—

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ৪৬।।

প্রতিকাররহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধও করেন, তাতে আমার জন্য অতি কল্যাণকর হবে। ইতিহাস তো বলবে যে অর্জুন জ্ঞানী ছিলেন, তাই আত্মবলি দিয়ে যুদ্ধ হতে দেননি। সন্তান-সন্ততির সুখের জন্য, কুলের জন্য লোকে প্রাণের আহুতি পর্যন্ত দেয়। বিদেশে গিয়ে বৈভবপূর্ণ প্রাসাদে থাকলেও অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কুঁড়েঘরের কথা মনে পড়ে। মোহ এত প্রবল হয়। তাই অর্জুন বললেন যে, শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ প্রতিকারে অনিচ্ছুক আমাকে যদি যুদ্ধে বধও করেন, তবু তা আমার জন্য অতি কল্যাণকর হবে, পরিবার তো সুখী থাকবে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।। ৪৭।।

সঞ্জয় বললেন—রণভূমিতে শোক-সন্তপ্ত অর্জুন এইরূপ বলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের পশ্চাদভাগে বসে পড়লেন অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

নিষ্কর্ষ ঃ

গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরীয় বিভূতিসম্পন্ন ভগবৎ স্বরূপের সম্যক্ দর্শন করবার গায়ন হ'ল এই গীতাশাস্ত্র। যে ক্ষেত্রে এই গায়ন সম্পাদন করা হয়, সেই যুদ্ধক্ষেত্র এই 'শরীর'। যার অন্তরালে দুটি প্রবৃত্তি বিরাজমান—'ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র'। যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেনাসমূহের স্বরূপ ও তাদের শক্তির আধার বর্ণিত হয়েছে, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে এদের পরাক্রম নির্ধারিত করা হয়েছে। তদনন্তর যে সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করার ছিল, তাদের নিরীক্ষণ করা হল। এদের গণনা আঠারো অক্ষৌহিনী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় আরব বলা হয়, কিন্তু এরা অনন্ত। এই প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ দুটি—একটি ইষ্টোন্মুখী প্রবৃত্তি—'দৈবী সম্পদ্', দ্বিতীয়টি বহির্মুখী প্রবৃত্তি—'আসুরী সম্পদ্'। দুটিই প্রকৃতি। একটি ইষ্টের দিকে উন্মুখ করে, পরমধর্ম পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়, অন্যটি প্রকৃতিতে বিশ্বাস করায়। প্রথমে দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি করে, আসুরী প্রবৃত্তিগুলিকে নিঃশেষ করা হয়, তারপর শাশ্বত সনাতন পরব্রহ্মের দিগ্‌দর্শন ও তাঁতে স্থিতি লাভের পর দৈবী প্রবৃত্তিগুলির প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায় এবং যুদ্ধের পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়।

সৈন্য নিরীক্ষণের সময় অর্জুন কেবল নিজের পরিবারকেই দেখতে পেয়েছিলেন। যাঁদের বধ করার কথা ছিল, তাঁরা স্বজনই ছিলেন। জীবের যতদূর পর্যন্ত সম্বন্ধ থাকে, জগতের বিস্তারও তারজন্য ততদূর পর্যন্তই। অনুরাগের আরম্ভিক অবস্থায় পারিবারিক মোহই বাধা দেয়। সাধক যখন দেখেন পরিবারের মধুর সম্বন্ধ থেকে তাঁর এতদূর বিচ্ছেদ হবে, যেন তা কখনও ছিল না, তখন তিনি ব্যাকুল হন। স্বজনাসক্তি ত্যাগ করার পথে যতরকমের অকল্যাণই দেখতে পান তিনি কুপ্রথার মাধ্যমে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন, ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। তিনি

বলেছিলেন—“কুলধর্মই সনাতন ধর্ম। এই যুদ্ধ হলে সনাতন ধর্ম লোপ পাবে। কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হবে এবং বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। তাদের জন্ম কুল ও কুলনাশকদের অনন্তকালপর্যন্ত নরকে বাস করার জন্যই হয়ে থাকে।” অর্জুন নিজবুদ্ধি অনুসারে সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন যে আমরা বুদ্ধিমান্ হয়ে এই মহাপাপ কেন করব ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও পাপ করতে যাচ্ছেন। অবশেষে পাপ থেকে বাঁচবার জন্য “আমি যুদ্ধ করব না”-এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে হতাশ হয়ে রথের পশ্চাদভাগে বসে পড়লেন; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

টীকাকারগণ বর্তমান অধ্যায়ের নামকরণ ‘অর্জুন বিষাদযোগ’ করেছেন। অর্জুন অনুরাগের প্রতীক। সনাতন ধর্মের জন্য ব্যাকুল অনুরাগীর বিষাদ যোগই কারণ হয়। এই বিষাদ মনুর হয়েছিল—**‘হৃদয় বহুত দুঃখ লাগ, জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু।’ (রাম. ১/১৪২)** সংশয়ে পড়েই মানুষ বিষাদ করে। অর্জুনের সন্দেহ হয়েছিল যে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, যারা নরকে নিয়ে যাবে। সনাতন ধর্মলোপ পাবে এই বিষাদও তাঁর হয়েছিল। অতএব ‘সংশয়-বিষাদ যোগ’ এর সামান্য নামকরণ বর্তমান অধ্যায়ের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়। অতঃ—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ‘সংশয়বিষাদযোগো’ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে ‘সংশয়-বিষাদ যোগ’ নামক প্রথম অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরমানন্দস্য শিষ্যস্বামীঅড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়াঃ ‘যথার্থ গীতা’ ভাষ্যে ‘সংশয়বিষাদযোগো’ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।১।।

এই প্রকার শ্রীমৎ পরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র ভাষ্য ‘যথার্থ গীতা’তে ‘সংশয়-বিষাদ যোগ’ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।।

প্রথম অধ্যায় গীতার প্রবেশিকা মাত্র, সাধনারম্ভে পথিকের যেগুলি সমস্যা বলে বোধ হয় তাতে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এখানে সংশয়ের পাত্র কেবল অর্জুন। অনুরাগই অর্জুন। ইষ্টের প্রতি অনুরাগই পথিককে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষের জন্য প্রেরণা প্রদান করে। অনুরাগ আরম্ভিক স্তর। পূজ্য মহারাজজী বলতেন–"সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি অন্তরাত্মায় গ্লানি বোধ, অশ্রুপাত হয়, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তবে জানবে যে এই স্থান থেকেই ভজনা আরম্ভ হল।" অনুরাগের মধ্যেই সবকিছু এসে যায়। এরই মধ্যে সকল ধর্ম, নিয়ম, সৎসঙ্গ, ভাব সবকিছু বিদ্যমান।

অনুরাগের প্রথম পর্বে পারিবারিক মোহ বাধক হয়। প্রথমে সকলেই চান যে আমিও পরমসত্য লাভ করি, কিন্তু এই পথে এগিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারেন যে এই মধুর পারিবারিক সম্বন্ধ উচ্ছেদ করতে হবে, তখন হতাশ হয়ে পড়েন। সমাজে প্রচলিত যা কিছু ধর্ম-কর্ম বলে মেনে চলতেন, তাতেই সন্তুষ্ট হন। নিজের মোহের পুষ্টির জন্য তিনি প্রচলিত কুরীতির প্রমাণও প্রস্তুত করেন, যেমন অর্জুন বললেন যে কুলধর্ম সনাতন, যুদ্ধে সনাতন ধর্ম লোপ পাবে, কুলক্ষয় হবে, স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধি পাবে। এই বক্তব্য অর্জুনের ছিল না, বরং সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসার পূর্বে যে কুরীতি মেনে চলতেন শুধু তাই ছিল।

এইসব কুপ্রথায় জড়িত মানুষ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ছোট-বড় দল এবং অসংখ্য জাতির সৃষ্টি করেছে। কেউ নাক চেপে ধরে, কেউ বা কানের লতি চিরে নেয়। আবার কাউকে ছুঁলে জাত যায়, কোথাও রুটি-জলে ধর্ম নষ্ট হয়। তবে কি অস্পৃশ্য অথবা স্পর্শকারীর দোষ? কখনই না, দোষ আমাদের সমাজের ভ্রমদাতাদের। ধর্মের নামে আমরা কুরীতির শিকার হয়েছি, কাজেই দোষ আমাদের।

মহাত্মা বুদ্ধের সময় কেশ-কম্বল নামে এক সম্প্রদায় ছিল। সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা কেশ বড় করে কম্বলের মত প্রয়োগ করাকেই পূর্ণতার মানদণ্ড বলে মনে করত। কেউ গোব্রতিক (গাভীর মত পশুবৎ জীবনযাপন করত) ছিল, কেউ কুকুরব্রতিক (কুকুরের মত খাওয়া-দাওয়া, থাকা) ছিল। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে এই সকলের কোন সম্বন্ধ নেই। এই সম্প্রদায় এবং সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা পূর্বেও ছিল, আজও আছে। ঠিক এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের সময়ও বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং কুরীতি প্রচলিত ছিল। যার মধ্যে দু একটি কুরীতির শিকার অর্জুনও হয়েছিলেন। তিনি চারটি তর্ক প্রস্তুত করলেন–(১) এই যুদ্ধে সনাতন ধর্ম নষ্ট হবে, (২) বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, (৩) পিণ্ডোদক ক্রিয়া লোপ পাবে এবং (৪) আমরা কুলক্ষয়ে যে মহাপাপ হয়, সেই পাপ করবার জন্য উদ্যত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।। ১।।

করুণাব্যাপ্ত, অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুল নেত্রযুক্ত অর্জুনকে ভগবান মধুসূদন (মদ-বিনাশক ভগবান) এই কথা বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।। ২।।

অর্জুন ! এই বিষমস্থলে তোমার এই অজ্ঞান কেথেকে এল ? বিষমস্থল অর্থাৎ সৃষ্টিতে যার সমতার স্থান কোন নেই, পারলৌকিক যার লক্ষ্য, সেই নির্বিবাদ স্থলে কোন কারণে তোমার অজ্ঞান উৎপন্ন হল ? এই অজ্ঞান কেন ? অর্জুন তো সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্যই এখানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য প্রাণপণে তৎপর হওয়া কি অজ্ঞান ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ, এটা অজ্ঞান। তা'না হলে অতীতে কোন না কোন শ্রেষ্ঠ মনীষী অবশ্যই এর আচরণ করতেন। তাই এই কর্ম স্বর্গও দিতে পারে না, কীর্ত্তিও বৃদ্ধি করতে অসমর্থ। যিনি সৎপথে চলেন, তিনিই আর্য। গীতা

আর্য-সংহিতা পরিবারের জন্য নষ্ট হওয়া যদি অজ্ঞানতা না হত, তবে মহাপুরুষগণ অবশ্যই সেই পথে অনুগমন করতেন। যদি কুলধর্মই সত্য হত, তাহলে স্বর্গ ও কল্যাণের শ্রেণীভাগ অবশ্যই হত। এটা কীর্ত্তিদায়কও নয়। মীরা ভজন করতে শুরু করলেন তখন **'লোগ কহে মীরা ভই বাওরী, সাস কহে কুলনাশী রে**।' কিন্তু যে পরিবার কুল ও মর্যাদার রক্ষার জন্য মীরার শাশুড়ী বিলাপ করছিলেন, আজ সেই কুলবতী শাশুড়ীকে কেউ জানে না, মীরাকে বিশ্ব জানে। ঠিক তেমনিই যারা পরিবারের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাদেরও কীর্ত্তি কতদিনের জন্য স্থায়ী? যেখানে কীর্ত্তি নেই, কল্যাণ নেই এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যার আচরণ করেননি, তবেই একথা প্রমাণিত হল যে তা অজ্ঞান। অতএব–

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ৩।।

হে অর্জুন! ক্লীবভাব আশ্রয় করো না। তাহলে কি অর্জুন নপুংসক ছিলেন? আপনি কি পুরুষ? যে পৌরুষহীন সেই নপুংসক। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে পুরুষার্থ করে। কৃষক রাত-দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেত-এ পুরুষার্থ করে। কেউ ব্যবসা বাণিজ্যকে পুরুষার্থ বলে মনে করে, কেউ পদের অপব্যবহার করে পুরুষার্থী হয়। সারাজীবন পুরুষার্থ করেও অবশেষে শুধু হাতে যেতে হয়। তাহলে এই কথা স্পষ্ট হল যে এই কার্যগুলি পুরুষার্থ নয়। শুদ্ধ পুরুষার্থ 'আত্মদর্শন'। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন–

নপুংসক পুমান্ জ্ঞেয়ো যো ন বেত্তি হৃদি স্থিতম্।

পুরুষং স্বপ্রকাশং তস্মানন্দাত্মানমব্যয়ম্।। (আত্মপুরাণ)

"সেই ব্যক্তি পুরুষ হয়েও নপুংসক, যে হৃদয়স্থ আত্মাকে জানে না। সেই আত্মাই পুরুষস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, উত্তম আনন্দময় এবং অব্যক্ত। সেই আত্মাকে জানার প্রয়াসই পৌরুষ।" তাই হে অর্জুন! তুমি ক্লীবভাব আশ্রয় করো না। এইরূপ ভাব তোমার শোভা পায় না। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আসক্তি ত্যাগ কর। এটা হৃদয়ের দুর্বলতা। তখন অর্জুন তৃতীয় প্রশ্ন করলেন–

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।। ৪।।

অহঙ্কার শমনকারী মধুসূদন! আমি রণভূমিতে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণের সঙ্গে বাণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করব? কারণ হে অরিসূদন! এঁরা দুইজনেই পূজনীয়।

দ্বৈতই দ্রোণ। প্রভু ভিন্ন, আমি ভিন্ন—দ্বৈতের এই বোধই প্রাপ্তির প্রেরণার আরম্ভিক স্রোত। এটাই দ্রোণাচার্যের গুরুত্ব। ভ্রমই ভীষ্ম। যতক্ষণ ভ্রম বিদ্যমান, ততক্ষণ সন্তান, পরিবার, আত্মীয় সকলেই নিজের বলে মনে হয়। ভ্রমের জন্যই নিজের বলে বোধ হয়। আত্মা এঁদেরই পূজ্য বলে মনে করে, এঁদের সঙ্গে থাকে যে ইনি পিতা, ইনি ঠাকুরদা, কুলগুরু ইত্যাদি। সাধনা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন '**গুরু ন চেলা পুরুষ অকেলা**'।

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ।

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।। (আত্মষটক, ৫)

যখন চিত্ত পরম আনন্দে বিলীন হয়, তখন গুরু জ্ঞানাদাতা থাকেন না ও শিষ্যও গ্রহণকর্ত্তারূপে থাকে না। এটাই পরমস্থিতি। গুরুর গুরুত্ব লাভ করার পর গুরু শিষ্য একাকার হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন! তুমি আমাতে নিবাস করবে।' এখানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের, পরে সেইরূপই লাভ করবেন অর্জুন এবং ঠিক তেমনিই স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ হন। এরূপ অবস্থাতে গুরুর গুরুত্ব বিলীন হয়ে যায়, ও সেই গুরুত্ব শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চার হয়। অর্জুন গুরুপদের দোহাই দিয়ে এই সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তিনি বলছেন—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।। ৫।।

এই মহানুভব গুরুজনদের বধ না করে ইহজগতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেও আমার কল্যাণ হবে বলে মনে করি। এখানে ভিক্ষার অর্থ ভরণ-পোষণের জন্য ভিক্ষা করা নয়; বরং সৎপুরুষের যথাসাধ্য সেবা করে, তাঁর কাছ থেকে কল্যাণের প্রার্থনা করাই ভিক্ষা। **'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' (তৈত্তিরীয় উপ. ২/১)** অন্নই একমাত্র পরমাত্মা, যা গ্রহণ করে আত্মা সর্বদার জন্য তৃপ্ত হয়ে যায়, আর কখনও অতৃপ্ত হয় না। আমরা মহাপুরুষের সেবা ও যাচনাদ্বারা ধীরে ধীরে ব্রহ্মপীযুষ পান করতে চাই, কিন্তু এই পরিবার যাতে ত্যাগ করতে না হয়, এখানে এই ছিল অর্জুনের ভিক্ষান্নের কামনা। সংসারের অধিকাংশ লোকে এই রকমই করে। তারা চায় যে, পারিবারিক স্নেহসম্বন্ধ অটুট থাকুক ও মুক্তির পথও ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে থাক। সাধনা পথের পথিক যিনি, যাঁর সংস্কার এদের চেয়ে উন্নত, যাঁর মধ্যে সংঘর্ষ করার ক্ষমতা আছে, স্বভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব বিরাজিত, তাঁর জন্য এই ভিক্ষান্নের বিধান নেই। নিজের ক্ষমতা অনুসারে কিছু না করে, যাচনা করাই ভিক্ষা। গৌতম বুদ্ধ তাঁর মজ্ঝিম নিকায়ের ধম্মদায়াদসুত্ত (১/১/৩) এতে এই ভিক্ষান্নকে আমিষ দায়াদ বলে হেয় করেছেন। যদিও জীবনযাপন তাঁরা ভিক্ষুর মতই করতেন।

এই গুরুজনদের বধ করে কি লাভ হবে? এই লোকে রুধিরাক্ত অর্থ ও কামনার জন্য যে ভোগ, সেই ভোগের বাসনাই পূরণ হবে। অর্জুন ভেবেছিলেন ভজন করলে ভৌতিক সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এরূপ কঠিন সংঘর্ষ করার পরও শরীরের পোষক অর্থ ও কামনার যে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী সেগুলিই তো ভোগ করার জন্য লাভ হবে। পুনরায় তিনি তর্কের অবতারণা করলেন–

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।। ৬।।

এও নিশ্চিত নয় যে সেই ভোগলাভ হবেই। এও জানি না যে আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয়স্কর; কারণ এপর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি সে সমস্ত অজ্ঞান বলে প্রমাণিত হয়েছে। এও জানি না যে আমরা জয়লাভ করব অথবা তারা করবে? তাদের বধ করে আমি বেঁচে থাকতে চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমার সম্মুখে

দণ্ডায়মান। অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র থেকে উৎপন্ন মোহ ইত্যাদি স্বজন সমুদায় ধ্বংসই যখন হয়ে যাবে, তখন আমি বেঁচেই বা কি করব? অর্জুন পুনরায় ভেবে দেখলেন যে, যা কিছু তিনি বলছেন হতে পারে তাও অজ্ঞান, তাই তিনি প্রার্থনা করলেন–

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢচেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭।।

কাপুরুষতা দোষে স্বভাব অভিভূত হয়েছে ও ধর্মবিষয়ে আমার চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা কল্যাণকর তা নিশ্চয়পূর্বক বলুন। কারণ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমার মঙ্গল করুন। শুধু শিক্ষা নয়, পথভ্রান্ত হলে রক্ষা করুন। "লাদ দে লদায় দে, অওর লদানেওয়ালা সাথ চলে–কখনও বোঝা পড়ে গেলে, তা ওঠাবে কে।" অর্জুনের সমর্পণ এই ধরণের ছিল।

এখানে অর্জুন পূর্ণ সমর্পণ করে দিলেন। এপর্যন্ত তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের স্তরেরই মনে করেছিলেন, কিছু কিছু বিদ্যাতে নিজেকে শ্রেষ্ঠই ভেবেছিলেন। এখানে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণের হাতেই তুলে দিলেন। সদ্‌গুরু সাধনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত হৃদয়ে স্থিত থেকে সাধকের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যদি তিনি সঙ্গে না থাকেন, তবে সাধকের পক্ষে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। পিতা-মাতা যেমন কন্যার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সংযমের শিক্ষা দিয়ে তার সংরক্ষণ করেন, তদ্রূপ সদ্‌গুরু নিজের শিষ্যকে অন্তরাত্মা থেকে সারথী হয়ে, প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত করে দেন। এখানে অর্জুন নিবেদন করলেন যে ভগবন্! আর একটা কথা–

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।। ৮।।

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক ধনধান্যসম্পন্ন রাজ্য এবং দেবতাগণের অধিপতি ইন্দ্রপদ লাভ হলেও আমার ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করতে পারে এমন কোনও উপায় দেখছি না। যখন শোক বিদ্যমান, তখন এই সমস্ত সম্পদ্ নিয়ে আমি কি করব? যদি এই মাত্র লাভ হবে, তবে ক্ষমা করুন। অর্জুন চিন্তা করলেন যে এর থেকে বেশী বলবেনই বা কি?

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুডাকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।। ৯।।

সঞ্জয় বললেন— হে রাজন্! মোহনিদ্রাজয়ী অর্জুন হৃদয়ের সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলবার পর 'আমি যুদ্ধ করব না' বলে নীরব হলেন। এপর্যন্ত অর্জুনের দৃষ্টি পৌরানিকই ছিল, যাতে কর্মকাণ্ড সমাপনের পর ভোগোপলব্ধির বিধান বিদ্যমান, যেখানে স্বর্গকেই সবকিছু বলে স্বীকার করা হয়েছে— যার উপর শ্রীকৃষ্ণ আলোকপাত করবেন যে, এ বিচারধারাও ভুল।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।। ১০।।

তদনন্তর হে রাজন্! অন্তর্যামী যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যে শোকাতুর অর্জুনকে হেসে এই কথা বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। ১১।।

অর্জুন! যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করছ, এবং পণ্ডিতের মত কথা বলছ; কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কা'রও জন্য শোক করেন না, কারণ তাদেরও একদিন মৃত্যু হবে। তুমি কেবল পণ্ডিতদের মত কথাই বল, বস্তুতঃ জ্ঞাতা নও, কেননা—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্।। ১২।।

একথাও নয় যে আমি অর্থাৎ সদ্‌গুরু কোনও কালে ছিলাম না এমন নয়, তুমি অর্থাৎ অনুরাগী অধিকারী কখনও ছিলে না তাও নয়, বা '**জনাধিপাঃ**'– এই রাজাগণ অর্থাৎ রাজসিক বৃত্তিতে যে অহংকার পাওয়া যায়, তা ছিল না, এবং একথাও নয় যে ভবিষ্যতে আমরা কেউ থাকব না। সদ্‌গুরু সর্বদাই থাকেন ও অনুরাগীও সর্বদা থাকে। এখানে যোগেশ্বর যোগের অনন্ততার উপর আলোকপাত করে ভবিষ্যতেও এর বিদ্যমানতার উপর জোর দিলেন। মরণধর্মাদের জন্য শোক না করার কারণ দেখিয়ে আরও বললেন—

দেহিনোঽস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। ১৩।।

যেমন জীবাত্মার এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা ক্রমে উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিতে ধীর পুরুষ মুগ্ধ হন না। কখনও আপনি বালক ছিলেন, ক্রমে যুবক হলেন; কিন্তু এর জন্য আপনার মৃত্যু তো হয়নি? আবার একদিন বৃদ্ধ হলেন। পুরুষ একটাই, তেমনি নতুন দেহ প্রাপ্তিতে কোন বাধা নেই। দেহের এই পরিবর্ত্তন ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ এই পরিবর্ত্তনের অতীত কোন বস্তুলাভ না হয়।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। ১৪।।

হে কুন্তীপুত্র! সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হেতু অনুভূত হয়, তাই ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য। অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি এদের ত্যাগ কর।

অর্জুন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগজনিত সুখের স্মরণ করেই ব্যাকুল হচ্ছিলেন। কুলধর্ম, কুলগুরুর পূজ্যতা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও এর অন্তর্গত। এসমস্তই ক্ষণিক, মিথ্যা ও নাশবান্। বিষয়ের সংযোগ সর্বদা পাওয়া যায় না ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও সর্বদা একরকম থাকে না। অতএব অর্জুন! তুমি এদের পরিত্যাগ কর ও অপ্রতিকারপূর্বক সহ্য কর। কেন? সেই যুদ্ধ স্থল কি হিমালয়ের ঠাণ্ডা প্রদেশে ছিল, যার জন্য অর্জুনকে ঠাণ্ডা সহ্য করতে হবে? অথবা মরুভূমির গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ছিল, যার জন্য গরম সহ্য করতে হবে? কুরুক্ষেত্রকে লোকে

সমশীতোষ্ণ অঞ্চল বলে। মাত্র আঠারো দিন যুদ্ধ হয়েছিল, এরই মধ্যে শীত-গ্রীষ্ম পার হয়ে গিয়েছিল? বস্তুতঃ শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমান সহ্য করা একজন যোগীর উপর নির্ভর করে। এটা হৃদয়-ক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা, বহির্জগতের যুদ্ধের সম্বন্ধে গীতা বলেনি। গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আসুরী প্রবৃত্তিগুলিকে শান্ত করে পরমাত্মায় স্থিতি প্রদান করে দৈবী সম্পদও শান্ত হয়ে যায়। যখন কোন বিকার থাকে না, তখন সজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহ কার উপর আক্রমণ করবে? অতএব স্থিতি লাভের সঙ্গে তারাও শান্ত হয়ে যায়, এর পূর্বে নয়। গীতাতে অন্তর্দেশের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। এই ত্যাগে কি লাভ? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে।। ১৫।।

কারণ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখ-দুঃখে অবিচলিত সেই ধীর পুরুষকে ইন্দ্রিয়সমূহ ও বিষয়গুলির সংযোগ ব্যথিত করতে পারে না, তিনিই মৃত্যুর অতীত অমৃত-তত্ত্বলাভের প্রকৃত অধিকারী। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটি উপলব্ধি 'অমৃত'-এর নাম উল্লেখ করলেন। অর্জুন ভেবেছিলেন যুদ্ধের পরিণামে স্বর্গ অথবা পৃথিবী লাভ হবে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন—না স্বর্গলাভ হবে না পৃথিবী, বরং অমৃতলাভ হবে। অমৃত কি?—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। ১৬।।

হে অর্জুন! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই, সেইজন্য ধরে রাখা যেতে পারে না এবং সত্যের তিনকালে অভাব নেই, তা নষ্ট করা যেতে পারে না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি ভগবান তাই কি একথা বলছেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি তো বলছিই, উভয়ের পার্থক্য আমার সাথে সাথে অন্যান্য তত্ত্বদর্শীগণও জানেন। যে সত্য তত্ত্বদর্শীগণ জেনেছেন, সেই সত্যই শ্রীকৃষ্ণও পুনরাবৃত্তি করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন যিনি করেন এবং তাঁতে স্থিতিলাভ করেন, তাঁকেই তত্ত্বদর্শী বলে। সৎ ও অসৎ কাকে বলে? এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎকর্তুমর্হতি ।। ১৭।।

যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তিনিই অবিনাশী। এই **'অব্যয়স্য'**- অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউই সমর্থ হয় না; কিন্তু এই অবিনাশী অমৃতের নাম কি? তিনি কে?–

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ।।১৮।।

অবিনাশী, অপ্রমেয় ও নিত্যস্বরূপ আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলে উক্ত হয়েছে। অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। আত্মাই অমৃত। আত্মাই অবিনাশী, যার তিনকালে বিনাশ নেই। আত্মাই সৎ। দেহ নাশবান্, তাই তা অসৎ; ত্রিকালে যার অস্তিত্ব নেই।

'দেহ নশ্বর তাই তুমি যুদ্ধ কর'—এই আদেশে একথা স্পষ্ট হয় না যে, অর্জুন কেবল কৌরবদেরই নিহত করবেন। পাণ্ডব পক্ষেও তো দেহের উপস্থিতিই ছিল, পাণ্ডবগণের দেহ কি অবিনাশী ছিল? যদি দেহ নাশবান্, তবে শ্রীকৃষ্ণ কার রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন? তবে কি অর্জুন কোন দেহধারী ছিলেন? দেহ যা অসৎ, যার কোন অস্তিত্ব নাই, যাকে ধরে রাখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণ কি সেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রক্ষাকর্ত্তা হয়েছিলেন? যদি এমনই হয়েছিল, তাহলে তিনিও অবিবেকী ও মূঢ়, কারণ এরপর তিনি নিজেই বলেছেন যে, যারা কেবল আহারের জন্যই জীবন ধারণ, পরিশ্রম করে (৩/১৩) তারা অবিবেকী ও মূঢ়। এইরূপ পাপী পুরুষের বেঁচে থাকাটাই ব্যর্থ। তাহলে অর্জুন কে ছিলেন?

বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। অনুরাগীর জন্য ইষ্ট সবর্দা সারথী হয়ে সঙ্গে থাকেন। বন্ধুর মত পথ দেখান। আপনি দেহ নন। দেহটা আবরণ মাত্র, বাসস্থান। অনুরাগপূর্ণ আত্মাই এতে বাস করেন। ভৌতিক যুদ্ধে, হত্যাকাণ্ডে শরীরান্ত হয় না। এই দেহ ত্যাগ করলে আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে নেবে। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে, যেভাবে বাল্যকাল থেকে যুবা বা বৃদ্ধাবস্থা আসে, ঠিক সেইভাবেই দেহান্তর ঘটে। শরীর বধ করলে জীবাত্মা নতুন বস্ত্র পরিবর্তন করে নেবে।

দেহ সংস্কারের উপর আশ্রিত ও সংস্কার মনের উপর আধারিত। **'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।' (পঞ্চদশী, ৫/৬০)** এই মনকে শান্ত রাখা, অচল স্থির অবস্থান করা এবং অন্তিম সংস্কারের বিলয় হওয়া একই ক্রিয়া। সংস্কারের স্তর নিঃশেষ হওয়াই শরীরের অন্ত বা শেষ। এর বিলয়ের জন্য আপনাকে আরাধনা করতে হবে, যাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম অথবা নিষ্কাম কর্মযোগের নাম দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন; কিন্তু এর একটা শ্লোকও জাগতিক যুদ্ধ অথবা হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করে না। এই যুদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলির যুদ্ধ, যা অন্তর্দেশে ঘটে থাকে।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।। ১৯।।

যিনি এই আত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন এবং যিনি এই আত্মাকে মৃত বলে মনে করেন, তাঁরা উভয়েই আত্মাকে জানেন না; কারণ এই আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না। পুনরায় এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। ২০।।

এই আত্মা কোন কালে জাত বা মৃত হন না; কারণ বস্ত্র পরিবর্তন করে নেন। আত্মা হয়ে অন্য কিছুতে পরিবর্তনও হয় না; কারণ এই আত্মা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন। দেহনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মাই সত্য ও আত্মাই পুরাতন। আত্মাই শাশ্বত ও আত্মাই সনাতন। আপনি কে? সনাতন ধর্মের উপাসক। সনাতন কে? আত্মা। আপনি আত্মার উপাসক। আত্মা, পরআত্মা, ব্রহ্ম একে অন্যের পর্যায়। আপনি কে? শাশ্বত ধর্মের উপাসক। শাশ্বত কে? আত্মা। অর্থাৎ আমি ও আপনি আত্মার উপাসক। যদি আপনি আত্মিক পথটি না ধরেছেন, তাহলে আপনার কাছে শাশ্বত সনাতন নামের কোন বস্তু নেই। যদি আপনি সেই পথে চলবার জন্য

ব্যাকুল, তবে আপনি প্রত্যাশী অবশ্যই; কিন্তু সনাতনধর্মী নন। আপনি সনাতন ধর্মের নামে কোন কুরীতির শিকার হয়েছেন।

দেশ-বিদেশে মানুষ মাত্রেরই আত্মা এক সমান। সেই জন্য বিশ্বে কোথাও কোন ব্যক্তি যদি আত্মাতে স্থিত হওয়ার ক্রিয়া জানেন ও সেই পথে চলবার জন্য প্রযত্নশীল, তাহলে তিনি সনাতনধর্মী; তাতে তিনি নিজেকে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী যা কিছুই বলুন না কেন।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ।। ২১।।

পার্থিব দেহকে রথ করে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী পৃথাপুত্র অর্জুন! যে পুরুষ এই আত্মাকে নাশরহিত, নিত্য, অজন্মা ও অব্যক্ত বলে জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কার হত্যা করেন এবং কারও হত্যা করান? অবিনাশীর বিনাশ অসম্ভব। অজন্মা জন্ম গ্রহণ করেন না। অতএব দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়। একথা উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন–

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২২।।

মানুষ যেমন **'জীর্ণানি বাসাংসি'**-জীর্ণ-শীর্ণ পুরোনো বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা পুরোনো শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে। জীর্ণ হওয়ার পরই যদি নতুন শরীর ধারণ করা হয়ে থাকে, তাহলে শিশু কেন মরে? এই শরীরের আরও বিকাশ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ শরীর সংস্কারের উপর আধারিত। যখন সংস্কার জীর্ণ হয়, তখনই আমরা দেহত্যাগ করি, যদি সংস্কার দুদিনের, তাহলে দ্বিতীয় দিনই শরীর জীর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মানুষ একটা শ্বাসও বেশী নিতে পারে না। সংস্কারই শরীর। আত্মা সংস্কার অনুযায়ী নতুন শরীর ধারণ করে থাকে– **'অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথা ইহৈব তথৈব প্রেত্য ভবতি। কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩/১৪)** অর্থাৎ এই পুরুষ অবশ্যই সংকল্পময়। এই লোকে পুরুষ যেমন নিশ্চয়যুক্ত হয়, মৃত্যুর পর তেমনিই তার অবস্থা

হয়ে থাকে। নিজের সংকল্পের দ্বারা তৈরী শরীরে পুরুষের সৃষ্টি হয়। এইরূপ মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র, আত্মা মরে না। পুনরায় এর অজরতা-অমরতার উপর জোর দিলেন–

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২৩।।

অর্জুন! এই আত্মাকে কোন শস্ত্র ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল একে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।। ২৪।।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য–একে ছেদন করা যেতে পারে না। এই আত্মা অদাহ্য–একে দহন করা যেতে পারে না। অক্লেদ্য–একে আর্দ্র করা যেতে পারে না। আকাশ একে নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে এই আত্মা অশোষ্য, সর্বব্যাপক, অচল, স্থির এবং সনাতন।

অর্জুন বলেছিলেন যে, কুলধর্ম সনাতন, এই যুদ্ধে সনাতন ধর্মলোপ পাবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একে অজ্ঞান বললেন এবং আত্মাকে সনাতন বললেন। আপনি কে? সনাতন ধর্মের অনুযায়ী। সনাতন কে? আত্মা। যদি আপনি আত্মাকে উপলব্ধি করবার বিধি-বিশেষ সম্বন্ধে অবগত নন, তাহলে সনাতন ধর্ম কি তা আপনি জানেন না। এর কুপরিণাম সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিতে বদ্ধ ধর্মভীরু লোকেদের ভোগ করতে হয়। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে মুসলমানেরা এসেছিল মাত্র বারো হাজার, বর্তমানে তাদের সংখ্যা আঠাশ কোটি। বারো হাজার থেকে লক্ষাধিক হত, তার বেশী হলে কোটির কাছাকাছি হত আর কত হত? এরা আজ আঠাশ কোটির থেকেও বেশী হতে চলেছে। সকলেই হিন্দু, আপনার নিজের ভাই সবাই, যারা ছুতমার্গ অবলম্বন করার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নষ্ট হয়নি, তাদের সনাতন, অপরিবর্তনশীল ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে।

যখন ম্যাটার (Matter) ক্ষেত্রের কোন বস্তু এই সনাতনকে স্পর্শ করতে পারে না, তখন ছোঁয়া-খাওয়ায় এই সনাতন ধর্ম কিভাবে নষ্ট হবে? এটা ধর্ম নয়,

কুরীতির পরিস্থিতি ছিল। যার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের বৃদ্ধি হয়েছে, দেশ বিভাজন হয়েছে ও রাষ্ট্রীয় একতা আজও একটি সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সকল কুরীতির কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। হামীরপুর জেলাতে ৫০-৬০টি পরিবার কুলীন ক্ষত্রিয় ছিল। আজ তারা সকলেই মুসলমান। না তাদের উপর গোলা-বারুদের হামলা হয়েছিল, না তরবারির। তাহলে কি হয়েছিল? একরাতে ১-২ জন মৌলবী সেই গ্রামের একমাত্র কুয়োর কাছেই লুকিয়ে ছিল, কারণ, কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম এখানেই স্নান করতে আসবেন। যেই তিনি এসেছিলেন, অমনি তাঁকে সেই মৌলবীরা ধরে তাঁর মুখবন্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর সামনেই তারা কুয়ো থেকে জল তুলে কিছুটা জল পানকরে বাকী উচ্ছিষ্ট জলটুকুর সঙ্গে এক টুকরো রুটিও তাতে ফেলে দিয়েছিল। পণ্ডিতমশাই নিরুপায় হয়ে তাদের দেখতেই থেকে গিয়েছিলেন, তারপরে তারা পণ্ডিতমশাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তাঁকে নিজেদের ঘরে বন্ধ করে দিয়েছিল।

পরের দিন তারা হাতজোড় করে পণ্ডিত মশাইকে ভোজনের জন্য নিবেদন করাতে তিনি রেগে বলেছিলেন- "তোমরা যবন আর আমি ব্রাহ্মণ, আমি কি করে এই ভোজন গ্রহণ করব?" মৌলবীরা তখন বলেছিল যে- "মহারাজ! আপনার মত বিচারবান্ লোকদের আমাদের বড়ই দরকার, ক্ষমা করবেন।" এর পর পণ্ডিতমশাইকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

পণ্ডিতমশাই নিজের গ্রামে ফিরে দেখেছিলেন যে লোকে কুয়োর জল আগেকার মতই ব্যবহার করে চলেছে, তিনি তা দেখে অনশন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। কিছু লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন—যবনরা এই কুয়োর পাড়ে চড়েছিল, আমার সামনেই তারা এর জল উচ্ছিষ্ট করেছে এর মধ্যে রুটিও ফেলেছে, একথা শুনে গ্রামের লোকেরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখন কি হবে?" পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন—"কি আর হবে? ধর্ম তো নষ্টই হয়ে গেছে।"

সেই সময় সেই গ্রামের লোকেরা অশিক্ষিত ছিল। স্ত্রী ও শূদ্রের কাছ থেকে পড়ার অধিকার বহু আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বৈশ্য ধন উপার্জনকেই নিজেদের ধর্ম বলে মনে করত। ক্ষত্রিয় চারণগণের প্রশস্তি গানেই মগ্নছিল— অন্নদাতার তরবারি

চমকালে, আকাশে বিদ্যুৎ খেলে যেত ও দিল্লীর সিংহাসন টলে উঠত। সম্মান এমনিতেই ছিল তাহলে তারা পড়বে কেন? ধর্মের তাদের কি প্রয়োজন? ধর্ম কেবল ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া বস্তু হয়ে রয়ে গিয়েছিল। তাঁরাই ধর্মসূত্রের রচয়িতা, তাঁরাই এর ব্যাখ্যাকার ও তাঁরাই এর সত্য-মিথ্যার নির্ণায়ক ছিলেন। প্রাচীনকালে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সকলেরই বেদ পড়বার অধিকার ছিল। প্রত্যেক বর্গের ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রের রচনা করেছিলেন, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন রাজাগণ ধর্মের নামে যারা আড়ম্বরের বিস্তার করত, তাদের দণ্ড দিয়েছেন, আবার ধর্মপরায়ণদের আদরও দিয়েছেন।

কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের যথার্থ জ্ঞান না থাকার জন্য উক্ত গ্রামের সমস্ত লোকেরা ভেড়ার মত কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিল, যে ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু লোক এধরণের অপ্রিয় কথা শুনে আত্মহত্যা করে নিয়েছিল কিন্তু কতদূর সকলেই প্রাণত্যাগ করত? অটুট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে অন্য সমাধান খুঁজতে হয়েছিল। আজও তারা বাঁশ পুঁতে, পেষণদণ্ড (মুগুর) রেখে হিন্দুদের মতই বিবাহ করে; পরে একজন মৌলবী এসে নিকাহ পড়িয়ে চলে যায়। তারা সকলেই শুদ্ধ হিন্দু, কিন্তু এখন সকলেই তারা মুসলমান হয়ে গেছে।

হয়েছিল কি? জল পান করেছিল, না জেনে মুসলমানদের ছোঁয়া খেয়েছিল। সেই জন্য ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল। ধর্ম না হয়ে লজ্জাবতী লতা হয়ে গেল। লজ্জাবতী লতা এক ধরণের ছোট চারা গাছকে বলে, যার পাতা স্পর্শমাত্র সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আবার হাত সরালেই বিকশিত হয়; কিন্তু ধর্ম এমন লোপ পেল যে, এর আর বিকাশ হল না। একেবারে শেষ হয়ে গেছে, তাদের কৃষ্ণ, রাম ও পরমাত্মা মরে গেছে। যাঁরা শাশ্বত, তাঁরা নেই। বাস্তবে সেটি শাশ্বতের নামে কোন কুরীতি ছিল, যা লোকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল।

ধর্মের শরণে আমরা যাই কেন? কারণ আমরা মরণধর্মা ও ধর্ম কোন প্রামান্য বস্তু, যার শরণাগত হলে অমরতা লাভ করা যায়। আমরা তো হত্যা করলে মারা যায় আর ধর্ম কি শুধু স্পর্শে এবং আহার গ্রহণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধর্ম আমাদের রক্ষা কি করে করবে? ধর্ম তো আপনার রক্ষা করে, আপনার চেয়ে শক্তিশালী। আপনি তরবারির আঘাতে মরবেন আর ধর্ম? তা ছোঁয়াতেই নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার ধর্ম কেমন? কুরীতি সকল নষ্ট হয়, সনাতন নয়।

সনাতন যথার্থ হয়, যাকে শস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যেতে পারে না। অগ্নি দাহ করতে পারে না জল আর্দ্র করতে পারে না। খাদ্য-পানীয় দূরে থাক প্রকৃতিজাত কোন বস্তু একে স্পর্শ করতে পারে না, তাহলে সেই সনাতন কি করে নষ্ট হতে পারে?

এই ধরণের কিছু কুরীতি অর্জুনের কালেও ছিল। অর্জুনও তার শিকার হয়েছিলেন। তিনি বিলাপ করে কাতরতার সঙ্গে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন যে, কুলধর্মই সনাতন। যুদ্ধ হলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হবে। কুলধর্ম নষ্ট হবে এবং কুলধর্ম নষ্ট হলে আমরা অনন্তকাল ধরে নরকে বাস করব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"এই অজ্ঞানতা তোমার মধ্যে কোত্থেকে উৎপন্ন হল?" তাহলে প্রমাণিত হল যে, সেসব কুরীতি ছিল, তবেই তো শ্রীকৃষ্ণ তার নিরাকরণ করলেন এবং বললেন আত্মাই সনাতন। যদি আপনি আত্মিক পথ সম্বন্ধে অবগত নন, তবে আপনি এখনও সনাতন ধর্মে প্রবেশ করতে পারেননি।

যখন এই সনাতন-শাশ্বত আত্মা সকলের অন্তরে পরিব্যাপ্ত, তখন কেমন করে খোঁজ করা হবে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।। ২৫।।

এই আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে একে উপলব্ধি করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আত্মা আছে ঠিকই কিন্তু তাকে জানা যায় না। আত্মা অচিন্ত্য। যতক্ষণ চিত্ত ও চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ সেই শাশ্বত আছে অবশ্যই; কিন্তু আমাদের দর্শন, উপভোগ এবং প্রবেশের জন্য নয়। অতএব চিত্তের নিরোধ আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সতের তিনকালে অভাব নেই। সৎ আত্মা। আত্মাই অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত, সনাতন ও অব্যক্ত। তত্ত্বদর্শীগণ আত্মাকে এই সকল বিশেষ গুণধর্মেযুক্ত দেখেছেন। দশটি ভাষার বিশারদও দেখেননি ও কোন সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিও দেখেননি; বরং তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—তত্ত্ব হচ্ছেন পরমাত্মা। মনের নিরোধকালে সাধক তাঁর দর্শন করেন এবং তাঁতে স্থিতি লাভ করার অধিকারী হন। প্রাপ্তিকালে

ভগবানকে পাওয়া যায় এবং সাধক পরক্ষণেই নিজের আত্মাকে ঈশ্বরীয় গুণধর্মে বিভূষিত দেখেন। তিনি দেখেন আত্মাই সত্য, সনাতন ও পরিপূর্ণ। এই আত্মা অচিন্ত্য। এই বিকাররহিত অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল। সেইজন্য অর্জুন! আত্মার এই সনাতন স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর। এবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিচারগুলির মধ্যে যে বিরোধাভাস তা দেখালেন—যেটা খুব সামান্য তর্ক।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি।। ২৬।।

যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্যজাত এবং সদা নশ্বর বলে মনে কর, তবুও তোমার শোক করা উচিত নয়; কারণ–

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ২৭।।

এরূপ হলেও জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী একথা প্রমাণিত। সেই জন্য এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। যার কোন চিকিৎসা নেই, তার জন্য শোক করা এক অন্য দুঃখকে আমন্ত্রণ করা মাত্র।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।। ২৮।।

অর্জুন! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে দেহহীন এবং মৃত্যুর পরেও দেহহীন অবস্থাতে থাকে, কেবল জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেকার সময়ে এই দেহধারণটা আমরা দেখে থাকি, জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পশ্চাতে কিছুই দেখা যায় না। অতএব এই পরিবর্তনের জন্য চিন্তা করা ব্যর্থ। এই আত্মাকে কে দেখতে সক্ষম? এই প্রসঙ্গে বললেন–

আশ্চর্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।। ২৯।।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, এই আত্মাকে তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন; এখন তত্ত্বদর্শনের দুর্লভতার উপর আলোকপাত করলেন যে, কোন বিরল মহাপুরুষই এই আত্মাকে আশ্চর্যের মত দেখেন। শোনেন না, প্রত্যক্ষ দেখেন এবং সেইরূপ অন্য কোন মহাপুরুষ সবিস্ময়ে এই তত্ত্ব বর্ণনা করেন। যিনি দেখেছেন তিনিই যথার্থ বলতে পারেন। অন্য কোন বিরল সাধক এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, সকলে শোনেনও না, কারণ অধিকারী বিশেষে এইভাব বোধগম্য হয়। হে অর্জুন! কেউ কেউ শুনেও এই আত্মাকে জানতে পারে না; কারণ সাধন সম্পূর্ণ হয় না। আপনি হাজার জ্ঞানের কথা শুনুন, সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে বুঝে নিন, আগ্রহী হয়েও থাকুন; কিন্তু মোহ বড়ই প্রবল, অল্পসময়ের মধ্যেই আপনি সাংসারিক ব্যবস্থাতে লিপ্ত হয়ে যাবেন।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ নির্ণয় করলেন—

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎসর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ৩০।।

অর্জুন! প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবধ্য, অকাট্য। সেইজন্য কোন প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়।

‘আত্মাই সনাতন’–এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করে, এর প্রভুতার সঙ্গে বর্ণনা করে এই প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ করলেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, এর প্রাপ্তির উপায় কি? সম্পূর্ণ গীতাতে এর জন্য দুটি পথ বলা হয়েছে প্রথম– ‘নিষ্কাম কর্মযোগ’, দ্বিতীয়– ‘জ্ঞানযোগ’ এই দুই মার্গকে অবলম্বন করে যে কর্ম করা হয় তা একই। সেই কর্মের অনিবার্যতার উপর জোর দিয়ে যোগেশ্বর এবার জ্ঞানযোগের বিষয়ে বললেন–

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।। ৩১।।

হে অর্জুন! স্বধর্ম লক্ষ্য করেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা কল্যাণকর ক্ষত্রিয়ের জন্য আর কিছুই নেই। এই যাবৎ ‘আত্মা শাশ্বত’, ‘আত্মা সনাতন’, ‘এটাই একমাত্র ধর্ম’ বলা হয়েছে। এখন এই স্বধর্ম কি? ধর্ম একমাত্র আত্মা, তাহলে ধর্মাচরণ কি? কারণ আত্মা অচল স্থির। বস্তুতঃ এই আত্মপথে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্। স্বভাবজাত এই ক্ষমতাকেই স্বধর্ম বলা হয়েছে।

এই একমাত্র সনাতন আত্মিক পথের পথিক সাধকদের মহাপুরুষগণ তাদের স্বভাবজাত ক্ষমতানুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ। সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থাতে প্রত্যেক সাধক শূদ্র অর্থাৎ অল্পজ্ঞ হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা ভজনে বসেও সাধক ১০ মিনিটের জন্য একাগ্রচিত্ত হতে পারে না, প্রকৃতির মায়াজাল কেটে উঠতে পারে না। এই অবস্থায় কেবল মহাপুরুষের সেবাদ্বারা স্বভাবে সদ্‌গুণের সঞ্চার হয়, অতএব তখন সাধকের স্থিতি বৈশ্য শ্রেণীর হয়। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। সাধক ধীরে ধীরে-এর সংগ্রহ ও গোপালন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের সুরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে ইন্দ্রিয়ের হিংসা হয় এবং বিবেক-বৈরাগ্যের মাধ্যমে এদের সুরক্ষা হয়; কিন্তু প্রকৃতিকে নির্বীজ করবার ক্ষমতা তার মধ্যে এখনও আসে না। ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে সাধকের অন্তরে ত্রিগুণকে খণ্ডন করবার ক্ষমতা এসে যায়। এই স্তর থেকেই সাধক প্রকৃতি ও তার বিকার সমূহকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা লাভ করেন। এইজন্য যুদ্ধ এখান থেকেই শুরু হয়। ক্রমশঃ সাধক সাধনা সম্পূর্ণ করে ব্রাহ্মণত্বে পরিবর্তিত হন। তখন মনকে শান্ত রাখা, ইন্দ্রিয় দমন, চিন্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা, সরলতা, অনুভব, জ্ঞান ইত্যাদি লক্ষণ সাধকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়। এদের অনুষ্ঠান করে পথ অতিক্রমণ করে ক্রমশঃ তিনি ব্রাহ্মত্ব লাভ করেন। যেখানে পৌঁছে তিনি ব্রাহ্মণও থাকেন না।

বিদেহ রাজা জনকের সভায় চাক্রায়ণ, উষস্তি, কহোল, আরুণি, উদ্দালক এবং গার্গীর প্রশ্নের সমাধনা করে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—"যিনি আত্মদর্শী এবং নিজের পূর্ণতা দেখেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। এই আত্মাই লোক-পরলোক ও সমস্ত প্রাণীগণকে অন্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, তারাগণ, অন্তরিক্ষ, আকাশ এবং প্রতিক্ষণ এই আত্মার দ্বারাই অনুশাসিত। এই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত। আত্মা অক্ষর, এছাড়া বাকী সবই বিনাশশীল। যে ব্যক্তি এই জগতে এই 'অক্ষর'কে না জেনে হোম করে, তপস্যা করে, হাজার হাজার বছরপর্যন্ত যজ্ঞ করে, তার এই সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি এই অক্ষরকে না জেনে প্রাণত্যাগ করে, তবে সে দয়ার পাত্র ও যিনি এই অক্ষরকে জেনে মৃত্যু বরণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩/৪-৫-৭-৮)।

অর্জুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধকের জন্য যুদ্ধ অপেক্ষা কল্যাণকর আর কোন পথই নেই। প্রশ্ন ওঠে যে, ক্ষত্রিয়

কে? প্রায়ই লোকে এর অর্থ সমাজে জন্ম থেকে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি থেকে বোঝে। এদেরই চারটি বর্ণ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু না, শাস্ত্রকার স্বয়ং বলেছেন ক্ষত্রিয় কে? বর্ণ কি? এখানে তিনি কেবল ক্ষত্রিয়ের নাম নিয়েছেন ও এরপরে ১৮ অধ্যায়পর্যন্ত এই প্রশ্নের সমাধান প্রস্তুত করেছেন যে, বস্তুতঃ এই বর্ণ কি? ও কি ভাবে বর্ণের পরিবর্তন হয়?

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–'**চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টম্**' **(গীতা, ৪/১৩)**– চার বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। তবে কি মানুষকে আর একজন মানুষ থেকে পৃথক্ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**।'-গুণের মাধ্যমে কর্মকে চারভাগে বিভক্ত করেছি। এখন দেখতে হবে যে, সেই কর্ম কি, যাকে ভাগ করা হয়েছে? গুণ পরিবর্তনশীল। সাধনার উচিত আচরণদ্বারাই তামসিক থেকে রাজসিক এবং রাজসিক থেকে সাত্ত্বিক গুণে উত্তরণ হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্বভাব হয়ে যায়। সেই সময় সাধকের মধ্যে ব্রহ্মত্ব লাভের সমস্ত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। বর্ণসম্বন্ধী প্রশ্ন এখান থেকে আরম্ভ করে আঠারো অধ্যায়ে গিয়ে পূর্ণ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে– '**শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ**।' **(গীতা, ১৮/৪৭)** স্বভাবজাত এই ধর্মে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা যে স্তরেরই হোক না কেন তা গুণহীন শূদ্র শ্রেণীরও যদি হয়, তাহলেও পরমকল্যাণ করে; কারণ আপনি ক্রমশঃ সেখান থেকেই উত্থান করবেন। সাধক নিজের থেকে উচ্চস্তরের ব্যক্তির নকল করে নষ্ট হয়ে যায়। অর্জুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিলেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন! স্বভাব থেকে উৎপন্ন এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার নিজের ক্ষমতা লক্ষ্য করেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন কল্যাণকর কার্য ক্ষত্রিয়ের জন্য নেই। এরই উপর আলোকপাত করে পুনরায় যোগেশ্বর বললেন–

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।। ৩২।।

পার্থিব দেহকে রথ বানিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী অর্জুন! অনায়াসপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এই প্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধকের মধ্যে ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকে। তাঁরজন্য স্বর্গদ্বার খোলা থাকে; কেননা দৈবী সম্পদ্ সম্পূর্ণভাবে অর্জিত সেই সাধকের মধ্যে স্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা চলে আসে। একেই বলে উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের

এই যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই লাভ করে থাকেন; কারণ তাদের মধ্যেই এই সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকে।

সংসারে যুদ্ধ হয়েই থাকে। কখনও কখনও বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করে, প্রত্যেক জাতি যুদ্ধ করে; কিন্তু শাশ্বত বিজয় বিজিত ব্যক্তিও লাভ করতে পারে না। এসব পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সংঘর্ষ মাত্র। যে যাকে যতটা দমন করে, কালান্তরে তাকেও ততটাই দমিত হতে হয়। এই বিজয় কি ধরণের, যাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিস্তেজ করবার শোক থাকছেই, শেষে এই দেহও নষ্ট হয়ে যায়? ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষই বাস্তবিক সংঘর্ষ, এতে একবার জয়লাভ করলে সর্বদার জন্য প্রকৃতির নিরোধ ও পরমপুরুষ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। এই বিজয় এমন, যারপর পরাজয় নেই।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মংকীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৩।।

আর যদি তুমি এই 'ধর্মযুক্ত সংগ্রাম' অর্থাৎ শাশ্বত সনাতন পরমধর্ম পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করবার জন্য ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে 'স্বধর্ম' অর্থাৎ স্বভাবজাত সংঘর্ষ করবার ক্ষমতা, ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে পাপ অর্থাৎ গমনাগমন ও অপকীর্তি প্রাপ্ত হবে। অপকীর্তির উপর আলোকপাত করলেন—

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।। ৩৪।।

সকলেই বহুকাল ধরে তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করবে। যে মহাত্মাগণ পদচ্যুত হয়েছেন আজও তাদের নাম যেমন–বিশ্বামিত্র, পরাশর, নিমি, শৃঙ্গী ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়। বহু সাধক নিজধর্মের বিচার করেন, চিন্তা করেন যে লোকে আমাকে কি বলবে? এই ধরণের ভাবও সাধনায় সহায়ক হয়। এইরূপ চিন্তা সাধনাতে প্রবৃত্ত থাকার প্রেরণা দেয়। কিছু দূরপর্যন্ত এইরূপ ভাব সঙ্গ দেয়। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অপকীর্তি মৃত্যু থেকেও বেশী দুঃখদায়ক।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।

যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।। ৩৫।।

তুমি যাঁদের দৃষ্টিতে সম্মানিত ছিলে সেই মহারথীগণ মনে করবেন যে, তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছ। মহারথী কে? যিনি এই পথে কঠোর পরিশ্রম করে অগ্রসর হন, তিনিই মহারথী। এই প্রকার ততটাই পরিশ্রম করে অবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট করে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগুলিও মহারথী। যাঁরা তোমাকে সম্মান করতেন যে, এই সাধক প্রশংসনীয়, তুমি তাঁদের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাবে। এতটাই নয়, বরং—

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।। ৩৬।।

শত্রুগণ তোমার পরাক্রমের নিন্দা করে বহু অকথ্য বচন বলবে। একটা কোন দোষ দেখতে পেলেই তো চারিদিক্ থেকে অজস্র নিন্দা ও নানান দোষারোপ হতে থাকে। অকথ্য কথাও বলে থাকে। এর থেকে বেশী দুঃখ আর কি হতে পারে? অতএব—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩৭।।

এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গলাভ করবে; অর্থাৎ শ্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে। স্বাসের বাইরে প্রকৃতিতে বিচরণ করবার ধারা নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। যে দৈবীসম্পদগুলি, পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করতে সাহায্য করে, সেগুলি হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রবাহিত থাকবে অথবা এই সংঘর্ষে জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি লাভ করবে। অতএব অর্জুন! যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করে উত্থিত হও।

প্রায়ই লোকে এই শ্লোকের অর্থ এই মনে করে যে, এই যুদ্ধে মৃত্যু হলে স্বর্গে যাবে ও জয়লাভ করলে পৃথিবীর ভোগ উপভোগ করবে; কিন্তু আপনার স্মরণ হবে যে, অর্জুন বলেছিলেন—"ভগবন্! শুধু পৃথিবীর নয়, বরং ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য এবং দেবতাদের অধিপতির পদ অর্থাৎ ইন্দ্রপদ লাভ হলেও আমি সেই উপায় দেখছি না, যা আমার ইন্দ্রিয়সমূহের বিষাদ দূর করতে পারে। যদি এই সবই লাভ হবে, তবে হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না।" যদি এর পরেও শ্রীকৃষ্ণ বলতেন যে, অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। জয়লাভ করলে পৃথিবীর ভোগ উপভোগ করবে, পরাজয় হলে স্বর্গে বাস করবে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ দিচ্ছেনই বা কি? অর্জুন এর থেকে শ্রেষ্ঠ যে সত্য, শ্রেয়-র (পরম কল্যাণের) কামনাবিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন, যা সদ্‌গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ

বলেছিলেন যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই সংঘর্ষে শরীরের সময় যদি পূর্ণ হয়ে যায় ও লক্ষ্যে পৌঁছান বাকী থাকে, তাহলে স্বর্গলাভ করবে অর্থাৎ স্বরে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে। দৈবী সম্পদ্ হৃদয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেহের অস্তিত্ব থাকতে থাকতে সংঘর্ষে সফলতা লাভ হলে 'মহীম্'- সব থেকে মহান্ ব্রহ্মের মহিমা উপভোগ করবে, অর্থাৎ মহামহীম স্থিতি লাভ করবে। জয়লাভ করলে সর্বস্ব, কারণ মহামহিমত্ব লাভ করবে ও পরাজয় হলে দেবত্ব- দুইদিক্ থেকেই লাভবান্ হবে। লাভেও লাভ ও লোকসানেও লাভ। পুনরায় এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৮।।

এই প্রকার সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যুদ্ধ করলে প্রত্যবায় তোমার হবে না। অর্থাৎ সুখে সর্বস্ব ও দুঃখেও দেবত্ব লাভ। লাভে মহিমময় স্থিতি অর্থাৎ সর্বস্ব লাভ ও লোকসানে দেবত্ব লাভ। জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি ও পরাজয় হলে দৈবী সম্পদের উপর অধিকার। এই প্রকার নিজের লাভ-লোকসানের বিচার করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যুদ্ধ করলেই এই দুই অবস্থা লাভ হয়। যুদ্ধ করলে পাপ অর্থাৎ আসা-যাওয়া করতে হবে না। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

এষা তেহভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।। ৩৯।।

হে পার্থ! এই বুদ্ধির কথা তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধির কথা? এই যে, যুদ্ধ কর। জ্ঞানযোগে এই আছে যে, নিজের সামর্থ্য অনুসারে লাভ-লোকসানের ভালভাবে বিচার ক'রে যুদ্ধ কর। জয়লাভ ক'রলে মহামহিম স্থিতি ও পরাজয় হ'লে দেবত্ব লাভ হবে। জয়লাভে সর্বস্ব ও পরাজয়ে দেবত্ব লাভ। দুদিকেই লাভ। যুদ্ধ না করলে সকলেই ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি বলে মনে করবে, অপকীর্তি হবে। এইরূপ নিজের ক্ষমতা বুঝে, স্বয়ং বিচার করে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া জ্ঞানযোগ।

অধিকাংশ লোকেদের মধ্যে এই ভুল ধারণা দেখা যায় যে, জ্ঞানমার্গে কর্ম (যুদ্ধ) করতে হয় না। তারা বলে যে, জ্ঞানমার্গে কর্ম করবার প্রয়োজন নেই। 'আমি

শুদ্ধ', 'বুদ্ধ', 'চৈতন্য', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', গুণের দ্বারাই গুণ প্রভাবিত, এরূপ মনে করে হাত গুটিয়ে বসে যায়। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এটা জ্ঞানযোগ নয়। জ্ঞানযোগেও সেই কর্ম করতে হয়, যে কর্ম নিষ্কাম কর্মযোগে করা হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল বুদ্ধির অর্থাৎ দৃষ্টিকোণর। জ্ঞানমার্গী নিজের স্থিতি বুঝে, নিজের উপর নির্ভর ক'রে কর্ম করেন। ইষ্টের আশ্রিত হ'য়ে নিষ্কাম কর্মযোগীও সেই কর্মই করেন। উভয় মার্গেই কর্ম করতে হয়, কর্মেও কোনরূপ ভেদ নেই, কেবল কর্ম করবার দৃষ্টিকোণ দুটি।

অর্জুন! এই বুদ্ধিকেই এখন তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি কর্ম-বন্ধনের উত্তমরুপে নাশ ক'রবে। এখানে প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণ কর্মের নাম নিয়েছেন; কিন্তু কর্ম কি তা বললেন না। এখন কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করছেন–

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।। ৪০।।

এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের অর্থাৎ বীজের নাশ হয় না। সীমিত ফলরূপ দোষও হয় না, সেই জন্য এই নিষ্কাম কর্মের, এই কর্মদ্বারা সম্পাদিত ধর্মের অতি অল্পও সাধন জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। আপনি এই কর্ম বুঝে এই পথে দুপা কেবল চলুন (যা সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে থেকেই চলা যেতে পারে, সাধক তো চলেনই) শুধু বীজ বপন করে দিন, তাহলেও সেই বীজের কখনও নাশ হবে না। প্রকৃতির সে ক্ষমতা নেই, এমন কোন অস্ত্র নেই, যা এই সত্যকে মুছে ফেলতে পারে। প্রকৃতি কেবল আবরণ চড়াতে পারে, কিছু বেশী সময় লাগতে পারে; কিন্তু সাধনের আরম্ভ নষ্ট ক'রতে সক্ষম নয়।

আগামী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, সকল পাপীর থেকেও বেশী পাপী হোক না কেন, জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা নিঃসন্দেহে পার হয়ে যাবে। সেই কথাই এখানে বলছেন– অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের শুধু বীজারোপণ করে দিলেও তার নাশ হয় না। বিপরীত ফলরূপ দোষও এতে হয় না যে, আপনাকে স্বর্গ, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিপর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি এই সাধন ছেড়ে দিলেও, এই সাধন আপনাকে উদ্ধার করেই ছাড়বে। এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পও সাধন জন্ম-মৃত্যুর মহাভয়

থেকে উদ্ধার করে। **'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।'** (৬/৪৫) অর্থাৎ কর্মের এই বীজারোপণ বহু জন্মের পর সেখানেই পৌঁছিয়ে দেবে, যেখানে পরমধাম, পরমগতি হবে। এই প্রসঙ্গে আরও বললেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।। ৪১।।

হে অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি একটাই। ক্রিয়া ও পরিণামও একটাই। আত্মিক সম্পত্তিই স্থায়ী সম্পত্তি। প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে এই সম্পত্তি ধীরে ধীরে অর্জন করাই ব্যবসা। এই ব্যবসা ও নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়াও একটাই অথবা তাহলে যাঁরা বহু ক্রিয়ার বিস্তার করেছেন, তাঁরা কি ভজন করেন না? শ্রীকৃষ্ণ বললেন-না তারা ভজন করে না। সেই সকল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয় এবং সেইজন্যই অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।। ৪২।।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।। ৪৩।।

পার্থ! সেই পুরুষগণ **'কামাত্মানঃ'**- কামনাযুক্ত, **'বেদবাদরতাঃ'**- বেদবাক্যে অনুরক্ত, **'স্বর্গপরাঃ'**- স্বর্গকেই চরমলক্ষ্য বলে মনে করেন যে, এর থেকে উত্তম আর কিছু নেই— তাঁরা এইরূপ বিশ্বাস করেন– এই সকল অবিবেকীগণ জন্ম-মৃত্যুরূপ ফলপ্রদানকারী, ভোগ এবং ঐশ্বর্য লাভের জন্য বহু ক্রিয়ার বিস্তার করে থাকেন। আপাতমধুর বাণীদ্বারা ব্যক্তও করেন। অর্থাৎ অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্ত ভেদযুক্ত হয়। তাঁরা ফলপ্রদানকারী বাক্যেই অনুরক্ত থাকেন, বেদ বাক্যকেই প্রমাণ বলে মনে করেন, স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁদের বুদ্ধি অনন্ত ভেদযুক্ত হওয়ার ফলে অনন্ত ক্রিয়ার রচনা করে নেন। তাঁরা পরমতত্ত্ব পরমাত্মারই নাম করেন, কিন্তু তার অন্তরালে অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেন। তাহলে কি অনন্ত ক্রিয়াগুলি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন-না, এই অনন্ত ক্রিয়াগুলি কর্ম নয়। তাহলে সেই একটিমাত্র নিশ্চিত ক্রিয়া কি? শ্রীকৃষ্ণ এখনও পর্যন্ত তা বলছেন না। এখন এতটাই বলছেন যে, অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হওয়ার

ফলে তাঁরা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেন। তাঁরা কেবল যে বিস্তার করেন তা নয়, বরং আলঙ্কারিক শৈলীতে সেসব ব্যক্তও করেন। তার প্রভাব কি হয়?–

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। ৪৪।।

তাঁদের বাণীর প্রভাব যাদের যাদের চিত্তের উপর পড়ে, অর্জুন! তাঁদের বুদ্ধি নাশ হয়। কিছু লাভ করতে পারেন না। সেই বাণী বিমুগ্ধ চিত্ত এবং ভোগ ঐশ্বর্যে আসক্ত সেই পুরুষগণের অন্তঃকরণে ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি থাকে না। ইষ্টে সমাধিস্থ হওয়ার নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া তাঁদের মধ্যে থাকে না।

এই ধরণের অবিবেকীগণের বাণী শোনেন কারা? ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিই শোনেন, অধিকারী শোনেন না। এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে সম ও আদিতত্ত্বে প্রবেশের নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়াসংযুক্ত বুদ্ধি হয় না।

প্রশ্ন ওঠে যে, **'বেদবাদরতাঃ'**- যাঁরা বেদবাক্যে অনুরক্ত তাঁরাও কি ভুল করেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। ৪৫।।

অর্জুন! **'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা'**—বেদ ত্রিগুণপর্যন্ত প্রকাশ করে থাকে। এর বেশী কিছু জানে না। সেইজন্য **'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন**।'- অর্জুন! তুমি এই তিনগুণ অতিক্রম করে উপরে ওঠ অর্থাৎ বেদের কার্যক্ষেত্র পার কর। কিরূপে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, **'নির্দ্বন্দ্বঃ'**- সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, নিত্য সত্যবস্তুতে স্থিত হও এবং যোগক্ষেমের আকাঙ্খারহিত আত্মপরায়ণ হও। এইভাবে ঊর্ধ্বে ওঠ। প্রশ্ন ওঠে যে, কেবল আমিই উঠবো অথবা আরও কেউ বেদের ঊর্ধ্বে উঠেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যিনি বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত তিনি ব্রহ্মকে জানেন এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই বিপ্র।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে।

তাবান্সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। ৪৬।।

পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুষের ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন হয়, যে ব্রাহ্মণ উত্তম প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরও বেদের ততটুকুই প্রয়োজন হয়। তাৎপর্য এই যে, যিনি বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত তিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ তুমি বেদের ঊর্ধ্বে ওঠ, ব্রাহ্মণ হও।

অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণ স্বভাবজাত ক্ষমতাগুলির নাম। এটা কর্মপ্রধান। জন্ম থেকে নির্ধারিত কোন প্রথা নয়। যিনি গঙ্গার নিকটে অবস্থান করেন, তাঁর ক্ষুদ্র জলাশয়ের কি প্রয়োজন? কেউ তাতে শৌচক্রিয়া করে, কেউ পশুদের স্নান করায়। এর বেশী তার প্রয়োজন নেই। এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের, সেই বিপ্র মহাপুরুষের বেদের ততটাই প্রয়োজন থেকে যায়। প্রয়োজন থাকে অবশ্যই; কারন অনুগামীদের জন্য তার উপযোগিতা আছে, সেখান থেকেই চর্চা আরম্ভ হবে। অতপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করবার সময় যে যে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন, তার প্রতিপাদন করলেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।। ৪৭।।

কেবল কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নেই। এইরূপ চিন্তা কর যে ফলই নেই। ফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়, আবার কর্মে অশ্রদ্ধাও যেন না হয়।

এখন পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঊনচল্লিশতম শ্লোকে প্রথমবার কর্মের নাম নিয়েছেন। কিন্তু বললেন না কর্ম কি এবং সেই কর্মের অনুষ্ঠান কিভাবে করা হবে? সেই কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন যে—

(১) অর্জুন! এই কর্ম করে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

(২) অর্জুন! এতে আরম্ভের অর্থাৎ বীজের নাশ হয় না। একবার এই কর্ম আরম্ভ করে দিলে, প্রকৃতির সে ক্ষমতা নেই যে একে নষ্ট করতে পারে।

(৩) অর্জুন! এতে সীমিতফলরূপ দোষও হয় না যে স্বর্গ, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিতে ভুলিয়ে পথভ্রান্ত করে দেবে।

(৪) এই কর্মের অল্পও অনুষ্ঠান জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে উদ্ধার করে।

কিন্তু এখনও স্পষ্ট করলেন না যে, সেই কর্মটা কি এবং কিরূপে সেই কর্ম সম্পন্ন করা হবে? বর্তমান অধ্যায়ের ৪১তম শ্লোকে তিনি বলেছেন—

(৫) অর্জুন! এতে নিশ্চাত্মক বুদ্ধি একটা। ক্রিয়াও একটাই। তাহলে যাঁরা অনন্ত ক্রিয়ার আচরণ করেন, তাঁরা ভজন করেন না? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—না, তাঁরা ভজন করেন না। এর কারণ দেখিয়ে বললেন যে---অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হয় সেইজন্য তাঁরা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেন। তাঁরা সুশোভন বাণী দ্বারা এই ক্রিয়াসমূহকে ব্যক্ত করেন। এবং তাঁদের বাণীর প্রভাব যাঁদের চিত্তের উপর পড়ে, তাঁদের বুদ্ধিও নাশ হয়। অতএব নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া একটাই। কিন্তু একথা বললেন না যে, সেই ক্রিয়া কি?

প্রস্তুত শ্লোকে তিনি বলছেন—অর্জুন! কর্মে তোমার অধিকার আছে ফলে নেই। ফলের বাসনা কখনও যেন না হয় এবং কর্মেও অশ্রদ্ধা যেন না হয় অর্থাৎ নিরন্তর করবার জন্য মগ্ন হয়ে কর, কিন্তু বললেন না কর্ম কি? প্রায়ই এই শ্লোকের উদাহরণ দিয়ে লোকে বলে যে, যা কিছুই কর না কেন, ফলের কামনা ত্যাগ করে কর, তাহলেই নিষ্কাম কর্মযোগ হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম কি? তা না বলে কেবল কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন যে, সেই কর্ম কি কি প্রদান করে এবং কর্ম করবার সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়? প্রশ্নটি যেমনের তেমনি রয়ে গেল, যা শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট করবেন।

পুনরায় এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।। ৪৮।।

ধনঞ্জয়! আসক্তি ও সঙ্গদোষ ত্যাগ করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার যোগে স্থিত হয়ে কর্ম কর। কি কর্ম? নিষ্কাম কর্ম কর। **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'**- এই সমত্ব ভাবকেই যোগ বলা হয়। যার মধ্যে বৈষম্য নেই, এইরূপ ভাবকেই সমত্ব বলে। ঋদ্ধি-সিদ্ধিই বৈষম্য উৎপন্ন করে, আসক্তি আমাদের জন্য বিষম অবস্থার সৃষ্টি করে, ফলের ইচ্ছা বৈষম্যের সৃষ্টি করে সেইজন্য ফলের আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে পুনশ্চ কর্মেও যেন অশ্রদ্ধা না হয়। দৃশ্য-শ্রব্য সকল বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির বিষয়ে চিন্তন না করে যোগে স্থিত থেকে শুধু কর্ম কর। যোগ থেকে চিত্ত সরে যেন না যায়।

যোগ হল পরাকাষ্ঠার এক স্থিতি-বিশেষ এবং এর শুরুর কোন এক অবস্থাও হয়। শুরুতেও আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যের উপরই থাকা উচিত। অতএব যোগের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। সমত্বভাব অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান ভাবকেই যোগ বলে। যাঁকে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি বিচলিত করতে পারে না, যাঁর মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না, এইরূপ ভাবের জন্য একে সমত্ব যোগ বলা হয়। এই সমতা ইষ্ট প্রদান করে থাকেন, সেইজন্য একে সমত্বযোগ বলে। সম্পূর্ণ কামনার ত্যাগের জন্য একে নিষ্কাম কর্মযোগও বলে। কর্ম করতে হবে, সেইজন্য একে কর্মযোগ বলে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন করায় তাই এর নাম যোগ অর্থাৎ মিল। এখানে বৌদ্ধিক স্তরে খেয়াল রাখতে হয় যে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যেন সমভাব থাকে, আসক্তি উৎপন্ন না হয়, ফলের বাসনাও উদয় না হয়, সেইজন্য এই নিষ্কাম কর্মযোগকে বুদ্ধিযোগও বলা হয়।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।। ৪৯।।

ধনঞ্জয়! '**অবরং কর্ম**'- নিকৃষ্ট কর্ম, সকাম কর্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ। যারা ফলের কামনা করে, তারা কৃপণ। তারা আত্মার সঙ্গে উদার ব্যবহার করে না, অতএব সমত্ব বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। মনে যে কামনা আছে তা যদি পূরণও হয়, তাহলেও তা ভোগ করবার জন্য দেহ ধারণ করতে হবে। যদি গমনাগমন বাকী থাকল, তাহলে কিরূপ কল্যাণ? সাধককে মোক্ষের ইচ্ছাও করা উচিত নয়, কারণ বাসনামুক্ত হওয়াকেই মোক্ষ বলে। ফলের চিন্তন করলে সাধকের সময় ব্যর্থই নষ্ট হয় এবং ফললাভ হলে ফলেতেই জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সাধনা শেষ হয়ে যায়। এর পর সাধক ভজন করবেন কেন? সেখান থেকেই তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। সেইজন্য সমত্ববুদ্ধির দ্বারা যোগের আচরণ কর।

জ্ঞানমার্গকেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগ বলেছিলেন যে, "অর্জুন! এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে" এবং এখানে নিষ্কাম কর্মযোগকেও বুদ্ধিযোগ বলা হল। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুদ্ধির ও দৃষ্টিকোণেরই। তাতে লাভ-লোকসানের হিসাব করে, বিবেচনা করে চলতে হয়। এতেও বৌদ্ধিক স্তরে সমত্ব স্থিতি বজায় রাখতে হয়। সেইজন্য একে সমত্ব বুদ্ধিযোগ বলে। তাই হে ধনঞ্জয়! তুমি সমত্ব বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষী অত্যন্ত কৃপণ।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।। ৫০।।

সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পুণ্য-পাপ উভয়কে ইহলোকেই ত্যাগ করেন অর্থাৎ পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হন না, সেইজন্য সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের অনুষ্ঠান কর। **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'**- সমত্ব বুদ্ধির সংযোগে আচরণে কুশলতাই যোগ।

সংসারে কর্ম করবার প্রচলিত দৃষ্টিকোণ দুটি। লোকে কর্ম করে, তাই তারা ফলও পেতে চায় অথবা ফললাভ না হলে কর্ম করতেই চায় না; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মকে বন্ধনের কারণ বলেছেন। 'আরাধনা'কেই একমাত্র কর্ম বলেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে তিনি কর্মের নাম মাত্র নিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে তার পরিভাষা দিয়েছেন ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের স্বরূপের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। প্রস্তুত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক পরম্পরা থেকে সরে কর্ম করবার কৌশল সম্বন্ধে বলেছেন যে, কর্ম কর, শ্রদ্ধাপূর্বক কর; কিন্তু ফলের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ কর। ফল যাবে কোথায়? একেই কর্ম করবার কুশলতা বলে। নিষ্কাম সাধকের সমগ্র শক্তি এই প্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকে। আরাধনার জন্যই এই দেহ ধারণ। তবু এই জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে, তবে কি সর্বদাই কর্ম করে যেতে হবে অথবা এর পরিণামও দেখা যাবে? পরবর্তী শ্লোকটি দেখুন–

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।। ৫১।।

বুদ্ধিযোগযুক্ত জ্ঞানীগণ কর্মজাত ফলত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন। তাঁরা নির্দোষ অমৃতময় পরমপদ লাভ করেন।

এখানে তিন ধরণের বুদ্ধির চিত্রণ করা হয়েছে। (শ্লোক ৩১) সাংখ্য বুদ্ধিতে ফল দুটি স্বর্গ এবং শ্রেয়। (শ্লোক ৫১) কর্মযোগে প্রবৃত্ত বুদ্ধির ফল একটাই–জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি, নির্মল অবিনাশী পদলাভ। দুটিই হল যোগক্রিয়া। এর অতিরিক্ত যে বুদ্ধি সেটি অবিবেকজন্য, অনন্ত শাখাযুক্ত, যার ফল হ'ল কর্মভোগের জন্য বারম্বার জন্ম-মৃত্যু।

অর্জুনের দৃষ্টি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য এবং দেবগণের অধিপতি পদপর্যন্ত সীমিত ছিল। এতটা লাভের জন্যও তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিলেন না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

প্রতি নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করলেন যে, আসক্তিশূণ্য কর্মদ্বারা অনামায় পদলাভ হয়। নিষ্কাম কর্মযোগ পরমপদ লাভে সাহায্য করে, যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নেই। এই কর্মে কখন প্রবৃত্তি হবে?—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।। ৫২।।

যখন তোমার (প্রত্যেক সাধকের) বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম অতিক্রম করবে, লেশমাত্রও মোহ থাকবে না অর্থাৎ পুত্র, ধন, প্রতিষ্ঠা এগুলির সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তা ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন যা শ্রবণযোগ্য তা তুমি শুনতে পাবে এবং শোনার ফলস্বরূপ বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে অর্থাৎ তা আচরণ করতে সমর্থ হবে। এখন যা শ্রবণযোগ্য, তা তুমি শোননি, তাই আচরণের প্রশ্নই ওঠে না। এই যোগ্যতার উপর পুনরায় আলোকপাত করলেন—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।। ৫৩।।

নানা বেদবাক্য শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মস্বরূপে সমাধিস্থ হয়ে অচল, স্থির হবে, তখন তুমি সমত্বযোগ লাভ করবে। পূর্ণ সমস্থিতি লাভ করবে, যাকে 'অনাময় পরমপদ' বলে। এই হল যোগের পরাকাষ্ঠা এবং অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি। বেদ থেকে শিক্ষা অর্জন করা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, '**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না**'- শ্রুতিগুলির নানা সিদ্ধান্ত শ্রবণে বুদ্ধি বিচলিত হয়। লোকে নানা সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে থাকে, কিন্তু যা শ্রবণেযোগ্য তার থেকে তফাতেই থাকে।

যখন এই বিচলিত বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি যোগের পরাকাষ্ঠা অমৃত পদলাভ করবে। একথা শোনার পর অর্জুনের উৎকন্ঠা স্বাভাবিক ছিল যে, সেই মহাপুরুষগণ কেমন হন, যাঁরা অনাময় পরমপদে স্থিত, সমাধিতে যাঁদের বুদ্ধি স্থির? তিনি প্রশ্ন করলেন—

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।। ৫৪।।

"সমাধীয়তে চিত্তং যস্মিন্ স আত্মা এব সমাধিঃ" অর্থাৎ যাতে চিত্তের সমাধান করা হয়, সেই আত্মাই হ'ল সমাধি। যিনি অনাদি তত্ত্বের সমতুল্য অবস্থা লাভ করে থাকেন, তাঁকেই সমাধিস্থ বলে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন-হে কেশব! সমাধিতে স্থিত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিভাবে কথা বলেন? কিরূপে অবস্থান করেন? কিরূপেই বা তিনি বিচরণ করেন? অর্জুন চারটি প্রশ্ন করলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ব্যক্ত করে বললেন-

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। ৫৫।।

পার্থ! যখন মানুষ সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আত্মাদ্বারাই আত্মাতে সন্তুষ্ট হন ও তাঁকে তখন স্থিরবুদ্ধিযুক্ত বলা হয়। কামনাগুলি ত্যাগ করলেই আত্মার দিগ্‌দর্শন হয়। এইরূপ আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। ৫৬।।

দৈহিক, দৈবিক এবং ভৌতিক দুঃখে যাঁর মন উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ, যাঁর আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধনাশ হয়েছে, মননশীলতার চরমসীমায় যিনি পৌঁছেছেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৫৭।।

যে পুরুষ সর্বত্র স্নেহবর্জিত, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়েছে। শুভ পরমাত্ম-স্বরূপ-এ সংযোগ করে এবং অশুভ প্রকৃতিতে প্রলুব্ধ করে রাখে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অনুকূল পরিস্থিতিতে আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখিত হন না; কারণ প্রাপ্তযোগ্য বস্তু তাঁর থেকে ভিন্ন নেই এবং সেই বিকারগুলিও নেই, যেগুলি পতিত করে দেয় অর্থাৎ তখন তাঁর সাধনার প্রয়োজন থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।।

যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ এই পুরুষ যখন চারদিক্ থেকে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়। বিপদের সম্মুখীন হলেই কচ্ছপ যেমন নিজের মাথা-পা সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যে পুরুষ বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক বিষয় থেকে আকর্ষণ করে হৃদয়-দেশে নিরুদ্ধ করেন, সেইকালে সেই পুরুষের বুদ্ধি স্থির হয়; কিন্তু এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। বিপদ দূর হলেই কচ্ছপ নিজ অঙ্গসমূহ পুনরায় প্রসারিত করে, স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষও কি সেই প্রকার বিষয়ে রস নিতে আরম্ভ করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।। ৫৯।।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পুরুষগণ বিষয়ভোগ গ্রহণ করেন না, তাঁরা বিষয় থেকে নিবৃত্ত হন, কারণ তাঁরা গ্রহণ করেন না; কিন্তু তাঁদের আসক্তি দূর হয় না। আসক্তি রয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করেন যে নিষ্কামকর্মীগণ তাঁদের আসক্তি '**পরং দৃষ্ট্বা**'- পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে নিবৃত্ত হয়।

মহাপুরুষ কচ্ছপের মত নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ে লিপ্ত করেন না। ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় থেকে নিবৃত্ত হলে সংস্কার লুপ্ত হয়ে যায়। এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে না। নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ করে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষের বিষয়াসক্তি দূর হয়। চিন্তন পথে প্রায়ই হঠকারিতা দেখা যায়। দৃঢ় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করে নিবৃত্ত হয়ে যান, কিন্তু মনে আসক্তি ও বিষয়-চিন্তন লেগেই থাকে। এই আসক্তি 'পরং দৃষ্ট্বা'-পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলেই দূর হয়, তার আগে নয়।

পূজ্য মহারাজজী এই সম্বন্ধে নিজের জীবনের একটি ঘটনা বলতেন। গৃহত্যাগের পূর্বে তাঁর প্রতি তিনবার আকাশবাণী হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম— "মহারাজজী! আপনার প্রতি আকাশবাণী কেন হয়েছিল? আমাদের প্রতি তো হয়নি।" তখন মহারাজজী বলেছিলেন— "হো! ই শঙ্কা মোহুঁকে ভই রহী।" অর্থাৎ এই সন্দেহ আমারও হয়েছিল। তখন অনুভব হল যে, আমি গত সাত জন্ম

থেকে সাধু। চার জন্ম কেবল সাধুর বেশে তিলক কেটে, ভস্ম মেখে, কোথাও কমণ্ডলু নিয়ে বিচরণ করেছি। যোগক্রিয়ার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু গত তিনজন্ম ধরে যেমন হওয়া উচিত, তেমনি সাধু ছিলাম। আমার অন্তরে যোগক্রিয়া জাগ্রত ছিল। পূর্ব জন্মেই নিবৃত্তি হয়ে এসেছিল, কিন্তু দুটি ইচ্ছা বাকী ছিল, স্ত্রী ও গাঁজা। অন্তর্মনে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাইরে থেকে আমি শরীরকে দৃঢ় রেখেছিলাম। মনে বাসনা ছিল, তাই জন্ম নিতে হয়েছে। জন্মের পর অল্প সময়ের মধ্যেই ভগবান্ সবকিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে নিবৃত্তি প্রদান করেছেন। দুই-তিন তুড়ি দিয়েই সাধু বানিয়ে দিয়েছেন।

এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যিনি বিষয় গ্রহণ করেন না, সেই পুরুষেরও বিষয় থেকে নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সাধনা করে পরমপুরুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে বিষয়গুলির আসক্তিও চলে যায়। অতএব সাক্ষাৎকার যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ কর্ম করা উচিত।

উর কছু প্রথম বাসনা রহী। প্রভুপদ প্রীতি সরিত সো বহী।।

(রামচরিতমানস, ৫/৪৮/৬)

ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। এর উপর আলোকপাত করলেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।। ৬০।।

কৌন্তেয় ! প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়সমূহ যত্নশীল মেধাবী পুরুষের মনকে বলপূর্বক হরণ করে, বিচলিত করে দেয়। সেইজন্য—

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬১।।

সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে, যোগযুক্ত এবং সমর্পণের সঙ্গে আমার আশ্রয়ে এস; কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়েছে তাঁরই বুদ্ধি স্থির হয়। এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাধনের নিষেধাত্মক অবয়বগুলির সঙ্গে তার বিধেয়াত্মক দিকের উপর জোর দিলেন। কেবল সংযম ও নিষেধদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়

না। সমর্পণের সঙ্গে ইষ্ট-চিন্তন অনিবার্য। ইষ্ট-চিন্তনের অভাবে বিষয়-চিন্তন হবে, যার কুপরিণাম শ্রীকৃষ্ণের শব্দেই দেখুন–

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।

সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।। ৬২।।

বিষয়সমূহ চিন্তন করতে করতে মানুষের সেই সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনা জাগে, কামনা-পূর্তিতে বাধা পেলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে কি হয়?–

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি।। ৬৩।।

ক্রোধ থেকে মূঢ়ভাব অর্থাৎ অবিবেক উৎপন্ন হয়। নিত্য-অনিত্য বস্তুর জ্ঞান থাকে না। অবিবেক থেকে স্মৃতি বিভ্রম হয়। (যেমন অর্জুনের হয়েছিল– **'ভ্রমতীব চ মে মনঃ।'** গীতা সমাপনের সময় তিনি বলেছেন–**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' (১৮/৭৩)**। কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, তার নির্ণয় করা যায় না।), স্মৃতিবিভ্রম হলে যোগপরায়ণ বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হলে এই পুরুষ নিজ শ্রেয-সাধন পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ জোর দিলেন যে, বিষয়ের চিন্তন করা উচিত নয়। সাধকের নাম, রূপ, লীলা ও ধামেই কোথাও না কোথাও মনকে নিযুক্ত রাখা উচিত। ভজনে অলসতা করলে মন বিষয়াভিমুখ হবে। বিষয়ের চিন্তন থেকে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে সেই বিষয়ের কামনা সাধকের অন্তর্মনে জাগে। কামনা পূর্তিতে ব্যবধান উৎপন্ন হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে অবিবেক, অবিবেক থেকে স্মৃতি-বিভ্রম এবং স্মৃতি-বিভ্রম থেকে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। নিষ্কাম কর্মযোগকে বুদ্ধিযোগ বলা হয়। কারণ বুদ্ধিস্তরে এর বিচার করা উচিত যে, কামনাগুলি যেন না জাগে, ফল নেই। কামনা জাগলে এই বুদ্ধিযোগ নষ্ট হয়ে যায়। **'সাধন করিয় বিচারহীন মন শুদ্ধ হোয় নহীঁ তৈসে।' (বিনয়পত্রিকা, পদসংখ্যা ১১৫/৩)** অতএব বিচার আবশ্যক। বিচারশূণ্য পুরুষ শ্রেয়-সাধন থেকে পতিত হয়। সাধন-ক্রম ভঙ্গ হয়, সর্বথা নষ্ট হয় না। যেখানে অবরুদ্ধ হয়েছিল, ভোগের পর সাধন সেইখান থেকেই পুনরায় আরম্ভ হয়।

বিষয়াভিমুখ সাধকের এই গতি হয়। স্বাধীনচেতা সাধক কোন্ গতিলাভ করেন? একে আধার করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।। ৬৪।।

আত্ম-বিধিপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ রাগ-দ্বেষ মুক্ত হয়ে স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা '**বিষয়ান্ চরন্**'- বিষয়সমূহে বিচরণ করেও '**প্রসাদমধিগচ্ছতি**'- অন্তঃকরণের নির্মলতা লাভ করেন। তিনি নিজের ভাবদৃষ্টিতে অবস্থান করেন। মহাপুরুষের জন্য বিধি-নিষেধ থাকে না। তাঁরজন্য অশুভ বলে কিছু থাকে না, যার থেকে তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে চলবেন এবং শুভ বলেও কিছু থাকে না, যা তিনি কামনা করবেন।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।। ৬৫।।

ভগবানের পূর্ণ কৃপাপ্রসাদ 'ভগবত্তা'র সঙ্গে সংযুক্ত হলে সেই পুরুষের সর্বদুঃখের অভাব হয়, '**দুঃখালয়ং অশাশ্বতম্**' **(গীতা, ৮/১৫)** সংসারের অভাব হয় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি শীঘ্রই উত্তমরূপে স্থির হয়। কিন্তু যিনি যোগযুক্ত নন, তাঁর অবস্থার কথা বলবার প্রসঙ্গে—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।। ৬৬।।

যোগ-সাধনাশূণ্য পুরুষের অন্তঃকরণে সকাম বুদ্ধি থাকে। ঐ অযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভাবও হয় না। ভাববিহীন পুরুষের শান্তি কোথায়? এইরূপ অশান্ত পুরুষের সুখ কোথায়? যোগ-ক্রিয়ার আচরণ করবার পর কিছু অনুভব হলেই ভাব জন্মায়। '**জানে বিনু ন হোই পরতীতি।**' **(মানস, ৭/৮৮-খ/৭)** ভাবনা হলে শান্তি হয় না এবং অশান্ত পুরুষের সুখ অর্থাৎ শাশ্বত, সনাতনের প্রাপ্তি হয় না।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।। ৬৭।।

বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে বলপূর্বক গন্তব্য স্থান থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেইরূপ বিষয়সমূহে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে, যে ইন্দ্রিয়টিকে মন অনুসরণ করে, সেই একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ই ঐ অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। অতএব যোগের আচরণ অনিবার্য। ক্রিয়াত্মক আচরণের উপর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জোর দিলেন–

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬৮।।

হে মহাবাহো! সেইজন্য যে পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁর বুদ্ধিই স্থির হয়। 'বাহু' কার্যক্ষেত্রের প্রতীক। ভগবানকে 'মহাবাহু' এবং 'আজানুবাহু' বলা হয়। তিনি হাত-পা ব্যতীত সর্বত্র কার্য করেন। তাতে যিনি স্থিতি লাভ করেন অথবা যিনি সেই ভগবত্তার দিকে অগ্রসর, তিনিও মহাবাহু। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই মহাবাহু।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।। ৬৯।।

সর্বভূতের পক্ষে পরমাত্মা রাত্রিস্বরূপ; কারণ তিনি দৃশ্যমান নন, বিচারের অধীন নন, তাই রাত্রি স্বরূপ। সেই রাত্রিতে, পরমাত্মাতে স্থিত সংযমী পুরুষ উত্তমরূপে দেখেন, বিচরণ করেন, জাগ্রত থাকেন; কারণ সেখানে তাঁর প্রবেশ আছে। যোগী ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমের দ্বারা তাঁতে স্থিতি লাভ করেন। যে বিনাশশীল সাংসারিক সুখ-ভোগের জন্য ভূতগণ দিন-রাত পরিশ্রম করে, যোগীর পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ।

রমা বিলাসু রাম অনুরাগী। তজত বমন জিমি জন বড়ভাগী।।
(রামচরিতমানস, ২/৩২৩/৮)

যিনি যোগী পরমার্থ পথে নিরন্তর সজাগ এবং ভৌতিক ইচ্ছা থেকে সর্বথা মুক্ত, তিনিই ইষ্টে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি এই সংসারেই থাকেন; কিন্তু তাঁর উপর সংসারের কোন প্রভাব পড়ে না। মহাপুরুষ কিভাবে অবস্থান করেন, এখানে তারই বর্ণনা করা হয়েছে–

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০।।

যেমন পরিপূর্ণ অচল প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রে নদীগুলি প্রচণ্ড বেগে প্রবেশ করে, তাতে লীন হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, সেইরূপ পরমাত্মাতে স্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের মনে ভোগগুলি কোন বিকার উৎপন্ন না করে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এরূপ পুরুষ পরমশান্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তি লাভ অসম্ভব।

ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত নদীগুলির স্রোত ফসল নষ্ট করে, প্রাণীদের হত্যা করে, নগর প্লাবন, হাহাকারের সৃষ্টি করে প্রচণ্ডবেগে সমুদ্রে মিলিত হয়; কিন্তু সমুদ্রে বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাতেই সমাহিত হয়। সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের প্রতি বিষয়ভোগ ততটা বেগেই আসে কিন্তু সমাহিত হয়ে যায়। ঐ মহাপুরুষের অন্তরে শুভ অথবা অশুভ কোন সংস্কার উৎপন্ন করতে পারে না। যোগীর কর্ম 'অশুক্ল' ও 'অকৃষ্ণ' হয়। কেননা যে চিত্তে সংস্কার উৎপন্ন হত, তা নিরুদ্ধ এবং বিলীন হয়ে গেছে। এর সঙ্গেই ভগবত্তার স্থিতিলাভ হয়েছে। এখন সংস্কার জন্মাবে কোথায়? এই একটি শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কয়েকটাই জিজ্ঞাসার সমাধান করে দিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল যে, স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ কি? কিভাবে কথা বলেন, অবস্থান করেন, বিচরণ করেন? শ্রীকৃষ্ণ একটা বাক্যেই উত্তর দিলেন যে, তিনি সমুদ্রবৎ হন। তাঁরজন্য বিধি-নিষেধ হয় না যে, এইভাবে বস, চল। তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, কারণ তিনি সংযমী। ভোগাকাঙ্ক্ষী শান্তি পান না। এর উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে—

বিহায় কামান্যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১।।

যে পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করে '**নির্মমঃ**'- আমি ও আমার এই ভাব এবং অহঙ্কাররহিত এবং স্পৃহাশূণ্য হয়ে পর্যটন করেন, তিনি পরমশান্তি লাভ করেন, যারপর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।৭২।।

হে পার্থ ! উপর্যুক্ত অবস্থাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি। সমুদ্রবৎ সেই মহাপুরুষে বিষয়সমূহ নদীগুলির মতো বিলীন হয়ে যায়। তিনি পূর্ণ সংযমী এবং প্রত্যক্ষতঃ পরমাত্মদর্শী হন। কেবল 'অহং ব্রহ্মাস্মি' পড়ে নিলে বা কণ্ঠস্থ করে নিলেই এই স্থিতি লাভ হয় না। সাধন করলে তবেই লাভ হয়। এরূপ মহাপুরুষ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে স্থিত থেকে অন্তিম সময়েও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

নিষ্কর্ষ –

প্রায়ই লোকে বলে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতাশাস্ত্র পূর্ণ হয়, কিন্তু যদি কেবল কর্মের নামমাত্র নিলেই কর্ম পূর্ণ হয়ে যেত, তাহলে এখানেই গীতার সমাপন ভাবা হত। বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে– অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যা জেনে তুমি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কর্ম করাতে তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে নেই, আবার সেই কর্ম করবার সময় তোমার অশ্রদ্ধাও যেন উৎপন্ন না হয়, নিরন্তর করবার জন্য তৎপর হও। এর পরিণামস্বরূপ তুমি '**পরং দৃষ্ট্বা**' (২/৫৯)– পরমপুরুষের দর্শন করে স্থিতপ্রজ্ঞ হবে, পরমশান্তি লাভ করবে। কিন্তু একথা বললেন না কর্ম কি?

এটি 'সাংখ্যযোগ' নামক অধ্যায় নয়। এই নাম টীকাকারের দেওয়া, শাস্ত্রকার দেননি। তাঁরা নিজের বুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করেন, তাতে আশ্চর্য কি?

বর্তমান অধ্যায়ে কর্মের গৌরব, করবার সময় সাবধানতার অবলম্বন এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রভৃতি বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনে কর্মের প্রতি উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিলেন। তাঁর মনে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করেছিলেন। আত্মা শাশ্বত, সনাতন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করে তত্ত্বদর্শী হও। এর প্রাপ্তির পথ দুটি–জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্মযোগ।

নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, স্বয়ং লাভ-লোকসানের নির্ণয় করে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া জ্ঞানমার্গ এবং ইষ্টের উপর নির্ভর করে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সেই কর্মেই প্রবৃত্ত হওয়াকে নিষ্কাম কর্মমার্গ অথবা ভক্তিমার্গ বলে। গোস্বামী তুলসীদাসজী উভয়ের বর্ণনা এইভাবে করেছেন–

মোরে প্রৌঢ় তনয় সম গ্যানী। বালক সুত সম দাস অমানী।।
জনহি মোর বল নিজ বল তাহী। দুহু কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী।।

(রামচরিতমানস, ৩/৪২/৮-৯)

আমার ভজনাকারী দুই প্রকারের—একটি জ্ঞানমার্গী, অন্যটি ভক্তিমার্গী। নিষ্কাম কর্মমার্গী অথবা ভক্তিমার্গী শরণাগত হয়ে, আমার আশ্রয় নিয়ে চলেন, জ্ঞানযোগী নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে, নিজের লাভ-লোকসান বিচার করে নিজের উপর নির্ভর করে চলেন, যদিও উভয়েরই শত্রু এক। জ্ঞানমার্গীকে কাম-ক্রোধাদি শত্রুদের দমন করতে হয় এবং নিষ্কাম কর্মযোগীকেও এদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হয়। উভয়েই কামনা-ত্যাগ করেন এবং উভয় মার্গেই যে কর্ম করা হয় তা'এক। "এই কর্মের পরিণাম পরমশান্তি লাভ করবে।" কিন্তু কর্ম কি? বলা হয়নি। এখন আপনার মনেও এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে নিশ্চয় যে, কর্ম কি? অর্জুনের মনেও কর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই তিনি কর্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসূ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।।২।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।।২।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'কর্মজিজ্ঞাসা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানমার্গের বিষয়ে বলা হয়েছে। সেই বুদ্ধি কি? এই যে যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে বিজয়ী হলে মহামহিম স্থিতি এবং পরাজয় হলে দেবত্বলাভ হবে। জয়লাভ করলে সর্বস্ব এবং পরাভব হলে দেবত্ব, কিছু লাভ হবেই। অতএব এই দৃষ্টিতে লাভ-লোকসান দুটিতেই কিছু না কিছু লাভ হবে। কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি নেই। পুনরায় বললেন– এখন তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যে বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। পুনরায় এই কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন। কর্ম করবার সময় সাবধান হতে বললেন এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে বললেন। কামনাশূন্য হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে বললেন, বললেন কর্ম করবার সময় অশ্রদ্ধাও যেন না হয়, তাহলেই তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। মুক্ত হবে ঠিকই কিন্তু সে বিষয়ে তোমার অবস্থান সম্বন্ধে তোমার অবহিত থাকার কথা নয়।

অতএব অর্জুনের নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গই সহজ বলে বোধ হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– হে জনার্দন! নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গই যদি আপনার বিচারে শ্রেষ্ঠ, তবে কেন আমাকে এই ভয়ঙ্কর কর্মে নিযুক্ত করছেন? এই জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক ছিল। মনে করুন আপনার সম্মুখে দুটি পথ আছে, দুটিই একই স্থানে নিয়ে যায়। এখন আপনি যদি যেতে চান, তাহলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন উভয়ের মধ্যে সুগম কোনটি? যদি না করেন তাহলে আপনি পথিক নন। ঠিক এইভাবে অর্জুনও জিজ্ঞাসা করলেন–

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎকর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।

জনগণের প্রতি দয়ালু, জনার্দন! যদি নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে হে কেশব! আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মযোগে কেন নিযুক্ত করছেন?

নিষ্কাম কর্মযোগ অর্জুনের ভয়ঙ্কর বলে মনে হ'ল; কারণ এতে কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। কর্ম করবার সময় অশ্রদ্ধাও যেন না হয় এবং নিরন্তর সমর্পণের মধ্য দিয়ে যোগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। জ্ঞানমার্গে পরাজয় হলে দেবত্ব, জয়লাভ করলে মহামহিমস্থিতি লাভ হবে। লাভ-লোকসান স্বয়ং নির্ণয় করে এগিয়ে যেতে হবে। অর্জুনের নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ সহজ বলে বোধ হ'ল। সেইজন্য তিনি নিবেদন করলেন—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্।।২।।

আপনি এই মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করছেন। আপনি আমার বুদ্ধির মোহ দূর করবার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছেন। অতএব উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন, যার দ্বারা আমি **'শ্রেয়'**- পরমকল্যাণ, মোক্ষলাভ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন-

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহস্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।

হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই লোকে সত্যানুসন্ধানের দুটি ধারার কথা পূর্বে আমার দ্বারা বলা হয়েছে। পূর্বের অর্থ সত্যযুগ অথবা ত্রেতাযুগ নয়, বরং যা দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলে এসেছি। জ্ঞানীগণের জন্য জ্ঞানমার্গ ও যোগীগণের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ বলা হয়েছে। উভয় মার্গ অনুসারেই কর্ম করতে হবে। কর্ম অনিবার্য।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

অর্জুন! কর্ম আরম্ভ না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না এবং যে ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করলেই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধি লাভ

হয় না। এখন তোমার জ্ঞানমার্গ ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মমার্গ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে।

প্রায়ই এই ক্ষেত্রে, ভগবৎপথে লোকে সহজপথ এবং সুরক্ষা খুঁজতে আরম্ভ করে। "কর্মানুষ্ঠান না করেই, নিষ্কর্মী হওয়া যায়"- যেন এই ধরণের ভুল না হয়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ জোর দিলেন যে, কর্ম আরম্ভ না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না। শুভাশুভ কর্মের শেষ যেখানে, পরম নৈষ্কর্ম্যের সেই স্থিতি কর্ম করেই লাভ করা যায়। সেইরূপ বহু লোকে বলে যে, "আমরা জ্ঞানমার্গী, জ্ঞানমার্গে কর্ম নেই।"- এরূপ বললেই কর্মত্যাগী জ্ঞানী হয় না। যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, তা ত্যাগ করলেই কেউ ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ পরমসিদ্ধি লাভ করে না। কারণ–

ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।

কর্ম না করে কোন পুরুষ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না, কারণ সকলেই প্রকৃতিজাত গুণত্রয়দ্বারা মোহমুগ্ধ হয়ে কর্ম করে। প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পুরুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৭ তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—সকলকর্ম জ্ঞানে শেষ হয়। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করে। এখানে বলছেন কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। তিনি কি বলতে চাইছেন? তাঁর বলবার অর্থ হল যে, যজ্ঞ করতে করতে ত্রিগুণাতীত হলে মনের বিলয় এবং সাক্ষাৎকারের সঙ্গে যজ্ঞের পরিণাম লাভ হলে কর্ম শেষ হয়ে যায়। সেই নির্ধারিত ক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার আগে কর্ম সম্পূর্ণ হয় না, প্রকৃতির হাত থেকে রেহাই পাওযা যায় না।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।

তা' সত্ত্বেও কিছু মূঢ়ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক রুদ্ধ করে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের ভোগসমূহ স্মরণ করে, তাদের মিথ্যাচারী, দাম্ভিক বলে। জ্ঞানী বলে না। এ কথা প্রমাণিত যে, কৃষ্ণকালেও এই ধরণের সংস্কার ছিল। লোকে যা' করণীয় তা ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক রুদ্ধ করে বলে বেড়াত যে আমি জ্ঞানী, আমি পূর্ণ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, তারা সকলেই ধূর্ত। জ্ঞানমার্গ ভাল লাগুক অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

অর্জুন! যিনি মন থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেন, যখন মনেও বাসনার স্ফুরণ হয় না, সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। একথা বোঝা গেল যে, কর্মের আচরণ করতে হবে; কিন্তু প্রশ্ন যে কোন্ কর্ম করব? এই প্রসঙ্গে—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।।৮।।

অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। অর্থাৎ কর্মের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে নির্দিষ্ট যে কর্মটি, সেই নিয়ত কর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্ম করে, অল্প দূরত্বও অতিক্রম করে থাকলে, যেমন পূর্বে বলেছেন যে, জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে, সেইজন্য শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করলে তোমার দেহ-যাত্রাও নির্বাহ হবে না। দেহ-যাত্রার অর্থ লোকে বলে– 'শরীর-নির্বাহ'। কিরূপ শরীর-নির্বাহ? আপনি কি দেহ? এই পুরুষ জন্ম-জন্মান্তর, যুগ-যুগান্তর ধরে দেহ-যাত্রাই তো করে আসছে। বস্ত্র জীর্ণ হলেই, অন্য বস্ত্র ধারণ করে। সেইরূপ কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষপর্যন্ত, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে গোটা জগৎ পরিবর্তনশীল। উত্তম-অধম বিভিন্ন যোনিতে এই জীব নিরন্তর দেহ-যাত্রাই করে চলেছে। কর্মই এই দেহ-যাত্রা সম্পূর্ণ করে। মনে করুন একটা মাত্র জন্ম নিতে হয়েছে, তবু যাত্রা তো সম্পূর্ণ হয়নি, এখনও সে পথিক। যাত্রা সম্পূর্ণ তখনই হবে, যখন গন্তব্য এসে যাবে। পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ করবার পর আত্মাকে শরীরে অনুপ্রবেশ করে আর যাত্রা করতে হয় না। অর্থাৎ শরীর-ত্যাগ এবং শরীর-ধারণ এই পর্যায়ে শেষ হয়। অতএব কর্ম পূর্ণতা প্রদান করে, এই পুরুষকে কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার পর আর দেহের যাত্রা করতে হয় না। **'মোক্ষ্যসেহশুভাৎ' (৪/১৬)**- অর্জুন! এই কর্ম করে তুমি সংসার-বন্ধন স্বরূপ 'অশুভ' থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কর্ম সংসার-বন্ধনথেকে মুক্ত করে দেয়। এখন প্রশ্ন সেই নির্ধারিত কর্ম কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৯।।

অর্জুন! যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্ম। যে ক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়া কর্ম। প্রমাণিত হল যে কর্ম একটি নির্ধারিত প্রক্রিয়া। এছাড়া অন্য কর্ম কি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন— না, সে সব কর্ম নয়। '**অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**'- এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া জগতে যা কিছু করা হয়, যাতে সারা জগৎ রাত-দিন ব্যস্ত, সে সমস্ত এই লোকেরই বন্ধন, কর্ম নয়। কর্ম '**মোক্ষ্যসেহশুভাৎ**'- অশুভ অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। একমাত্র কর্ম হল—যজ্ঞের প্রক্রিয়া। অতএব অর্জুন! সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ অবস্থান করে, উত্তমরূপে কর্মের আচরণ কর। সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ না হলে এই কর্ম সম্পূর্ণ হয় না।

এখন স্পষ্ট হল যে, 'যজ্ঞের অনুষ্ঠানকেই কর্ম' বলে; কিন্তু এখানে পুনরায় এক নূতন প্রশ্নের উদয় হল যে, সেই যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করা হবে? সেইজন্য প্রথমে যজ্ঞ কি তা' না বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে যজ্ঞের উৎপত্তি হ'ল কোত্থেকে? যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি? তার বিশেষত্ব বললেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন যে যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্মের আরম্ভ হবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীর নিপুণতাতে স্পষ্ট হয় যে, যে বিষয়ের বর্ণনা করবেন, প্রথমে তিনি তার বিশেষত্বের বর্ণনা করলেন, যাতে শ্রদ্ধা জাগে। তার পর তিনি তাতে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তার উপর আলোকপাত করলেন এবং অবশেষে মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করলেন।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক শ্রীকৃষ্ণ কর্মের অন্যান্য অঙ্গের উপর আলোকপাত করেছেন যে, কর্ম হল নির্ধারিত ক্রিয়া। নির্ধারিত ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কর্ম, কর্ম নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমবার কর্মের নাম উল্লেখ করেছেন, তার বিশেষত্বের উপর জোর দিলেন, তাতে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তার উপর আলোকপাত করলেন; কিন্তু কর্ম কি? বললেন না। এখানে বর্তমান অধ্যায়ে বললেন যে, কেউ কর্ম না করে থাকতে পারে না। প্রকৃতির প্রভাবে মানুষ কর্ম করে। এছাড়া যারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক অবরুদ্ধ করে মন থেকে বিষয়-চিন্তন করে, তারা ছলগ্রাহী। সেইজন্য অর্জুন! মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে তুমি কর্ম কর। কিন্তু কোন্

কর্ম করা হবে, সে প্রশ্নটি যেমনের তেমনি রইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর।

এখন প্রশ্ন যে, সেই নির্ধারিত কর্ম কি, যার অনুষ্ঠান করতে বলেছেন? তিনি বলছেন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ম। এখন প্রশ্ন ওঠে যে যজ্ঞ কি? এখানে যজ্ঞের উৎপত্তি এবং বিশেষত্ব পর্যন্ত বলবেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবে, যার অনুষ্ঠানই কর্ম।

গীতাশাস্ত্র বোঝার চাবিকাঠি হ'ল, কর্মের এই পরিভাষা। যজ্ঞ ছাড়া সবকিছু করে সংসারী লোকেরা। কেউ চাষ করে, কেউ ব্যবসা। কেউ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, কেউ সেবক। কেউ বা নিজেকে বুদ্ধিজীবী বলে, কেউ বলে শ্রমিক। কেউ সমাজসেবাকে, কেউ দেশসেবাকে কর্ম বলে মনে করে। এই কর্মগুলির মধ্যে কিছু কর্মকে সকাম এবং কিছু কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলে লোকে এর ভূমিকাও তৈরী করে নিয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে, সেসব কর্ম নয়। **'অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ'**–যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া যা কিছু করা হয়, সেসব কর্ম এই লোকেরই বন্ধন, মোক্ষ প্রদানকারী কর্ম নয়। বস্তুতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ম। এখন যজ্ঞ কি, তা না বলে আগে যজ্ঞ এলো কোত্থেকে? তা বলছেন–

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০।।

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের **'ইষ্টকামধুক্'**- যাতে অনিষ্ট না হয়, অবিনাশী ইষ্ট-সম্বন্ধী কামনা পূর্ণ করুক।

যজ্ঞসহিত প্রজাদের কে সৃষ্টি করেছিলেন? প্রজাপতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কে? তিনি কি চতুর্মুখ এবং অষ্টচক্ষুবিশিষ্ট কোন দেবতা, যেমন প্রচলিত আছে? না, শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে দেবতা নামের কোন আলাদা সত্তা নেই। তাহলে প্রজাপতি কে? বস্তুতঃ যিনি প্রজার মূল উদ্‌গম, পরমত্মাতে স্থিতি লাভ করেছেন, সেই মহাপুরুষই প্রজাপতি। বুদ্ধিই 'ব্রহ্মা'। **'অহংকার সিব বুদ্ধি অজ, মন সসি চিত্ত মহান।' (রামচরিতমানস, ৬/১৫ ক)** সেই সময় বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র হয়। এইরূপ মহাপুরুষের মাধ্যমে পরমাত্মাই কথা বলেন।

ভজনের বাস্তবিক ক্রিয়া আরম্ভ হ'লে, বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয়। শুরুতে সেই বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য তাকে 'ব্রহ্মবিৎ' বলা হয়। ক্রমশঃ সমস্ত বিকার শান্ত হলে, ব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রেষ্ঠতা-লাভ করলে তাকে 'ব্রহ্মবিদ্বর' বলা হয়। ধীরে ধীরে বিকাশ আরও সূক্ষ্ম হলে বুদ্ধির আরও বিকাশ হয়, তখন তাকে 'ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্' বলে। সেই অবস্থা-লাভ হলে ব্রহ্মবিদ্বেত্তা পুরুষ অন্যকেও উত্থান মার্গে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হ'ল 'ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ' অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ-এর সেই অবস্থা, যাতে ইষ্ট ওতপ্রোত। এইরূপ স্থিতিলাভ করেছেন যিনি, তিনি প্রজার মূল উদ্‌গম পরমাত্মায় স্থিত থাকেন। এরূপ মহাপুরুষের বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র। তাঁদেরই প্রজাপতি বলা হয়। তাঁরা প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করে আরাধনা ক্রিয়ার রচনা করেন। যজ্ঞের অনুরূপ সংস্কার প্রদান করাই প্রজাসৃষ্টি। এর পূর্বে সমাজ অচৈতন্য এবং অব্যবস্থিত অবস্থাতে থাকে। যজ্ঞের অনুরূপ এদের গড়ে তোলাই হ'ল সৃষ্টি অর্থাৎ সুসজ্জিত করা।

এইরূপ মহাপুরুষ সৃষ্টির আরম্ভে যজ্ঞসহিত প্রজার সৃষ্টি করেছেন। কল্প রোগমুক্ত করে। বৈদ্য কল্প প্রদান করেন, আবার কেউ কায়াকল্প করে। এটা ক্ষণিক শরীরের কল্প। যথার্থ কল্প তখনই হয়, যখন ভবরোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়। আরাধনার আরম্ভ, এই কল্পের প্রারম্ভিক অবস্থা। আরাধনা সম্পূর্ণ হলেই, কল্প সম্পূর্ণ হবে।

সেইরূপ পরমাত্মস্বরূপে স্থিত মহাপুরুষগণ ভজনের আরম্ভে যজ্ঞসহিত সংস্কার সুসংগঠিত করে বললেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও। কিরূপ সমৃদ্ধি? সেই সমৃদ্ধি কি কাঁচা ঘর-বাড়ী পাকা করা, বেশী উপার্জন করা? বলছেন– না, যজ্ঞ **'ইষ্টকামধুক্'**- ইষ্ট-সম্বন্ধী কামনা পূর্ণ করবে। ইষ্ট একমাত্র পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা সম্বন্ধী কামনা পূর্ণ করে এই যজ্ঞ। এখানে প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, যজ্ঞ সরাসরি পরমাত্মার প্রাপ্তি করাবে অথবা ক্রমে ক্রমে চলার পর?–

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।

এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণের উন্নতি কর অর্থাৎ দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি কর। সেই দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করবেন। এইরূপ পরস্পরের উন্নতিদ্বারা পরমশ্রেয়, যারপর কিছু লাভ করা বাকী থাকবে না, এইরূপ পরমকল্যাণ লাভ করবে। যেমন যেমন আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব (পরে যজ্ঞের অর্থ আরাধনার বিধি হবে) তেমন

তেমন হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ অর্জন হতে থাকবে। পরমদেব একমাত্র পরমাত্মা। সেই পরমদেব-এ স্থিতি লাভ করতে সাহায্য করে যে সম্পদ্ অন্তঃকরণে যে সজাতীয় প্রবৃত্তি বিদ্যমান, সেই সজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহই দৈবী সম্পদ্। এদের সাহায্যেই পরমদেব-এর প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য দৈবী সম্পদ্ বলা হয়। বাহ্য জগতের দেবতা-পাথর-জল নয়, যেমন লোকে কল্পনা করে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তাদের অস্তিত্ব নেই। আরও বলছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।

যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত দেবতাগণ (দৈবী সম্পদ্) আপনাকে **'ইষ্টান্ ভোগান্ হি দাস্যন্তে'**- ইষ্ট অর্থাৎ আরাধ্য-সম্বন্ধী ভোগ প্রদান করবেন, অন্য কিছু নয়। **'তৈঃ দত্তান'**- তিনিই একমাত্র দাতা। ইষ্টলাভের অন্য কোন বিকল্প নেই। এই দৈবী গুণসমূহকে সংবর্ধন না করে, যিনি এই স্থিতি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর। যখন লাভ হয় নি, তখন তিনি কি উপভোগ করবেন? কিন্তু বলেন অবশ্যই, আমি পূর্ণ, তত্ত্বদর্শী। এইরূপ মিথ্যাবাদী এই পথ থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়। তারা চোর, প্রাপ্তকর্ত্তা নয়। কিন্তু যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা কি পেয়েছেন?–

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।

যে সাধুপুরুষগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি করতে করতে পরিণামে প্রাপ্তিকালই পূর্তিকাল। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় যখন, তখন অবশিষ্ট যিনি থাকেন, তিনি হলেন ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই আবার অন্ন। একেই শ্রীকৃষ্ণ অন্যভাবে বললেন যে- **'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**।'- যজ্ঞ যার সৃষ্টি করে, সেই অশন যিনি গ্রহণ করেন, তিনি ব্রহ্মে লীন হন। এখানে তিনি বলছেন যে, যজ্ঞাবশেষ অশন (ব্রহ্ম-পীযুষ) যিনি পান করেন, তিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। সাধু ব্যক্তি মুক্ত হন; কিন্তু পাপী যারা, তারা মোহজাত দেহের পোষণের জন্যই অন্নপাক করে, পাপান্ন গ্রহণ করে। তারা ভজন করে আরাধনা বুঝে অগ্রসরও হয়, কিন্তু পরিবর্তে কিছু কামনা করে যে, **'আত্মকারণাৎ'**– দেহের

এবং এই দেহের সম্বন্ধীদের কিছু লাভ হোক। তারা নিশ্চয় লাভ করবে; কিন্তু তা ভোগ করবার পর নিজেকে তারা সেখানেই দেখতে পাবে, যেখান থেকে ভজনা আরম্ভ করেছিল। এর থেকে বেশী ক্ষতি কি হতে পারে? যখন এই দেহটাই নশ্বর, তখন এর সুখ-ভোগ কতদিন? তারা আরাধনা করে, কিন্তু পরিবর্তে পাপ গ্রহণ করে। '**পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহী।**' তা নষ্ট হবে না ঠিক কিন্তু এগিয়েও যাবে না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম হয়ে কর্ম (ভজন) করবার উপর জোর দিলেন। এখন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যজ্ঞ পরমশ্রেয় প্রদান করে এবং মহাপুরুষই তার রচনা করেন। কিন্তু মহাপুরুষ প্রজা রচনার জন্য কেন প্রবৃত্ত হন? এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎসর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

অন্ন থেকে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। "**অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ**" **(তৈ. উপ. ২/১)**- পরমাত্মাই অন্ন। সেই ব্রহ্ম-পীযুষকেই উদ্দেশ্য করে প্রাণীগণ যজ্ঞের দিকে অগ্রসর হয়। বৃষ্টি থেকে অন্নের উৎপত্তি হয়। মেঘ থেকে যে বৃষ্টি হয় তা নয়, বরং কৃপাবৃষ্টি। পূর্বসঞ্চিত যজ্ঞ কর্মেরই কৃপারূপে বর্ষণ হবে। আজকের আরাধনা কাল কৃপারূপে লাভ হবে। সেইজন্য যজ্ঞদ্বারা বৃষ্টি হয়। স্বাহা উচ্চারণ এবং তিল-যবের আহুতি মাত্র দিলেই যদি বর্ষা হত, তাহলে বিশ্বের অধিকাংশ মরুভূমি অনুর্বর কেন রয়েছে? উর্বর হয়ে থাকত। এখানে যজ্ঞের পরিণাম কৃপাবৃষ্টি। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্মদ্বারা হয়, কর্ম করে গেলেই একদিন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

সেই কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন জানবে। বেদ হ'ল ব্রহ্মস্থিত মহাপুরুষের বাণী। যে তত্ত্ব অবিদিত, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম বেদ, কিছু শ্লোক-সংগ্রহ নয়। বেদ অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে। বলেছেন মহাত্মাগণ, কিন্তু তাঁরা এবং পরমাত্মা ভিন্ন নন। তাঁদের মাধ্যমে অবিনাশী পরমাত্মাই কথা বলেন, সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাপুরুষগণ বেদ পেলেন কোত্থেকে? অবিনাশী পরমাত্মা থেকে বেদের জন্ম হয়েছে। সেই মহাপুরুষগণ এবং তিনি অভিন্ন, তাঁরা যন্ত্রমাত্র, সেইজন্য তাঁদের মাধ্যমে পরমাত্মাই কথা বলেন। কারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করে যখন মন নিরুদ্ধ হয়, তখনই পরমাত্মাকে জানা যায়। সেইজন্য সর্বব্যাপী পরম অক্ষর পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞের অনুষ্ঠানই তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। এরই উপর জোর দিলেন—

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬।।

হে পার্থ! যে ব্যক্তি ইহলোকে মনুষ্যদেহ লাভ করে এই সাধন চক্রের অনুসারে অনুষ্ঠান করে না অর্থাৎ দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ, দেবতাগণের বৃদ্ধি এবং পরস্পর বৃদ্ধিদ্বারা অক্ষয়ধামলাভ- এই ক্রম অনুসারে যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গুলির সুখাকাঙ্ক্ষী সেই 'পাপী ব্যক্তি' বৃথা জীবন ধারণ করে।

বন্ধুগণ! যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধু কর্মের নাম নিয়েছেন এবং বর্তমান অধ্যায়ে বলছেন যে, নিয়ত কর্মের আচরণ কর। যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এছাড়া যা কিছু করা হয়, তা এই লোকেরই বন্ধন। এই কারণে সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে যজ্ঞের পূর্তির জন্য কর্মের আচরণ কর। তিনি যজ্ঞের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন এবং বললেন— যজ্ঞের উৎপত্তি হয়েছে ব্রহ্মা থেকে। প্রজা অন্নকে উদ্দেশ্য করে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। যজ্ঞ কর্ম থেকে এবং কর্ম অপৌরুষেয় বেদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বেদমন্ত্রগুলির দ্রষ্টা মহাপুরুষগণ ছিলেন। তাঁদের পুরুষ তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। প্রাপ্তির পর শেষে অবিনাশী পরমাত্মাই শুধু থাকেন, সেইজন্য বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন। সর্বব্যাপী পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই সাধন-চক্র অনুসারে যে আচরণ করে না, সেই পাপী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের সুখাকাঙ্ক্ষী, ব্যর্থই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ যজ্ঞ এমন বিধি, যাতে ইন্দ্রিয়গুলির বিশ্রাম নেই, বরং অক্ষয় সুখ বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে এর আচরণ করবার বিধান। ইন্দ্রিয়সমূহের সুখ-আকাঙ্ক্ষী যারা, তারা পাপী। এখনও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন না, যজ্ঞ কি? কিন্তু এই যজ্ঞ কি সারাজীবন করে যেতে হবে অথবা কখনও সম্পূর্ণও হবে? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন-

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাঁর জন্য কোন কর্তব্য বাকী থাকে না। এই হল লক্ষ্য। যখন অব্যক্ত, সনাতন, অবিনাশী আত্মতত্ত্ব লাভ হয়ে যায়, তখন আর কার অনুসন্ধান করা হবে? এরূপ পুরুষের কর্মের, আরাধনার প্রয়োজন হয় না। আত্মা ও পরমাত্মা একে অন্যের পর্যায়ভুক্ত। এর পুনরায় বর্ণনা করলেন-

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

এই সংসারে সেই পুরুষের কর্ম করেও কোন লাভ নেই এবং কর্ম না করলেও কোন লোকসান নেই; কিন্তু আত্মতত্ত্ব লাভ হওয়ার পূর্বে এর প্রয়োজন ছিল। তাঁর সমগ্র প্রাণীজগতের সঙ্গে কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে না। আত্মাই শাশ্বত, সনাতন, অব্যক্ত, অপরিবর্তনশীল ও অক্ষয়। যখন আত্মলাভ হয়ে গেছে ও তাতেই সন্তুষ্ট, তাতেই তৃপ্ত, তাতেই ওতপ্রোত এবং স্থিত আছেন, যখন এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, তখন কার খোঁজ করা হবে? কি লাভ হবে? সেই পুরুষের কর্ম ত্যাগ করলেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ বিকারের চিহ্ন যে চিত্তে পড়ে, সেই চিত্তই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর সকলভূতে, বাহ্য জগতে এবং আন্তরিক সঙ্কল্পের স্তরে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সবথেকে বড় উদ্দেশ্য ছিল পরমাত্মাকে লাভ করা, যখন তাঁকে লাভ করেছেন, তখন অন্য কারুকে তাঁর কি প্রয়োজন?

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।।১৯।।

সেই স্থিতি লাভ করবার জন্য তুমি অনাসক্ত হয়ে নিরন্তর '**কার্যং কর্ম**'- করণীয় যে কর্ম, উত্তমরূপে সেই কর্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ অনাসক্ত পুরুষ কর্মের অনুষ্ঠান করে পরমাত্মাকে লাভ করেন। 'নিয়ত কর্ম', 'কার্যং কর্ম' এক। কর্মের প্রেরণা দিয়ে তিনি বললেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসঙ্গ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০।।

জনকের তাৎপর্য রাজা জনক নয়। জনক জন্মদাতাকে বলে। যোগই জনক, আপনার স্বরূপকে জন্ম দেয়, প্রকট করে। যোগসংযুক্ত প্রত্যেক মহাপুরুষ জনক।

এরূপ যোগ-সংযুক্ত বহু ঋষি '**জনকাদয়ঃ**'- জনক ও এই শ্রেণীর সমস্ত জ্ঞানী মহাপুরুষ ও '**কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্**'- কর্ম করেই পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। পরমসিদ্ধির অর্থ হল পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে লাভ করা। প্রাচীনকালে জনক ও এই শ্রেণীর যত মহর্ষি হয়েছেন, এই 'কার্যং কর্মের' দ্বারা, যা যজ্ঞের প্রক্রিয়া, এই কর্ম করেই '**সংসিদ্ধিম্**'- পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু লাভ করবার পর তাঁরাও লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম করেন, লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করেন। অতএব তুমি প্রাপ্তির পর লোকনায়ক হওয়ার জন্য কর্ম করবার উপযুক্ত। কেন?

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, লাভ করবার পর মহাপুরুষের কর্ম করলে কোন লাভ হয়ে না এবং কর্ম না করলেও তাঁর কোন লোকসান হয় না। পুনরপি লোকসংগ্রহ, লোকহিতের জন্য তাঁরা উত্তমরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।২১।।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা' আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তা তাই অনুকরণ করে। সেই মহাপুরুষ যা কিছু প্রমাণ করে দেন, অন্য লোকে তাই অনুসরণ করে।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে স্থিত, আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষের অবস্থিতির উপর আলোকপাত করেছেন যে, তাঁদের কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং ত্যাগ করলে কোন লোকসানও হয় না। তা'সত্ত্বেও জনকাদি উত্তমরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাপুরুষগণের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন যে তিনিও মহাপুরুষ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।২২।।

হে পার্থ! তিনলোকে আমার কোন কর্তব্য নেই। পূর্বে বলেছেন যে, সেই মহাপুরুষের সর্বভূতের প্রতি কোন কর্তব্য নেই। এখানে বলছেন, তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য বাকী নেই এবং লাভের যোগ্য বস্তু কিঞ্চিন্মাত্র লাভ করতে বাকী নেই, তাসত্ত্বেও আমি উত্তম প্রকার কর্মের আচরণ করি। কেন?–

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।

কারণ যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে মনুষ্যগণ আমার অবলম্বিত পথেরই অনুগামী হবে। তাহলে আপনার অনুকরণ কি খারাপ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হ্যাঁ!

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে এই সকল লোক ভ্রষ্ট হবে এবং আমি '**সঙ্করস্য**'- বর্ণসঙ্করের সৃষ্টিকর্ত্তা হব এবং এই সকল প্রজার বিনাশের কারণ হব।

স্বরূপে স্থিত মহাপুরুষ সতর্ক হয়ে যদি আরাধনা-ক্রমে প্রবৃত্ত না থাকেন, তাহলে সমাজ তাঁর অনুকরণ করে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি না করলেও, তাঁর কোন লোকসান নেই, কারণ তিনি আরাধনা সম্পূর্ণ করে নিবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু সমাজ তো এখনও আরাধনা আরম্ভই করেনি। অনুগামীদের পথ-প্রদর্শনের জন্যই মহাপুরুষ কর্ম করেন, আমিও করি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরিত কোন বিশিষ্ট ভগবান ছিলেন না। তিনি বললেন, মহাপুরুষ লোককল্যাণের জন্য কর্ম করেন, আমিও করি। আমি যদি না করি, তাহলে মানুষ আদর্শভ্রষ্ট হবে, সকলেই কর্মত্যাগ করবে।

মন বড় চঞ্চল। সবকিছু পেতে চায়, কেবল ভজন করতে চায় না। স্বরূপস্থ মহাপুরুষ যদি কর্ম না করেন, তবে তাঁকে দেখে অনুগামীগণও কর্ম ত্যাগ করবে। অজুহাত দেখাবে যে, ইনি তো ভজন করেন না, পান খান, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করেন, সামান্যজনের মত কথা বলেন, তবুও এঁকে মহাপুরুষ বলে সমাদর করা হয়–এরূপ চিন্তন করে তারাও আরাধনা ত্যাগ করে, আদর্শভ্রষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন– যদি আমি কর্ম না করি, তাহলে সকলেই ভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসঙ্কর দোষের মূলকারণ হব।

স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্করের প্রভাব দেখা যায়। অর্জুনও এই ভয়ে ব্যাকুল ছিলেন যে স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যদি আমি সাবধান হয়ে আরাধনায় রত না থাকি, তাহলে বর্ণসঙ্কর দোষের মূলকারণ আমি হব। বস্তুতঃ আত্মার শুদ্ধবর্ণ পরমাত্মা। নিজের শাশ্বত স্বরূপের পথ থেকে

ভ্রষ্ট হওয়াই বর্ণসঙ্করতা। স্বরূপস্থ মহাপুরুষ আরাধনা-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত না থাকলে অনুগামীগণ তাঁকে অনুকরণ করতে গিয়ে ক্রিয়ারহিত হয়ে যাবে, আত্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে, বর্ণসঙ্কর হ'য়ে যাবে। তারা প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হবে।

স্ত্রীগণের সতীত্ব এবং জাতির শুদ্ধতা, এগুলি সামাজিক ব্যবস্থা, অধিকারের প্রশ্ন, সমাজের পক্ষে এর উপযোগিতাও আছে; কিন্তু মাতা-পিতার ভুলের কোন প্রভাব সন্তানের সাধনার উপর পড়ে না। **'আপন করনী পার উতরনী।'** হনুমান, ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, শুকদেব, কবীর, যীশু ইত্যাদি উত্তম মহাপুরুষ হয়েছিলেন; কিন্তু সামাজিক কুলীনতার সঙ্গে এঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আত্মা নিজের পূর্বজন্মের গুণধর্ম সঙ্গে নিয়ে আসে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– **'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।'** **(১৫/৭)** মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে কাজ এই জন্মে করা হয়, সেই সংস্কার নিয়ে জীবাত্মা পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। এতে জন্মদাতাদের কোন ভূমিকা নেই। তাঁদের বিকাশ-ক্রমে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না। অতএব স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর হয় না। স্ত্রীগণের কলুষিত হওয়া ও বর্ণসঙ্করের মধ্যে সম্পর্ক নেই। শুদ্ধ স্বরূপের দিকে অগ্রসর না হয়ে, প্রকৃতিতে মুগ্ধ হওয়াকেই বর্ণসঙ্কর বলে।

মহাপুরুষ যদি সাবধান হয়ে ক্রিয়াতে (নিয়ত কর্মে) প্রবৃত্ত না থাকেন এবং অন্য লোকেদের দিয়ে ক্রিয়া না করান, তাহলে তিনি সেই সকল প্রজার হননকারী, বিনাশক হন। সাধনা-ক্রমে চলে সেই মূল অবিনাশীকে লাভ করাই জীবন এবং প্রকৃতিতে মুগ্ধ হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়াই মৃত্যু; কিন্তু মহাপুরুষ যদি এই সকল প্রজাদের ক্রিয়া-পথে চালিত না করেন, সেই সকল প্রজাদের সংযত করে সৎপথে না চালান, তাহলে তিনি সকল প্রজার হননকর্ত্তা, হিংসক হবেন এবং যিনি স্বয়ং চলে অন্যকেও সেই পথে চালান, তিনিই শুদ্ধ অহিংসক। গীতাশাস্ত্র অনুসারে দেহের মৃত্যু নশ্বর কলেবরের মৃত্যু, পরিবর্তন মাত্র, হিংসা নয়।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসঙ্গ্রহম্।।২৫।।

হে ভারত! অজ্ঞানীগণ আসক্ত হয়ে যেরূপ কর্ম করেন, পূর্ণজ্ঞাতা বিদ্বান্ অনাসক্ত হয়ে লোক-হৃদয়ে প্রেরণা এবং কল্যাণ-সংগ্রহের জন্য সেইরূপ কর্ম করেন।

যজ্ঞের বিধি জেনেও, করেও আমরা অজ্ঞানী। জ্ঞানের অর্থ হল প্রত্যক্ষভাবে জানা। যতক্ষণ আমরা লেশমাত্রও আরাধ্য থেকে পৃথক ততক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান, যতক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান ততক্ষণ কর্মে আসক্তি থাকে। অজ্ঞানী যতটা আসক্ত হয়ে আরাধনা করেন, ততটাই অনাসক্তও। যাঁর কর্ম করবার প্রয়োজন নেই, তাঁর আসক্তি কেন হবে? এরূপ পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষও লোকহিতের জন্য কর্মে করেন, দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ করেন, যাতে সমাজ সেই পথে চলতে পারে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

জোষয়েৎসর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

জ্ঞানী পুরুষের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীগণের বুদ্ধিভ্রম না হয় অর্থাৎ স্বরূপস্থ মহাপুরুষগণ সতর্ক হয়ে আচরণ করবেন, যাতে অনুগামীদের মনে কর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়। পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত মহাপুরুষের উচিত যে, স্বয়ং উত্তমরূপে নির্ধারিত কর্ম করে, তাদেরও সেই কর্ম করবার জন্য প্রেরণা দেন।

এই কারণেই চিত্রকুট, অনুসূইয়া আশ্রমে 'পূজ্য মহারাজজী' বৃদ্ধাবস্থাতেও রাত দুটোয় উঠে বসতেন ও রাত তিনটেয় আশ্রমবাসী সাধকদের ডেকে তুলে বলতেন- "মাটির পুতুলরা ওঠো সবাই।" আশ্রমবাসীগণ উঠে যে যার চিন্তন-ক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ গড়িয়ে, পুনরায় উঠে বসতেন এবং বলতেন- "তোমরা মনে চিন্তন কর যে মহারাজজী শুয়ে আছেন; কিন্তু আমি ঘুমাই না, শ্বাস-ক্রিয়ায় রত আছি। এখন বৃদ্ধাবস্থা বসতে কষ্ট হয়, তাই আমি পড়ে থাকি; কিন্তু তোমাদের তো স্থির ও সোজা হয়ে বসে চিন্তন করা উচিত। যতক্ষণ তৈলধারার মত শ্বাস-ক্রিয়ায় ক্রমভঙ্গ না হয়, মাঝে কোন সংকল্প যাতে ব্যবধান উৎপন্ন না করতে পারে, ততক্ষণ সতত প্রবৃত্ত থাকা সাধকের ধর্ম। আমার শ্বাস এখন বাঁশের মত স্থির দাঁড়িয়ে গেছে।" অনুগামীদের জন্য মহাপুরুষগণ উত্তম রূপে কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। "**জিস গুণকো শিখাবৈ, উসে করকে দিখাবৈ**।" অর্থাৎ আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।

এইরূপ স্বরূপস্থ মহাপুরুষের উচিত যে স্বয়ং কর্মে প্রবৃত্ত থেকে সাধকদেরও আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা দেন। সাধকদেরও শ্রদ্ধাপূর্বক আরাধনা-

ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; কিন্তু জ্ঞানযোগী হউন অথবা নিষ্কাম কর্মযোগী, সাধকের অহংকার হওয়া উচিত নয়। কারদ্বারা কর্ম হয়? কর্ম সম্পাদনের কারণ কি? এর উপর শ্রীকৃষ্ণ আলোকপাত করলেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।

আরম্ভ থেকে পূর্ণহওয়া পর্যন্ত কর্ম প্রকৃতির গুণত্রয়দ্বারা সম্পাদিত হয়, তা সত্ত্বেও অহঙ্কারে যিনি বিশেষরূপে মূঢ়, তিনি 'আমি কর্তা'-এরূপ মনে করেন। একথা কিরূপে স্বীকার করা হবে যে, আরাধনা প্রকৃতির গুণে হয়? এটা কে দেখেছেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

হে মহাবাহো! গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগকে '**তত্ত্ববিৎ**'- পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট মহাপুরুষগণ দেখেছেন এবং সম্পূর্ণ গুণ, গুণসমূহে বর্তিত।— এরূপ চিন্তা করে তাঁরা গুণ এবং কর্মের কর্তৃত্বে আসক্ত হন না।

এখানে তত্ত্বের অর্থ পরমতত্ত্ব পরমাত্মা, পাঁচটা অথবা পঁচিশটা তত্ত্ব নয়, লোকে যেমন গণনা করে থাকে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তত্ত্ব একমাত্র পরমাত্মা, অন্য কোন তত্ত্ব নেই। গুণীতীত হয়ে পরমতত্ত্ব পরমাত্মায় স্থিত মহাপুরুষ গুণের অনুসারে কর্মগুলির বিভাজন দেখতে পান। তামসিক গুণের প্রভাবে আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ, কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়ার স্বভাব দেখা যায়। রাজসিক গুণের প্রভাবে-আরাধনা থেকে সরে না আসার স্বভাব, শৌর্য এবং স্বামীভাব দেখা যায়। সাত্ত্বিক গুণ কার্যরত হলে—ধ্যান, সমাধি, অনুভবে উপলব্ধি, নিবন্তর চিন্তন, সারল্য স্বভাবে হবে। গুণ পরিবর্তনশীল। প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানীই বুঝতে পারেন গুণ অনুসারে কর্মের উৎকর্ষ-অপকর্ষ হয়। গুণ নিজের কর্ম করিয়ে নেয় অর্থাৎ গুণ গুণে বর্তিত হয়— এরূপ চিন্তা করে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা কর্মে আসক্ত হন না; কিন্তু যিনি গুণের অতীত হতে পারেননি, এখনও পথিক তাঁকে কর্মে আসক্ত থাকতে হবে। সেইজন্য—

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ পুরুষগণ কর্মে ক্রমশঃ নির্মল গুণের উন্নতি দেখে তাতে আসক্ত হন। সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট **'মন্দান্'**- শিথিল চেষ্টা যাদের, তাদের উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানীপুরুষ চালিত করবেন না। তাদের হতোৎসাহ করবেন না, উৎসাহ দেবেন, কারণ কর্ম করেই পরম নৈষ্কর্ম্য স্থিতি লাভ হবে। নিজের শক্তি ও স্থিতি বুঝে কর্মে প্রবৃত্ত জ্ঞানমার্গী সাধকের উচিত যে, গুণের প্রভাবে কর্মের আচরণ হচ্ছে বলে যেন মনে করেন, নিজেকে কর্তা ভেবে অহঙ্কারী যেন না হয়ে যান, নির্মল গুণলাভ হলেও তাতে আসক্ত যেন না হন। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগীর কর্ম এবং গুণের বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাঁকে আত্মসমর্পণ করে শুধু কর্মে প্রবৃত্ত থাকতে হবে। কোন গুণ কার্যরত, তা দেখার ভার ইষ্টের। গুণের পরিবর্তন এবং ক্রমশ উত্থান তিনি ইষ্টের কৃপা বলে মনে করেন, কর্মের আচরণও তাঁরই কৃপা বলে মনে করেন। অতএব আমি কর্তা এই অহঙ্কার অথবা গুণে আসক্ত হওয়ার সমস্যা তাঁর থাকে না। তিনি তো অনবরত প্রবৃত্ত থাকেন। এই প্রসঙ্গে এর সঙ্গে যুদ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।। ৩০।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি **'অধ্যাত্মচেতসা'**- অন্তরাত্মায় চিত্তকে নিরুদ্ধ করে, ধ্যানস্থ হয়ে, কর্মগুলি আমাতে সমর্পণ করে আশা-মমতা ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ কর। যখন চিত্ত ধ্যানস্থ, লেশমাত্র কিছু পাওয়ার আশা নেই, কর্মের প্রতি আসক্তি নেই, অসফলতার সন্তাপ নেই, তখন সেই পুরুষ যুদ্ধ কি করবেন? যখন চারিদিক্ থেকে চিত্ত সংযত হয়ে হৃদয়-দেশে নিরুদ্ধ হয়ে আসছে, তখন সেই পুরুষ যুদ্ধ করতে যাবেন কেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? সেস্থানে কে বা আছে? বাস্তবে যখন আপনি ধ্যান করতে আরম্ভ করবেন, তখনই যুদ্ধের আসল স্বরূপ আপনি বুঝতে পারবেন। কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ, আশা-তৃষ্ণা ইত্যাদি বিকারসমূহ, বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি যাদের 'কুরু' বলা হয়, এরা সংসারে যাতে প্রবৃত্তি হয় তারই চেষ্টা করবে। বিঘ্নরূপে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করবে। এদের সঙ্গে সংঘর্ষের নামই যুদ্ধ। একে অতিক্রম করে যাওয়াই হ'ল বাস্তবিক যুদ্ধ। এদের নিশ্চিহ্ন করে, অন্তরাত্মায় মনকে স্থির করা, ধ্যানস্থ হওয়াই যথার্থ যুদ্ধ। এর উপর পুনরায় জোর দিলেন—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ।। ৩১।।

অর্জুন! যাঁরা দোষ-দৃষ্টিশূন্য হয়ে, শ্রদ্ধাবান্, আত্মসর্মণের সঙ্গে আমার এই মতের সর্বদা অনুষ্ঠান করেন যে, 'যুদ্ধ কর', তাঁরা সকল কর্ম থেকে মুক্ত হন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাস কেবল হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টানদের জন্য নয়, বরং মানুষ মাত্রের জন্য। তাঁর বাণী হ'ল 'যুদ্ধ কর'। এই আদেশ থেকে এই মনে হয় যেন এই উপদেশ কেবল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের জন্যই ছিল। অর্জুনের সম্মুখে সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল; কিন্তু আপনার সম্মুখে কোন যুদ্ধ স্থিতি নেই। তাহলে গীতাশাস্ত্রের উপদেশ আপনার কি কাজে লাগবে? কারণ কর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় যুদ্ধ। এটা তাঁদের জন্য বিবৃত করা হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। বস্তুতঃ এটা অন্তর্দেশের যুদ্ধ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের, বিদ্যা এবং অবিদ্যার, ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের সংঘর্ষ। আপনি যেমন যেমন ধ্যানে চিত্তকে নিরুদ্ধ করবার চেষ্টা করবেন, তেমন তেমন বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি বিঘ্নরূপে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করবে। তাদের শান্ত করে, চিত্তকে নিরুদ্ধ করার চেষ্টাই যুদ্ধ। যিনি দোষ-দৃষ্টিমুক্ত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি কর্মবন্ধন থেকে, বার বার আসা-যাওয়া থেকে, সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। যারা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, তাদের কেমন গতি হয়? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।। ৩২।।

যে দোষ-দৃষ্টিযুক্ত '**অচেতসঃ**'- মোহনিশাতে অচেতন ব্যক্তিগণ আমার এই মতের অনুসারে অনুষ্ঠান করে না অর্থাৎ ধ্যানস্থ হয়ে আশা-মমতা-সন্তাপরহিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, '**সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্**'- জ্ঞানপথে সর্বদা মোহমুগ্ধ সেই ব্যক্তিগণকে তুমি কল্যাণভ্রষ্টই জানবে। যদি এটাই সত্য, তাহলে লোকে এর অনুষ্ঠান করে না কেন? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩।।

সকল প্রাণী নিজের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্মে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানীও নিজের প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন। প্রাণী নিজের কর্ম অনুসারে আচরণ করে, জ্ঞানী নিজ স্বরূপ অনুসারে। যেমন যার প্রকৃতির প্রভাব, সে সেরকমই কার্য করে থাকে। এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেউ এর হাত থেকে নিস্তার পায় না। এই কারণেই সবাই আমার মতানুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে না। তারা আশা, মমতা, সন্তাপ, শব্দান্তরে রাগ-দ্বেষ এদের ত্যাগ করতে পারে না, যার জন্য কর্মের সম্যক্ আচরণ হয় না। একেই আরও স্পষ্ট করলেন এবং অন্য কারণ দেখালেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪।।

ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে রাগ-দ্বেষ স্থিত। এই দুটির বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই কল্যাণপথে কর্মমুক্ত হওয়ার প্রণালীতে এই রাগ ও দ্বেষ দুর্ধর্ষ শত্রু, আরাধনাতে বাধার সৃষ্টি করে। শত্রু যখন অন্তরে, তখন বাইরে কার সঙ্গে কে যুদ্ধ করবে? ইন্দ্রিয় এবং ভোগের সংসর্গে শত্রু থাকে, আমাদের অন্তঃকরণেই বাস করে। কাজেই এই যুদ্ধও অন্তঃকরণের যুদ্ধ। কারণ দেহটাই ক্ষেত্র, যার মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি সজাতীয় এবং বিজাতীয়, বিদ্যা এবং অবিদ্যা থাকে। যারা মায়ারই দুটি অঙ্গ। এই প্রবৃত্তিগুলির অতীত হওয়া, সজাতীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করে বিজাতীয়কে নিশ্চিহ্ন করাই যুদ্ধ। বিজাতীয় নিশ্চিহ্ন হলে সজাতীয়ের উপযোগিতা আর থাকে না। স্বরূপের ছোঁয়ায় সজাতীয় তার অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। এইভাবে প্রকৃতির পার পাওয়াই যুদ্ধ, যা ধ্যানদ্বারা সম্ভব।

রাগ-দ্বেষ শান্ত করতে সময় লাগে, সেইজন্য বহু সাধক ক্রিয়াত্যাগ করে সহসা মহাপুরুষের অনুকরণ করতে আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এর থেকে সাবধান করলেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।। ৩৫।।

একজন সাধক দশ বছর ধরে সাধনায় প্রবৃত্ত এবং অন্য একজন আজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। উভয়ের ক্ষমতা এক হবে না। প্রারম্ভিক সাধক যদি তাঁর অনুকরণ

করে, তাহলে সে তার নিজের যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে ফেলবে। এই প্রসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, উত্তমরূপে আচরিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত নিজধর্ম অধিক উত্তম। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার স্বভাবজাত ক্ষমতাই স্বধর্ম। নিজের ক্ষমতা অনুসারে সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হলে একদিন মুক্তিলাভ করে। অতএব স্বধর্ম আচরণে মৃত্যুও পরম কল্যাণকর। যেখানেই সাধনে ছেদ পড়ে, আবার দেহলাভ করার পর সেখান থেকেই পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হয়। আত্মার মৃত্যু হয় না। (দেহের) বস্ত্রের পরিবর্তন হলেও বিচার, বুদ্ধি বদলায় না। নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুকরণ করতে আরম্ভ করলে সাধক ভয় পাবেন। ভয় প্রকৃতিতে, পরমাত্মায় নয়। প্রকৃতির আবরণ আরও ঘনীভূত হবে।

ভগবৎ পথে অনুকরণের বাহুল্য দেখা যায়। একবার পূজ্য মহারাজজীর প্রতি আকাশবাণী হয়েছিল যে, তিনি যেন অনুসূইয়াতে গিয়ে বসবাস করেন, তখন তিনি জম্মু থেকে চিত্রকূট এসেছিলেন এবং অনুসূইয়ার ঘোর জঙ্গলে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। অনেক মহাত্মা ঐপথ দিয়ে যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করেছিলেন যে, পরমহংসজী দিগম্বর অবস্থাতে থাকেন এবং তাঁর সম্মানও অনেক, তখন সেই মহাত্মাও কৌপীন ত্যাগ করলেন, দণ্ড-কমণ্ডলু অন্য এক সাধুকে দিয়ে ত্যাগী দিগম্বর সেজে বসলেন। কিছুকাল পরে এসে দেখলেন, পরমহংসজী লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, প্রয়োজন মত সময় সময় তাড়না দেওয়ার ছলে অপশব্দও ব্যবহার করেন। মহারাজজীর প্রতি আদেশ হয়েছিল, তিনি যেন ভক্তদের কল্যাণার্থে কিছু তিরস্কার করেন, এই পথের পথিকদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখেন। মহারাজের অনুকরণ করে সেই মহাত্মাও গালাগাল দিতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তার পরিবর্তে লোকেও তাঁকে ভাল-মন্দ দুকথা শুনিয়ে দিত। তিনি তখন বলেছিলেন–পরমহংসজীকে কেউ কিছু বলে না আর এখানে তো মুখে মুখে জবাব দিচ্ছে।

বছর দুই পরে ফিরে এসে সেই মহাত্মা দেখেছিলেন যে পরমহংসজী গদিতে বসে, লোকে পাখা দিয়ে বাতাস করছে, চামর ব্যজন করছে। তিনিও দেখাদেখি সেই জঙ্গলের এক ভাঙ্গা বাড়ীতে তক্তাপোশ আনিয়ে, তাতে গদি পেতে, দুটি লোক নিযুক্ত করলেন, চামর ব্যজন করবার জন্য। প্রতি সোমবার ভীড়ও হতে লাগল, পুত্রের ইচ্ছুক পঞ্চাশ টাকা দিন, কন্যার ইচ্ছুক পঁচিশ টাকা দিন; পরন্তু কথায় বলে

‘উঘরে অন্ত ন হোই নিবাহূ।’ এক মাসের মধ্যেই সেই সাধুকে সেস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। মান-প্রতিষ্ঠা সব খুইয়ে বসেছিলেন। এই ভগবৎ-পথে অনুকরণের কোন স্থান নেই। সাধককে স্বধর্মেরই আচরণ করা উচিত।

স্বধর্ম কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মের নাম নিয়েছিলেন যে, স্বধর্ম লক্ষ্য করলেও, তুমি যুদ্ধ করার উপযুক্ত পাত্র। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর পথ ক্ষত্রিয়ের জন্য আর নেই। স্বধর্মে অর্জুন ক্ষত্রিয়। যোগেশ্বর সঙ্কেত করলেন যে, অর্জুন! যাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁদের জন্য বেদের উপদেশ ক্ষুদ্র জলাশয়ের তুল্য। তুমি বেদের ঊর্ধ্বে ওঠ এবং ব্রাহ্মণ হও, অর্থাৎ স্বধর্মে পরিবর্তন সম্ভব। এখানে পুনরায় বললেন—রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ো না। এদের কাটিয়ে ওঠ। স্বধর্মই শ্রেয়স্কর— তাঁর বলবার অর্থ এই নয় যে অর্জুন কোন ব্রাহ্মণের অনুকরণ করে তাঁর মত বেশ-ভূষা ধারণ করুক।

কর্মের একমাত্র পথকেই মহাপুরুষগণ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— নিকৃষ্ট, মধ্যম, উত্তম এবং অতি উত্তম। এই শ্রেণী বিভাগকে সাধকের জন্য ক্রমশঃ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের নাম দিলেন। শূদ্র স্থিতি (সেবাধর্ম) থেকে কর্মের আরম্ভ হয় এবং সাধনা ক্রমে ঐ সাধকেই ব্রাহ্মণের স্থিতিলাভ করতে পারেন। এর পরের অবস্থাতে সাধক যখন পরমাত্মায় স্থিতিলাভ করেন, তখন **‘ন ব্রাহ্মণো ন ক্ষত্রিয়ঃ ন বৈশ্যো ন শূদ্রঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্**।’ তিনি বর্ণগুলির ঊর্ধ্বে উঠে যান। এ কথাই শ্রীকৃষ্ণও বললেন যে, ‘**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**’- এই চারবর্ণের সৃষ্টি কর্তা আমি। তাহলে কি জন্মের আধারে মানুষের জাতি-বিভাগ করা হয়েছে? না, ‘**গুণকর্ম বিভাগশঃ**’— গুণের আধারে কর্ম-বিভাগ করেছি। কর্ম কি? তা কি সাংসারিক কর্ম? শ্রীকৃষ্ণ বললেন— না, তা হল নিয়ত কর্ম। এই নিয়ত কর্ম কি? তিনি বললেন— যজ্ঞের প্রক্রিয়াই নিয়ত কর্ম, যার দ্বারা নিঃশ্বাস (প্রাণ)কে প্রশ্বাসে (অপানে) আহুতি, প্রশ্বাস (অপান)কে নিঃশ্বাসে (প্রানে) আহুতি, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি। যার শুদ্ধ অর্থ হ'ল আরাধনা, যোগসাধনা। আরাধ্যদেবপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যে বিধি-বিশেষ তা হল আরাধনা। এই আরাধনা কর্মকেই চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে। যার যেমন ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা অনুযায়ীই তাকে নিজ শ্রেণী থেকেই আরম্ভ করা উচিত। একেই বলে সকলের নিজ নিজ ধর্ম। যদি কেউ শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযৌক্তিক অনুকরণ করে, তাহলে তা বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার নাশ হবে না, কারণ এতে বীজের নাশ নেই; কিন্তু সে প্রকৃতির চাপে ভয়াক্রান্ত,

দীন-হীন নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। যদি প্রথম শ্রেণীর কোন ছাত্র স্নাতক শ্রেণীতে বসতে আরম্ভ করে তাহলে কি তার পাঠ্য-বিষয় বোধগম্য হবে? সে প্রারম্ভিক বর্ণমালা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে। অর্জুন প্রশ্ন করলেন যে, মানুষ স্বধর্মের আচরণ করতে পারে না, কেন?–

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

হে কৃষ্ণ! মানুষ কারদ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হয়ে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? আপনার মতানুসারে চলতে পারে না কেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। ৩৭।।

অর্জুন! রজোগুণজাত এই কাম এবং এই ক্রোধ অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত অত্যন্ত পাপী। কাম-ক্রোধ রাগ-দ্বেষের পূরক। একটু আগেই আমি যার চর্চা করেছি, এই বিষয়ে তুমি এদেরই শত্রু জানবে। এখন এদের প্রভাব সম্বন্ধে বলছেন–

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্থথা তেনেদমাবৃতম্।। ৩৮।।

যেরূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, ময়লাদ্দারা দর্পণ এবং ঝিল্লী দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেরূপ কাম-ক্রোধাদি বিকারসমূহ দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত থাকে। ভেজা কাঠ জ্বালালে কেবল ধোঁয়াই হয় আগুণ থাকা সত্ত্বেও শিখাররূপ নিতে পারে না, ময়লা দিয়ে ঢাকা দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় না, ঝিল্লীদ্বারা যেরূপ গর্ভ আবৃত থাকে, সেরূপ এই বিকারগুলি থাকতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ।। ৩৯।।

কৌন্তেয়! অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। এখন শ্রীকৃষ্ণ কাম এবং ক্রোধ দুটি শত্রুর কথা বললেন। প্রস্তুত শ্লোকে তিনি কেবল একটা শত্রু কামের বিষয়ে বললেন। বস্তুতঃ কামের মধ্যে ক্রোধের অন্তর্ভাব বিদ্যমান। কামনা পূর্ণ হলে ক্রোধ শান্ত হয়, কিন্তু কামনা শেষ হয় না। কামনা পূরণে বাধা উৎপন্ন হলেই পুনরায় ক্রোধ জেগে ওঠে। কামের অন্তরালে ক্রোধ নিহিত থাকে। এই শত্রুর উৎস কোথায়? কোথায় একে খুঁজবে? নিবাসস্থান জানা থাকলে এর সমূল বিনাশে সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।। ৪০।।

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি এদেরই কামের আশ্রয় বলা হয়। কাম মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই জ্ঞানকে আবৃত করে এই জীবকে মোহমুগ্ধ করে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।। ৪১।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে '**নিয়ম্য**'- সংযত কর, কারণ এর অন্তরালে শত্রু বিদ্যমান। তা' তোমার দেহের ভিতরে, বাইরে খুঁজলে কোথাও পাবে না। এটা হৃদয়-দেশের, অন্তর্জগতের যুদ্ধ। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করে, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিনাশক, এই ক্ষতিকারক কামের নাশ কর। কাম সহজে আয়ত্তে আসে না, অতএব বিকারের নিবাসস্থানকেই অবরুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়সমূহকেই সংযত কর।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনকে সংযত করা খুব কঠিন। আমি কি তা করতে পারব? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামর্থ্য বলে উৎসাহ দিচ্ছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।। ৪২।।

অর্জুন! এই দেহ থেকে ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং বলবান বলে জানবে। ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ এবং বলশালী। মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং

যিনি বুদ্ধির থেকেও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তিনিই তোমার আত্মা। সেই হলে তুমি। সেইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি নিরুদ্ধ করতে তুমি সক্ষম।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।। ৪৩।।

এইরূপ বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং বলবান্ স্বীয় আত্মাকে জেনে, আত্মবল বুঝে, বুদ্ধিদ্বারা নিজ মনকে বশ করে অর্জুন! এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুর নাশ কর। নিজের শক্তি বুঝে এই দুর্জয় শত্রুর নাশ কর। কাম দুর্জয় শত্রু। ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কাম আত্মাকে মোহমুগ্ধ করে, তাই নিজের শক্তি বুঝে, আত্মাকে বলবান্ জেনে কামরূপ শত্রুর বিনাশ কর। এখানে স্বতঃসিদ্ধ হয় যে, এই শত্রু আন্তরিক এবং 'যুদ্ধ'ও অন্তর্জগতেরই।

নিষ্কর্ষ –

বহুধা ব্যাখ্যাকার তাঁরা বর্তমান অধ্যায়ের নাম 'কর্মযোগ' দিয়েছেন; কিন্তু এটা সঙ্গত বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর কর্মের নাম নিয়েছেন। তিনি কর্মের মহত্ব প্রতিপন্ন করে, তার মনে কর্ম-জিজ্ঞাসা জাগ্রত করলেন এবং বর্তমান অধ্যায়ে তিনি কর্মকে পরিভাষিত করলেন যে, যজ্ঞের প্রক্রিয়া কর্ম। এখানে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যজ্ঞ কোন নির্ধারিত দিক্ অর্থাৎ প্রক্রিয়া-বিশেষ। এছাড়া জগতে যা কিছু করা হয় তা' এই লোকেরই বন্ধন। শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম সম্বন্ধে বলবেন, সে কর্ম '**মোক্ষসেহশুভাৎ**'– সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিদায়ক কর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের উৎপত্তির বিষয়ে বললেন। যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি ?–তার বিশেষত্বের চিত্রণ করলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর জোর দিলেন। তিনি বললেন-এই যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। যে অনুষ্ঠান করে না, সে পাপী, আরামপ্রিয় ব্যর্থই জীবন ধারণ করে। পূর্ব মহর্ষিগণও কর্ম করেই পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করে ছিলেন। তাঁরা আত্মতৃপ্ত, তাঁদের আর কর্মের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও অনুগামীদের পথ-প্রদর্শনের জন্য তাঁরাও উত্তমরূপে কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। সেই মহাপুরুষগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজের তুলনা করলেন, বললেন–আমারও আর কর্ম করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য আমিও সর্বদা কর্মে প্রবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট পরিচয় দিলেন যে, তিনিও যোগী।

তিনি কর্মে প্রবৃত্ত সাধকগণকে বিচলিত করতে নিষেধ করলেন, কারণ কর্ম করেই সেই সাধককে পরমস্থিতি লাভ করতে হবে। না করলে নাশ হয়ে যাবে। এই কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে যুদ্ধ করতে বললেন। দুচোখ বন্ধ, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে, মন নিশ্চল করে, চিত্ত নিরুদ্ধ করার অভ্যাস, সে কি রকম যুদ্ধ? না, সে সময় কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি সাধকের জন্য বাধক হয়ে দাঁড়ায়, এই বিজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহের হাত থেকে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই যুদ্ধ। আসুরী সম্পদ্ কুরুক্ষেত্র, বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলির এক-একটাকে নাশ করে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টাই যুদ্ধ। বস্তুতঃ ধ্যানেই যুদ্ধ নিহিত। বর্তমান অধ্যায়ের সারাংশ এটাই, এতে যজ্ঞের বাস্তবিক স্বরূপ স্পষ্ট হয়নি। কর্মের বিধি-বিধানের সম্যক্ অনুভবও হয়নি। যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট হলেই কর্ম কি? তা বোঝা যাবে। এখনও কর্ম স্পষ্ট হয়নি।

বর্তমান অধ্যায়ে কেবল স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের প্রশিক্ষণাত্মক দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ গুরুজনদের জন্য। তাঁরা যদি কর্মানুষ্ঠান নাও করেন, তবুও তাতে তাঁদের কোন লোকসান নেই, করলে কোন লাভও নেই; কিন্তু যাদের অভীষ্ট পরমগতি, তাদের জন্য যদি নিয়ম-নির্দেশ না দেওয়া হয়, তবে তা যে 'কর্মযোগ' একথা বলা যাবেই বা কি করে? যোগেশ্বর বলেছেন- 'যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম'; কিন্তু সেই কর্মের স্বরূপ স্পষ্ট করলেন না এবং যজ্ঞ কি? তা বললেন না। বর্তমান অধ্যায়ে যুদ্ধের যথার্থ চিত্রণ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর বলেছেন যে, 'এই শরীর নাশবান্, অতএব যুদ্ধ কর।'–গীতাশাস্ত্রে যুদ্ধের বাস্তবিক কারণ এটাই। পরে জ্ঞানযোগের বিষয়ে ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধই কল্যাণের একমাত্র সাধন বলা হয়েছে এবং বললেন যে, এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধি? এই যে, জয়-পরাজয় উভয়দৃষ্টিতেই জয়লাভ হয়, একথা জেনে যুদ্ধ কর। চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন– যোগেস্থিত হয়ে হৃদয়স্থিত এই স্বীয় সংশয় জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করে যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। পঞ্চম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায়পর্যন্ত যুদ্ধের কোন চর্চা করেননি। একাদশ অধ্যায়ে কেবল এই বলেছেন যে, এই শত্রুগণ আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। যশলাভ কর। এই মৃতদিগকে তুমি বধ কর। যিনি প্রেরক তিনি করিয়ে নেবেন। মৃতদেরই বধ কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারকে দৃঢ়মূল অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বলা হয়েছে, যাকে অসংগতারূপী শস্ত্রদ্বারা ছেদন করে ঐ পরমপদের অনুসন্ধান করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যুদ্ধের উল্লেখ নেই। ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ে অসুরের চিত্রণ অবশ্যই করা হয়েছে, যারা নরকগামী। শুধু বর্তমান অধ্যায়ে যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে। শ্লোক সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত যুদ্ধের স্বরূপ, যুদ্ধের অনিবার্যতা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হলে বিনাশ, যুদ্ধে হন্য শত্রুদের নাম, তাদের বধ করবার জন্য নিজ শক্তির আহবান এব নিশ্চয়ই তাদের বধ করবার জন্য জোর দিলেন। বর্তমান অধ্যায়ে শত্রু এবং শত্রুর আন্তরিক স্বরূপ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে হয়েছে, যাদের বিনাশ করবার জন্য প্রেরণা প্রদান করা হয়েছে। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'শত্রুবিনাশপ্রেরণা' নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'শত্রুবিনাশ প্রেরণা' নামক তৃতীয় অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'শত্রুবিনাশপ্রেরণা' নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।। ৩।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'শত্রু বিনাশ প্রেরণা' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।।

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দোষদৃষ্টিমুক্ত হয়ে যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক আমার মতে চলবেন; তিনি সকল কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবেন। যোগই (জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ) আমাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই যোগেই যুদ্ধসঞ্চার নিহিত। প্রস্তুত অধ্যায়ে তিনি বলছেন যে এই যোগের আবিষ্কারক কে? কিভাবে এর ক্রমিক বিকাশ হয়?

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।।

বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ।।১।।

অর্জুন! আমি এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে বিবস্বান্ (সূর্য) কে বলেছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। কে বলেছিলেন? আমি। শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন? যোগী। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষই এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে অর্থাৎ ভজনের আরম্ভে বিবস্বান্ অর্থাৎ যে নিশ্চেষ্ট, এরূপ প্রাণীর প্রতি বলেন। শ্বাসে সঞ্চার করে দেন। এই স্থানে সূর্য প্রতীকস্বরূপ, কারণ শ্বাসেই ঐ পরমপ্রকাশস্বরূপ বিদ্যমান এবং ঐরূপেই তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করা বিধেয়। বাস্তবিক প্রকাশদাতা (সূর্য) সেস্থানেই আছে।

এই যোগ অবিনাশী। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এর আরম্ভের নাশ নেই। এই যোগ একবার আরম্ভ করে দিলে পূর্ণত্ব প্রদান করেই শান্ত হয়। দেহের কল্প ঔষধির দ্বারা হয়, কিন্তু ভজনের দ্বারা আত্মার কল্প হয়। ভজনের আরম্ভই আত্মকল্পের আদি। এই সাধন-ভজনও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলেই করা সম্ভব হয়। মোহনিশায় অচেতন আদিম মানব, যাদের মধ্যে ভজনের সংস্কার নেই, যোগবিষয়ে যারা কোনদিন চিন্তন

করেনি, এ ধরনের মানুষও মহাপুরুষের দর্শন মাত্র, তাঁর বাণী শুনে, কিছু সেবা-সান্নিধ্য করলে যোগের সংস্কার তাদের মধ্যেও সঞ্চার হয়। একেই গোস্বামী তুলসীদাসজী বলেছেন- **'জে চিতয়ে প্রভু জিন্‌হ প্রভু হেরে।', 'তে সব ভয়ে পরমপদ জোগু।' (রামচরিতমানস, ২/২১৬/১-২)।**

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই যোগ আমি আরম্ভে সূর্যকে বলেছিলাম। **'চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।'** মহাপুরুষের দৃষ্টি-নিক্ষেপ মাত্রই এই যোগের সংস্কার শ্বাসে সঞ্চার হয়। সকলের হৃদয়ে স্বয়ংপ্রকাশ, স্ববশ পরমেশ্বরের নিবাস স্থান। শ্বাস নিরোধের দ্বারাই এর প্রাপ্তির বিধান। শ্বাসে সংস্কারের সৃজনই হ'ল সূর্যের প্রতি বলা। সময় হলে এই সংস্কারের স্ফুরণ মনে হয়, মনুর প্রতি এই হ'ল সূর্যের বক্তব্য। মনে স্ফুরণ হলে মহাপুরুষের বাক্যের প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মনে কোন লালসার স্ফুরণ হলে তা লাভ করবার ইচ্ছাও অবশ্যই হয়, মনু ইক্ষ্বাকুকে তাই বলেছিলেন। লালসা জাগবে যে, সেই নিয়ত কর্ম করি, যা অবিনাশী, যা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দেবে– যদি এমনই হয়, তাহলে করা যাক্ এবং এইভাবে আরাধনাতে তীব্রতা এসে যায়। এই যোগে তন্ময়তা, কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

এইরূপ কোন মহাপুরুষদ্বারা সংস্কারহিত পুরুষের শ্বাসে, শ্বাস থেকে মনে, মন থেকে ইচ্ছায় এবং ইচ্ছা প্রবল রূপ ধারণ করে ক্রিয়াত্মক আচরণের মধ্য দিয়ে এই যোগ ক্রমশঃ উত্থান করতে করতে রাজর্ষি স্তরে পৌঁছোয়, সেই অবস্থায় গিয়েই প্রকাশমান হয়। এই স্তরের সাধকের মধ্যে ঋদ্ধি-সিদ্ধাই-এর সঞ্চার হয়। সেই যোগ এই মহত্বপূর্ণকালে এই লোকেই (দেহেই) প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। এই সীমারেখা কিভাবে পার করা যায়? তাহলে কি এই বিশেষ স্তরে পৌঁছে সকলেই নষ্ট হয়ে যায়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন– না, যিনি আমার আশ্রিত, আমার প্রিয় ভক্ত, অনন্য সখা তিনি নষ্ট হন না।

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।। ৩।।

এই পুরাতন যোগ-সম্বন্ধে এখন আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগ উত্তম ও রহস্যপূর্ণ। অর্জুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিলেন, রাজর্ষি স্তরের ছিলেন, যেখানে ঋদ্ধি-সিদ্ধিই-এর লোভে পড়ে সাধক নষ্ট হয়ে যায়। এই স্তরেও যোগ কল্যাণের মুদ্রাতেই থাকে; কিন্তু প্রায়ই সাধক এখানে এসে স্খলিত হয়ে যায়। এরূপ অবিনাশী কিন্তু রহস্যময় যোগ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন; কারণ অর্জুন নষ্ট হবার অবস্থায় ছিলেন। কেন বললেন? এই জন্য যে তুমি আমার ভক্ত, অনন্যভাবে আমার আশ্রিত, প্রিয় এবং সখা।

প্রস্তুত অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান বলেছেন যে, এই অবিনাশী যোগ কল্পের আরম্ভে আমিই সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্যের নিকট মনু এই গীতা লাভ করেছিলেন এবং নিজের স্মৃতি ভাণ্ডারে সুরক্ষিত করেছিলেন। মনুর নিকট এই স্মৃতি ইক্ষ্বাকু লাভ করেছিলেন এবং পরে রাজর্ষিগণ তাঁর কাছে থেকে এ বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু এই মহত্ত্বপূর্ণ কালে সেই যোগ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই পুরাতন স্মৃতিজ্ঞান-সম্বন্ধে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন। মনু জ্ঞানের যে সারতত্ত্ব লাভ করেছিলেন, সেটা এই গীতাশাস্ত্র। মনু এটাই বংশপরম্পরায় লাভ করেছিলেন। এর অতিরিক্ত আর কোন স্মৃতি তিনি ধারণ করতেন। গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে অর্জুন বলেছেন যে, "আমি জ্ঞান লাভ করেছি", যেরূপ মনু লাভ করেছিলেন। অতএব শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রই বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি।

যে পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক আমরা, সেই (সদ্‌গুরু) পরমাত্মা যখন আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে নির্দেশ দেবেন, তখনই যথার্থ ভজন আরম্ভ হবে। এখানে প্রেরকের স্থানে পরমাত্মা এবং সদ্‌গুরু একে অন্যের পর্যায়। যে স্তরে সাধক দাঁড়িয়ে, সেই স্তরে যখন প্রভু স্বয়ং নেমে আসেন, আদেশ-নির্দেশ দিতে থাকেন, দিক্‌ভ্রান্ত হলে রক্ষা করেন, তখনই মন বশে হয়- **"মন বশ হোই তবহিঁ, জব প্রেরক প্রভু বরজে।" (বিনয়পত্রিকা, ৮৯)** ইষ্টদেব আত্মা থেকে রথী হয়ে, অভিন্ন হয়ে প্রেরকরূপে প্রেরণা প্রদান না করলে, এই পথে ঠিক-ঠিক প্রবেশ হয় না। সেই সাধক প্রত্যাশী অবশ্যই, কিন্তু তার কাছে ভজন কোথায়?

পূজ্য গুরুদেব ভগবান বলতেন- "হো! আমি কয়েকবারই পথভ্রষ্ট হতে হতে বেঁচে গেছি। ভগবানই বাঁচিয়েছেন। ভগবান এইভাবে বুঝিয়েছেন, এই বলেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম- "মহারাজজী! ভগবানও কথা-বার্তা বলেন?"

বললেন– "হ্যাঁ হো! ভগবানও এমনিই কথা বলেন, যেমন আমি-তুমি বলে থাকি, ঘন্টার পর ঘন্টা বার্তালাপ চলে, কিন্তু ক্রমভঙ্গ হয় না।" আমি ম্রিয়মান হয়েছিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যেও পড়েছিলাম যে, ভগবান কথা বলেন, এটাতো বড় নতুন কথা। কিছুক্ষণ পরে মহারাজজী বলেছিলেন- "কেন মন অধীর করছ, তোমার সঙ্গেও বলবেন।" সত্য ছিল তাঁর বক্তব্য এবং এটাই সখ্যভাব। সখার মত তিনি নিরাকরণ করেন, তাহলেই এই দুরবস্থা সাধক উত্তীর্ণ করতে পারে।

এপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহাপুরুষদ্বারা যোগের আরম্ভ, যোগপথে বাধা এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হবার পথসম্বন্ধে বললেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুন প্রশ্ন করলেন-

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।। ৪।।

ভগবন্! আপনার জন্ম '**অপরম্**'- এখন হয়েছে এবং আমার মধ্যে শ্বাসের সঞ্চার বহু আগে হয়েছিল। এই যোগসম্বন্ধে ভজনের আদিতে আপনিই বলেছিলেন, তা কিরূপে বুঝব? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। ৫।।

অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম-এর পূর্বেও হয়েছে। হে পরন্তপ! আমি সেই সকল জানি, কিন্তু তুমি তা জান না। সাধক জানে না, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ জানেন। যিনি অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত, তিনি জানেন। তাহলে কি আপনি আর সকলের মত জন্ম গ্রহণ করেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন– না, স্বরূপলাভ এবং দেহলাভ এক নয়। আমার জন্ম এই চোখে দেখা সম্ভব নয়। আমি অজন্মা, অব্যক্ত, শাশ্বত হয়েও এখন দেহের আধারযুক্ত।

অবধু, জীবত মেঁ কর আসা।
মুএ মুক্তি গুরু কহে স্বার্থী, ঝূঠা দে বিশ্বাসা।।

দেহ থাকতেই সেই পরমতত্ত্বে স্থিতিলাভ সম্ভব। লেশমাত্র ত্রুটি থাকলে, জন্মগ্রহণ করতে হয়। অর্জুন এখনও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের মতই দেহধারী বলে মনে করছেন। তিনি অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করলেন– আপনার জন্ম কি অন্য সকলের মতই হয়েছে? আপনিও কি দেহগুলি যেভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৬।।

আমি বিনাশরহিত, পুনর্জন্মরহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রাণবায়ুতে সঞ্চারিত হয়েও স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করে আত্মমায়াদ্বারা আবির্ভূত হই। একটি মায়া অবিদ্যা, যা প্রকৃতিতে বিশ্বাস এনে দেয়, নীচ এবং অধমযোনির কারণ। অন্যটি মায়া আত্মমায়া, যা আত্মতত্ত্বকে জানবার সুযোগ এনে দেয়, স্বরূপকে জন্ম দেয়। একেই যোগমায়াও বলে। যার থেকে আমরা পৃথক ঐ শাশ্বত স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করে, মিলন করিয়ে দেয়। সেই আত্মিক প্রক্রিয়াদ্বারা আমি স্বীয় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করে আবির্ভূত হই।

প্রায়ই লোকে বলে যে, ভগবানের অবতার হবে, তখন দর্শন করব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, এমন কিছু হয় না যে অন্য কেউ দেখতে পাবে। স্বরূপের জন্ম পিণ্ডরূপে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন– যোগসাধনাদ্বারা, আত্মমায়াদ্বারা নিজের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে স্ব-বশ করে আমি ক্রমশ আবির্ভূত হই। কিন্তু কোন্-কোন্ পরিস্থিতিতে?–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৭।।

হে অর্জুন! যখন যখন পরমধর্ম পরমাত্মার জন্য হৃদয় গ্লানিতে ভরে যায়, যখন অধর্মের বৃদ্ধিতে অনুরাগী উদ্ধারের পথ দেখতে পায় না, তখন আমি আত্মস্বরূপের রচনা করি। এরূপ গ্লানিই মনুর হয়েছিল–

হৃদয় বহুত দুখ লাগ, জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু।

(রামচরিতমানস, ১/১৪২)

যখন আপনার হৃদয় অনুরাগে ভরে ওঠে, ঐ শাশ্বত ধর্মের জন্য **'গদ্‌গদ গিরা নয়ন বহ নীরা'** এই ভাব আসে, চেষ্টা করেও যখন অনুরাগী অধর্ম থেকে উদ্ধার হতে পারে না—এরূপ পরিস্থিতিতে আমি স্বরূপের রচনা করি অর্থাৎ ভগবান কেবল অনুরাগীর জন্য আবির্ভূত হন-

সো কেবল ভগতন হিত লাগী। (রামচরিতমানস, ১/১২/৫)

এই অবতার কোন কোন ভাগ্যবান্ সাধকের অন্তরে অবতীর্ণ হন। আপনি আবির্ভূত হয়ে কি করেন?–

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৮।।

অর্জুন! **'সাধুনাং পরিত্রাণায়'**- পরমসাধ্য একমাত্র পরমাত্মাই। যাঁকে লাভ করবার পর অন্যলাভের প্রয়োজন থাকে না। সেই সাধ্যে প্রবেশ সাহায্য করে যে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ইত্যাদি দৈবী সম্পদ্‌গুলি, সেগুলি নির্বিঘ্নে প্রবাহিত করবার জন্য এবং **'দুষ্কৃতাম্'**- যাদের মাধ্যমে দোষযুক্ত কার্যগুলি সম্পাদিত হয়, সেই কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষাদি বিজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহ সমূলে নষ্ট করতে এবং ধর্মকে উত্তমরূপে স্থাপন করতে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

যুগের তাৎপর্য এখানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে নয়; যুগধর্মের উত্থান এবং পতন মানুষের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। যুগধর্ম চিরকাল ধরে আছে। রামচরিতমানসে সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে–

নিত জুগ ধর্ম হোহিঁ সব কেরে। হৃদয় রাম মায়া কে প্রেরে।।
(রামচরিতমানস, ৭/১০৩ খ/১)

যুগধর্ম সকলের হৃদয়ে সর্বদা পরিবর্তমান। অবিদ্যা থেকে নয়, বরং বিদ্যা থেকে, রামমায়ার প্রেরণা থেকেই হৃদয়ের হয়। রামমায়াকেই প্রস্তুত শ্লোকে আত্মমায়া বলা হয়েছে। হৃদয়ে রামের স্থিতি প্রদানকারী, সেই বিদ্যা রামদ্বারাই প্রেরিত। তাহলে এখন কি করে জানা যাবে যে, কখন কোন্ যুগ কাজ করছে? তা' **'সুদ্ধ সত্ত্ব সমতা বিগ্যানা। কৃত প্রভাব প্রসন্ন মন জানা।।' (মানস, ৭/১০৩ খ/২)** যখন হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ কার্যরত হয়, রাজস এবং তামস দুটি গুণই শান্ত হয়ে যায়, বৈষম্য শেষ হয়ে

যায়, যিনি দ্বেষশূণ্য, বিজ্ঞানময় হয়ে যান অর্থাৎ ইষ্ট নির্দেশ গ্রহণ এবং তার উপর দৃঢ় থাকবার ক্ষমতা অর্জন করে নেন, মনে প্রসন্নতার সঞ্চার হয়, এরূপ যোগ্যতা লাভ হলে তখন সত্যযুগে প্রবেশ করেন। এই ভাবেই অন্যদুটি যুগেরও বর্ণনা করা হয়েছে- **তামস বহুত রজোগুণ থোরা। কলি প্রভাব বিরোধ চহুঁ ওরা।। (রামচরিতমানস, ৭/১০৩ খ/৫)** তামসিক গুণ পরিপূর্ণ, কিছু রজোগুণ মিশ্রিত, চারিদিকে শত্রুভাব এবং বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয়, এরূপ অবস্থাযুক্ত ব্যক্তির হৃদয় কলিযুগীয় জানতে হবে। যখন তমোগুণ সক্রিয় হয়, তখন মানুষের মধ্যে আলস্য, নিদ্রা এবং প্রমাদের বাহুল্য দেখা যায়। তমোগুণী ব্যক্তি কর্তব্য জেনেও তাতে প্রবৃত্ত হতে পারে না, নিষিদ্ধ কর্ম জানার পরও তা' থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না। এইভাবে যুগধর্মের উত্থান এবং পতন মানুষের আন্তরিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কোন মহাপুরুষ এই যোগ্যতাগুলিকেই চারটা যুগ বলেছেন, কেউ এই চারযুগকেই চারবর্ণ বলে থাকেন, কেউ এগুলিকেই অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট সাধকের চারটি শ্রেণীরূপে চিহ্নিত করেন। প্রত্যেক যুগে ইষ্ট সহায়করূপে সঙ্গে থাকেন। হ্যাঁ, উচ্চশ্রেণীতে অনুকূল সাহায্য বেশী পাওয়া যায় এবং নিম্নযুগে সহযোগ ক্ষীণ প্রতীত হয়।

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, সাধ্যবস্তু প্রদান করে যে বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদিকে নির্বিঘ্নে প্রবাহিত করবার জন্য এবং দুষণের কারক কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করবার জন্য এবং পরমধর্ম পরমাত্মাতে অচল রাখবার জন্য আমি যুগে যুগে অর্থাৎ প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক শ্রেণীতে আবির্ভূত হই; কিন্তু হৃদয়ে গ্লানি উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ ইষ্ট সম্মতি না দেন, ততক্ষণ আপনি বুঝতেই পারবেন না যে, কোন-কোন বিকার শান্ত হয়েছে, কোন্-কোন্টা এখনও বাকী? প্রত্যেক শ্রেণীর যোগ্যতার সঙ্গে ইষ্ট থাকেন। অনুরাগীর হৃদয়ে তিনি প্রকট হন। ভগবান প্রকট হলে, সকলেই নিশ্চয় দর্শন করবে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন না—

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।। ৯।।

অর্জুন! আমার ঐ জন্ম অর্থাৎ গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপের রচনা এবং আমার কর্ম অর্থাৎ দুষ্কর্মগুলির কারণ যেগুলি সেই কারণগুলির নাশ, যে ক্ষমতাগুলির মাধ্যমে

সাধ্য বস্তু লাভ হয় সেগুলির নির্দোষ সঞ্চার, ধর্মের স্থিরতা– এই কর্ম এবং জন্ম দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক, লৌকিক নয়। এই চর্মচক্ষুর দ্বারা তা দেখা সম্ভব নয়। মন এবং বুদ্ধি দিয়ে অনুমান করা দুরূহ। এত গূঢ় যখন, তখন তাঁকে দর্শন করেন কারা? কেবল '**যো বেত্তি তত্ত্বতঃ**'- কেবল তত্ত্বদর্শীগণ আমার এই জন্ম এবং কর্ম দেখতে সক্ষম হন। আমাকে সাক্ষাৎ করে, তাঁরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কারণ আমাকে লাভ করেন।

যখন তত্ত্বদর্শীই ভগবানের জন্ম এবং কার্য বুঝতে পারেন, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অবতারপুরুষ দেখবার জন্য কেন ভীড় করে যে কোথাও অবতার অবতীর্ণ হবেন তখন দর্শন করব? আপনি কি তত্ত্বদর্শী? আজও বহু ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে, বিশেষত মহাত্মা বেশে নিজেকে অবতারপুরুষ বলে প্রচার করেন, কিম্বা তাদের দালালরা প্রচার করে থাকে। ভীড় উপচে পড়ে অবতারপুরুষ দেখার জন্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কেবল তত্ত্বদর্শীই প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্বদর্শী কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৎ-অসৎ এর নির্ণয় করে বলেছেন যে, অর্জুন! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সৎএর তিনকালে অভাব নেই। তাহলে কি শুধু আপনিই এরূপ বলেন? তিনি বললেন– "না, তত্ত্বদর্শীগণ এটা অনুভব করেছেন।" কোন ভাষাবিদ্ বা সমৃদ্ধিশালী কেউ দেখেননি। পুনরায় এখানে জোর দিলেন যে, আমি আবির্ভূত হই, কিন্তু শুধু তত্ত্বদর্শী প্রত্যক্ষ করেন। এখানে তত্ত্বদর্শী একটা প্রশ্ন। পাঁচ অথবা পঁচিশটি তত্ত্ব নয়। সংখ্যা-গণনা করতে পারলেই তত্ত্বদর্শী হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন যে, আত্মাই পরমতত্ত্ব। আত্মা পরম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরমাত্মা হয়। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তিনিই এই আবির্ভাব অনুভব করতে পারেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, অবতার উৎকৃষ্ট অনুরাগীর হৃদয়েই আবির্ভূত হন। আরম্ভে সাধকের অনুভবে তা ধরা পড়ে না, সাধক বুঝতে পারেন না তাঁকে সঙ্কেত কে দেন? কে পথ দেখান? কিন্তু পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দর্শনের পরই তিনি দেখতে ও বুঝতে পারেন এবং দেহত্যাগের পর তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, আমার জন্ম দিব্য, এই জন্ম যিনি প্রত্যক্ষ করেন তিনি আমাকে লাভ করেন। কিন্তু লোকে তাঁর মূর্তি তৈরী করে, পূজা করে, আকাশে কোথাও তাঁর নিবাসস্থান আছে বলে কল্পনা করে থাকে। এ সমস্তের অস্তিত্বই নেই।

সেই মহাপুরুষের বলবার অর্থ এই যে, যদি আপনি নির্ধারিত কর্ম করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আপনিও দিব্য। "আপনি যে স্থিতি অবস্থা লাভ করবেন, আমি সেই অবস্থা লাভ করেছি। আপনি যার সম্ভাবনা করেন, তা আমি এবং আপনার ভবিষ্যৎও আমি।" যখন আপনি পূর্ণতা লাভ করবেন, তখন আপনিও সেই অবস্থা লাভ করবেন, যে অবস্থাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আপনারও হতে পারে। অবতার বাইরে প্রকট হন না। হ্যাঁ, হৃদয় অনুরাগে পূর্ণ হলে আপনার অন্তরেও অবতারের আবির্ভাব সম্ভব। আপনার অন্তরে সেই অনুভূতি সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রোৎসাহিত করলেন যে, বহু ব্যক্তি আমার মতানুসারে চলে, আমার স্বরূপলাভ করেছেন—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। ১০।।

রাগ ও বিরাগ, উভয়ের অতীত বীতরাগ এবং সেইরূপ ভয়-অভয়, ক্রোধ-অক্রোধ, উভয়ের অতীত, অনন্যভাবে অর্থাৎ নিরহঙ্কার হয়ে আমার শরণাগত অনেক মানুষ জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপলাভ করেছেন। তবে কি আগে এরূপ বিধান ছিল না, এখন হয়েছে? না তা নয়, এই বিধান সর্বদা ছিল। বহু পুরুষ এই প্রকার আমার স্বরূপলাভ করেছেন। কি প্রকার? যাঁর যাঁর হৃদয় অধর্মের বৃদ্ধি দেখে পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য গ্লানিতে ভরে ওঠে, সেই অবস্থায় আমি নিজ স্বরূপের রচনা করি। তাঁরা আমারই স্বরূপ লাভ করেন। যাকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বদর্শন বলেছিলেন, এখানে তাকেই 'জ্ঞান' বলছেন। পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে বলে। তাঁকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁকে জানাই জ্ঞান। এরূপ জানেন যিনি, তিনি জ্ঞানী এবং তিনি আমার স্বরূপলাভ করেন। এই প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ হল। এখন তিনি যোগ্যতার আধারে, ভজনাকারীদের শ্রেণী-বিভাগ করছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। ১১।।

অর্জুন! যিনি যতটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন, আমি তাঁকে সেই ভাবেই ভজনা করি, ততটুকুই সহযোগিতা করি। সাধকের শ্রদ্ধাই কৃপারূপে তাঁর

উপর বর্ষিত হয়। এই রহস্য উপলব্ধি করে জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে আমার মতানুযায়ী কর্মেরত থাকেন। আমি যেমন আচরণ করি, আমার প্রিয়ভক্তগণও সেই আচরণ করেন। আমি যা করাই, তাই তাঁরা করেন।

ভগবান কিরূপে ভজনা করেন? তিনি রথীর দায়িত্ব নিয়ে নেন, সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন, এটাই তাঁর ভজনা। কলুষসৃষ্টির কারণ নাশ করবার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকেন। যে-যে সদ্গুণের সাহায্যে আমরা সত্যে অনুপ্রবেশ করতে পারি, সেই-সেই সদ্গুণ রক্ষা করবার জন্য তিনি এগিযে আসেন। যতক্ষণ ইষ্টদেব হৃদয় থেকে রথী না হন, এবং প্রতি পদক্ষেপে সাবধান না করেন, ততক্ষণ কোন ভজনাকারীই হাজার চোখবুজে প্রযত্ন করুন, তিনি প্রকৃতির এই দ্বন্দ্ব থেকে পার হতে পারেন না। কি করে বুঝবেন যে, তিনি কতদূর পথ এগিয়েছেন? কতটুকুই বা বাকী? ইষ্টই আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে তাকে পথ দেখান যে, তুমি এখানে এইভাবে কর, এইভাবে চল। এইভাবে প্রকৃতির বাধা বিঘ্ন সরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে দিয়ে স্বরূপে প্রবেশ দিয়ে দেন। ভজন সাধকই করেন, কিন্তু তিনি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হন, সেটা ইষ্টের দান। এইরূপ জেনে সকলেই সর্বতোভাবে আমার অনুসরণ করেন। তাঁরা কিরূপ আচরণ করেন?—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।। ১২।।

সেই পুরুষ এই দেহে কর্মে সাফল্য কামনা করে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। সেই কর্ম কি? শ্রীকৃষ্ণ বললেন— "অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর।" নির্ধারিত কর্ম কি? যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। যজ্ঞ কি? সাধনার বিধি-বিশেষ; যাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণ-অপানের) আহুতি, ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী প্রবাহকে সংযমাগ্নিতে হোম করা হয়। যার পরিণাম পরমাত্মা। কর্মের শুদ্ধ অর্থ হল আরাধনা, যার স্বরূপ বর্তমান অধ্যায়েই পরে স্পষ্ট হবে। এই আরাধনার পরিণাম কি? '**সংসিদ্ধিম্**'- পরমসিদ্ধি পরমাত্মা, '**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**'- শাশ্বত ব্রহ্মে প্রবেশ, পরম নৈষ্কর্ম্যের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন-আমার কথামত চলেন যাঁরা, তাঁরা এই মনুষ্যলোকে কর্মের পরিণাম পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির জন্য অন্যান্য দেবতাকে পূজা করেন অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ বলবতী করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তুমি দেবতাদের বৃদ্ধি কর, দৈবী সম্পদ্ বলবতী কর। যেমন যেমন হৃদয়-রাজ্যে দৈবী সম্পদ্ উন্নত হবে, তেমন তেমন তোমার উন্নতি হবে। এইভাবে পরস্পরকে উন্নত করে পরমশ্রেয় লাভ কর। শেষপর্যন্ত উন্নতি করে যাওয়া এই অন্তঃক্রিয়া। এরই উপর জোর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার আনুকূল্যে যে মনুষ্য কর্মে সিদ্ধি প্রার্থনা করেন, আচরণ করেন দৈবী সম্পদ্ দৃঢ় করেন, যারদ্বারা সেই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি শীঘ্রই লাভ হয়। তিনি অসফল হন না, সফলই হন। শীঘ্রের তাৎপর্য? কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কি এই পরমসিদ্ধি লাভ হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—না, এই সোপানে ওঠার বিধান ক্রমে ক্রমে। কেউ লাফিয়ে ভাবাতীত ধ্যানে পৌঁছে যাবে, এমন চমৎকার হয় না। এই প্রসঙ্গে দেখুন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।। ১৩।।

অর্জুন! '**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**'- চার বর্ণের রচনা আমি করেছি। তাহলে কি মানুষকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন- না, '**গুণকর্মবিভাগশঃ**'- গুণের আধারে কর্মকে চারভাগে বিভাগ করেছি। গুণ এখানে মানদণ্ড। তামসিক গুণ সক্রিয় থাকলে আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ, কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়ার স্বভাব, অকর্তব্য জেনেও তার থেকে নিবৃত্ত হতে অক্ষম হবে। এরূপ অবস্থাতে সাধন আরম্ভ হবেই বা কি করে? আপনি এই কর্মের জন্য যদি প্রযত্নশীল হতে চান, ঘন্টা দুই-তিন আরাধনাতেও বসেন, তাহলেও দশ মিনিটের জন্যও কিন্তু একাগ্রচিত্ত হতে পারবেন না। দেহটাকে অবশ্যই বসিয়ে রাখবেন; কিন্তু যে মনকে স্থির হওয়া উচিত, বায়ু তরঙ্গে তা বিক্ষিপ্ত থাকে, কুতর্কের জালে জড়িয়ে থাকে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছেয়ে আসে, তাহলে আপনি বসেন কেন? সময় নষ্ট করেন কেন? এরূপ অবস্থাতে শুধু '**পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।**', যিনি অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত, অবিনাশী তত্ত্বে স্থিত, তাঁর এবং এই পথে অগ্রসর নিজের থেকে উন্নত সাধকের সেবা করুন। এই সেবাদ্বারা দূষিত সংস্কার শান্ত হবে এবং যে সংস্কার এই সাধনায় এগিয়ে দেবে, তা সবল হতে শুরু করবে।

তামসিক গুণ ক্রমশঃ ম্লান হয়ে এলে রাজসিক গুণের প্রাধান্য ও সাত্ত্বিক গুণের স্বল্প সঞ্চারের সঙ্গে সাধকের ক্ষমতা বৈশ্য শ্রেণীর হয়। সেই সময় ঐ সাধক

ইন্দ্রিয়সংযম এবং আত্মিক সম্পত্তির সংগ্রহ স্বভাবতঃ করে যাবেন। কর্মে তৎপর ঐ সাধকের মধ্যে এইভাবে একদিন সাত্ত্বিকগুণের বাহুল্য ঘটবে, রাজসিক গুণ হ্রাস হয়ে আসবে, তামসিক গুণ শান্ত হয়ে যাবে। ঐ সময় সাধক ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ করবেন। তখন শৌর্য, কর্মে প্রবৃত্ত থাকবার ক্ষমতা, পশ্চাৎপদ না হওয়ার মনোভাব, প্রত্যেক ভাবের উপর প্রভুত্ব, প্রকৃতির গুণত্রয় ছেদন করবার ক্ষমতা তাঁর স্বভাবের মধ্যে দেখা দেবে। ঐ কর্ম আরও সূক্ষ্ম হলে, সাত্ত্বিক গুণ কার্যরত থাকলে মনে শান্তভাব, ইন্দ্রিয়গুলির দমন, একাগ্রতা, সরলতা, ধ্যান, সমাধি, ঈশ্বরীয় নির্দেশ, আস্তিকতা ইত্যাদি ব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে যে স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলি, সেগুলির বিকাশ হয়। তখন ঐ সাধক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হন। এটা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্মের নিম্নতম সীমা। যখন ঐ সাধক ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, ঐ অন্তিম সীমায় তিনি না ব্রাহ্মণ হন না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য না শূদ্র; কিন্তু অন্যের মার্গদর্শনের সময় তিনিই ব্রাহ্মণ। কর্ম একটাই–নিয়ত কর্ম, আরাধনা। অবস্থাভেদে এই কর্মকেই উঁচু-নীচু চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে। কে বিভাগ করেছেন? যোগেশ্বর বিভাগ করেছেন, অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ বিভাগ করেছেন। সেই অবিনাশী কর্তা আমাকে তুমি অকর্তা বলেই জানবে। কেন?–

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।। ১৪।।

কারণ কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই। কর্মফল কি? শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে, যারদ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়ার নাম কর্ম এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে পরিণামস্বরূপ যা লাভ হয়, সেই জ্ঞানামৃত পান করেন যিনি, তিনি শাশ্বত, সনাতন ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। কর্মের পরিণাম পরমাত্মা, এখন পরমাত্মাকে লাভ করবার ইচ্ছাও বাকী নেই, কারণ এখন তিনি এবং আমি অভিন্ন। আমি অব্যক্ত স্বরূপ, তাঁরই স্থিতিযুক্ত। এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, যার জন্য কর্মের প্রতি স্নেহ রাখব, সেইজন্য কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না এবং এই স্তর থেকে যিনি আমাকে জানেন অর্থাৎ যিনি কর্মের পরিণাম পরমাত্মাকে লাভ করেন, তিনিও কর্মে আবদ্ধ হন না। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনই সেই স্তরের জ্ঞানী মহাপুরুষ।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈ পূর্বতরং কৃতম্।। ১৫।।

অর্জুন! প্রাচীন মুমুক্ষুগণও এই প্রকার জেনেই কর্ম করেছেন। কি জেনে? এই যে, যখন কর্মের পরিণাম পরমাত্মা পৃথক্ থাকেন না, কর্মের পরিণাম পরমাত্মার স্পৃহা সমাপ্ত হলে, ঐ পুরুষ কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ স্থিতিযুক্ত, সেইজন্য তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। সেই স্তর সম্বন্ধে জ্ঞাত হলে, আমরাও কর্মদ্বারা আবদ্ধ হব না। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ, এই সমস্ত স্তরের জ্ঞাতারও সেই-ই রূপ তিনিও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবান', 'মহাত্মা', 'অব্যক্ত', 'যোগেশ্বর', 'মহাযোগেশ্বর' যাই হোন না কেন, সে স্বরূপ সকলের জন্য। এই অনুভব করেই পূর্ব মুমুক্ষুপুরুষগণ, মোক্ষ ইচ্ছুক পুরুষগণ কর্ম আরম্ভ করেছিলেন। সেইজন্য অর্জুন, তুমিও এই কর্ম কর, যা পূর্বপুরুষগণ সর্বদা করে এসেছেন। এটাই কল্যাণের একমাত্র পথ।

এ পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করবার উপর জোর দিয়েছেন; কিন্তু স্পষ্ট বলেননি যে, কর্ম কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কর্মের নাম মাত্র নিয়েছেন। ও বলেছেন-এখন একেই তুমি নিষ্কাম কর্মের বিষয়ে শোন। এর বিশেষত্বের বর্ণনা করেছেন যে, এই কর্ম আমাদের জন্ম-মৃত্যুর মহাভীতি থেকে রক্ষা করে। কর্ম করবার সময় সাবধান হতে বলেছেন, কিন্তু বলছেন না কর্ম কি? তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, জ্ঞানমার্গ ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে। কর্মত্যাগ করলেই কেউ জ্ঞানী হয় না এবং কর্ম আরম্ভ না করে নিষ্কর্মীও হওয়া যায় না। হঠকারিতাবশতঃ যে করে না, সে দাম্ভিক, সেইজন্য মন থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে কর্ম কর। কোন কর্ম? বললেন–নিয়ত কর্ম কর। এখন এই নিয়ত কর্ম কি? তখন বললেন– যজ্ঞের প্রক্রিয়াই নিয়ত কর্ম। এ এক নতুন জিজ্ঞাসা যে, যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্মের আচরণ করা হয়? এখানেও যজ্ঞের উৎপত্তি বিষয়ে বলেছেন, এর বিশেষত্বের বর্ণনা করেছেন; কিন্তু যজ্ঞ কি? তা বললেন না। তাহলে কর্ম কি স্পষ্ট হত এখনও কর্ম কি? স্পষ্ট হয়নি। এখন বলছেন, অর্জুন! কর্ম কি? অকর্ম কি?– এই বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানও মোহিত; তাই তা সুস্পষ্টভাবে জানা উচিত–

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।

তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।। ১৬।।

কর্ম কি? অকর্ম কি?– এই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ পুরুষগণও মোহাচ্ছন্ন। সেই জন্য আমি সেই কর্ম কি? তা তোমাকে স্পষ্টভাবে বলব, যা জেনে তুমি **'অশুভাৎ মোক্ষ্যসে'** অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। কর্মই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই কর্মকে জানবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জোর দিলেন–

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।। ১৭।।

কর্মের ও অকর্মের স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক এবং বিকর্ম অর্থাৎ বিকল্পশূণ্য বিশেষকর্ম, যার আচরণ আপ্তপুরুষগণ করতে সমর্থ হন, তা'ও অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ কর্মের গতি দুর্ভেদ্য। কিছু লোক বিকর্মের অর্থ 'নিষিদ্ধ কর্ম', 'মনোযোগ সহকারে যে' কর্ম করা হয় ইত্যাদি মনে করেন। বস্তুতঃ এখানে 'বি' উপসর্গ বিশিষ্টতার দ্যোতক। প্রাপ্তির পর প্রত্যেক মহাপুরুষের কর্ম বিকল্পশূণ্য হয়। আত্মস্থিত, আত্মতৃপ্ত, আপ্তকাম মহাপুরুষগণ কর্মে প্রবৃত্ত থাকলে না কোন লাভ হয় এবং কর্মত্যাগ করলে না কোন লোকসান হয়, তবুও অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। এরূপ কর্ম বিকল্পশূণ্য হয়, বিশুদ্ধ হয় এবং এই কর্মকেই বিকর্ম বলা হয়।

উদাহরণের জন্য গীতায় যেখানে যেখানে 'বি' উপসর্গের প্রয়োগ হয়েছে সেটা তার বিশেষত্বের দ্যোতক, নিকৃষ্টতার নয়। যেমন- **'যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।' (গীতা, ৫/৭)** যিনি যোগযুক্ত, তিনি বিশেষরূপে শুদ্ধ আত্মাযুক্ত, বিশেষরূপে জয়ী অংতঃকরণযুক্ত ইত্যাদি বিশিষ্টতার দ্যোতকস্বরূপ। এই প্রকারে গীতায় মাঝে মাঝে 'বি'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে, যা বিশেষরূপে পূর্ণের দ্যোতকস্বরূপ। এইপ্রকার 'বিকর্ম'ও বিশিষ্ট কর্মের দ্যোতকস্বরূপ, যা প্রাপ্তির পর মহাপুরুষগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যা' শুভাশুভ সংস্কারের সৃষ্টি করে না।

বিকর্ম কাকে বলে আপনি দেখলেন, বাকী রইল কর্ম এবং অকর্ম, যা পরের শ্লোকে বুঝবার চেষ্টা করুন। যদি এখানে কর্ম-অকর্মের পার্থক্য বুঝতে না পারেন, তাহলে কখনও বুঝতে পারবেন না।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।। ১৮।।

যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, কর্মের অর্থ আরাধনা অর্থাৎ আরাধনা করেও নিজেকে কর্তা বলে অনুভব করেন না, বরং গুণত্রয়ই আমাকে চিন্তনে নিযুক্ত করে, 'আমি ইষ্টদ্বারা সঞ্চালিত'- এরূপ অনুভব করেন এবং যখন এই প্রকার অকর্ম দেখার ক্ষমতা এসে যায় এবং নিরন্তর কর্ম হতে থাকে, তখনই বুঝতে হবে যে, ঠিক পথে কর্ম হচ্ছে। তিনিই বুদ্ধিমান, মানুষের মধ্যে তিনিই যোগী, যোগযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ কর্মের কর্তা। তাঁর কর্মে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না।

সারাংশতঃ অতএব এই আরাধনাই কর্ম। সেই কর্ম করুন এবং করবার সময় অকর্তাভাব নিয়ে করুন যে, আমি তো যন্ত্রমাত্র, করাচ্ছেন ইষ্ট এবং আমি গুণজাত অবস্থা অনুসারে চেষ্টা করে যাচ্ছি মাত্র।– যখন অকর্ম দেখবার ক্ষমতা আসে, তখন নিরন্তর কর্ম হতে থাকে, তখনই পরমকল্যাণের স্থিতি প্রদানকারী কর্ম করা সম্ভব। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন যে– "যতক্ষণ ইষ্ট রথী না হন, আদেশ-নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ সাধনার ঠিক-ঠিক আরম্ভ হয় না।" এর পূর্বে যা কিছু করা হয় তা কর্মে প্রবেশের প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। লাঙ্গলের সব ভার গরুর কাঁধের উপরই থাকে, তবুও খেতের চাষ চাষীর কৃতিত্ব, ঠিক এইরূপ সাধনের সব ভার সাধকের উপরই থাকে, কিন্তু বাস্তবিক সাধক ইষ্ট, যিনি সঙ্গে থেকে পথপ্রদর্শন করেন। ইষ্টের ইঙ্গিত ব্যতীত আপনি বুঝতেই পারবেন না যে, আপনি কতদূর এগিয়েছেন? প্রকৃতিতে ভ্রান্ত অথবা পরমাত্মার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকার ইষ্টের নির্দেশে যে সাধক এই আত্মিক পথে অগ্রসর হন, নিজেকে অকর্তা ভেবে নিরন্তর কর্ম করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যোগী। প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, কর্ম কি সর্বদা করতে হবে অথবা কখনও সম্পূর্ণও হবে? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বললেন–

শ্রীকৃষ্ণের মত অনুসারে যা' কিছু করা হয়, তা' কর্ম নয়। নির্ধারিত ক্রিয়াই কর্ম। '**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং**'- অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কি? বললেন, '**যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**।'- যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়াই কর্ম। তাহলে এছাড়া যা' কিছু করা হয়, সে সমস্ত কি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন- '**অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**'- এই যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়া ছাড়া যা' কিছু করা হয়, তা এই লোকেরই বন্ধন, কর্ম নয়। '**তদর্থং কর্ম**'- অর্জুন! যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার জন্য উত্তমরূপে আচরণ কর। এবং যজ্ঞের স্বরূপ বললেন, যা হ'ল শুদ্ধরূপে আরাধনার এক বিধি-বিশেষ, যা আরাধ্যদেবপর্যন্ত পৌঁছিয়ে, তাঁতেই বিলীন করে দেয়।

এই যজ্ঞে ইন্দ্রিয়ের দমন, মনের শমন, দৈবী সম্পদ্ লাভ ইত্যাদি বলে শেষে বললেন—বহু যোগী প্রাণ এবং অপানের গতি নিরুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। এরূপ অবস্থাতে অন্তরে কোন সঙ্কল্প জাগে না, বাইরের জগতের ঘটনা মনে রেখাপাত করতে পারে না। এইরূপ স্থিতিতে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করে সেই নিরুদ্ধ চিত্তের বিলয়কালে সেই পুরুষ **'যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'**- শাশ্বত, সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ পান। এই সমস্তই যজ্ঞ, যাকে কার্যরূপ দেওয়ার নাম কর্ম। কর্মের শুদ্ধরূপ 'আরাধনা', কর্মের অর্থ 'ভজন', কর্মের অর্থ যোগসাধনাকে উত্তমরূপে সম্পাদিত করা, যার বিশদ বর্ণনা বর্তমান অধ্যায়েই পরে করা হবে। এখানে কর্ম ও অকর্মে পার্থক্য করা হয়েছে, যাতে কর্ম করবার সময় তার সঠিক দিক্-নির্ধারণ হয় এবং তাতে চলা যেতে পারে।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।। ১৯।।

অর্জুন! **'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ'**- যিনি সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া আরম্ভ করেছেন (যা পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, অকর্ম কি তা দেখবার ক্ষমতা এলে কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ সম্পূর্ণ কর্মের কর্তা হন, যাতে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না।) **'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ'**- ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে যখন এতটা সূক্ষ্ম হয় যে বাসনা এবং মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের ঊর্ধ্বে উঠে যায় (কামনা এবং সঙ্কল্পের নিরুদ্ধ হওয়াই মনের জয়ী অবস্থা। অতএব কর্ম এই মনকে কামনা এবং সঙ্কল্প-বিকল্পের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়) সেই সময় **'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্'**- অন্তিম সঙ্কল্প শান্ত হওয়ার পর, যাঁকে জানি না, জানবার ইচ্ছুক ছিলাম, সেই পরমাত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ক্রিয়াত্মক পথে চলে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে জানা 'জ্ঞান'। সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গেই **'দগ্ধকর্মাণম্'**- কর্ম সর্বদার জন্য ভস্মীভূত হয়। যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যখন তাঁকে লাভ করেছি, এঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, তখন কর্ম করে কার খোঁজ করা হবে? তাঁকে জানবার পর কর্মের প্রয়োজন হয় না। এরূপ স্থিতি যাঁদের, তাঁদেরই বোধস্বরূপ মহাপুরুষগণ পণ্ডিত বলেছেন। তাঁদের জ্ঞান পূর্ণ। এরূপ স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ করেন কি? কি ভাবে অবস্থান করেন? তাঁর অবস্থিতির উপর আলোকপাত করলেন—

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ।। ২০।।

অর্জুন! সেই পুরুষ সাংসারিক আশ্রয় থেকে মুক্ত, নিত্যবস্তু পরমাত্মাতেই তৃপ্ত, কর্মের ফল পরমাত্মার আসক্তিও ত্যাগ করে (কারণ এখন পরমাত্মা অভিন্ন) উত্তমরূপে কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও কিছু করেন না।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।

যিনি দেহ এবং অন্তঃকরণ জয় করেছেন, সকল ভোগসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, এরূপ আশামুক্ত পুরুষের দেহ কর্ম করছে দেখা যায় মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কিছুই করেন না, এইজন্য তাঁর পাপ হয় না। তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেছেন, সেইজন্য তাঁকে গমনাগমন করতে হয় না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।। ২২।।

বিনা চেষ্টাতে যা কিছু লাভ হয় তাতেই সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বগুলির অতীত, '**বিমৎসরঃ**'- ঈর্ষামুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বভাবযুক্ত পুরুষ কর্ম করলেও সেই কর্মে আবদ্ধ হন না। সিদ্ধি অর্থাৎ যাঁকে লাভ করবার ছিল, তিনি যখন অভিন্ন এবং আর কখনও পৃথকও হবে না, সেইজন্য অসিদ্ধিরও ভয় নেই। এই প্রকার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবযুক্ত পুরুষ কর্ম করেও আবদ্ধ হন না। তিনি কোন কর্ম করেন? সেই নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। পুনরায় একেই বলছেন–

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।। ২৩।।

অর্জুন! '**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম**'- যজ্ঞের আচরণই কর্ম এবং সাক্ষাৎকারকেই জ্ঞান বলে। এই যজ্ঞের আচরণ করে সাক্ষাৎকারের পর জ্ঞানে স্থিত, সঙ্গদোষ এবং আসক্তিমুক্ত মুক্তপুরুষের সমস্ত কর্ম উত্তমরূপে বিলীন হয়। সেই কর্মের কোন পরিণাম নেই, কারণ কর্মের ফল পরমাত্মা ও তিনি এখন অভিন্ন। ফলে আর কি ফল হবে? সেইজন্য ঐ মুক্ত পুরুষগণের নিজের জন্য কর্মের প্রয়োজন হয় না। তবুও

লোকসংগ্রহের জন্য তাঁরা কর্ম করেন এবং কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও তাঁরা কর্মে লিপ্ত হন না। কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না, কেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। ২৪।।

এরূপ মুক্তপুরুষের সমর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নিও 'ব্রহ্ম'ই অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ কর্তাদ্বারা যা আহুতি দেওয়া হয় তা' ব্রহ্ম। '**ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা**'- যাঁর কর্ম ব্রহ্মের স্পর্শ করে সমাধিস্থ, তাঁতে বিলীন হয়ে গেছে, এরূপ মহাপুরুষের জন্য লাভের যোগ্য ব্রহ্মই। তিনি কিছু করেন না, লোক-সংগ্রহার্থ কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন।

এ সমস্তই প্রাপ্তিযুক্ত মহাপুরুষের লক্ষণ; কিন্তু কর্মে প্রবেশ করেছেন যে প্রারম্ভিক সাধক, তিনি কোন যজ্ঞ করেন?

পূর্বের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- অর্জুন! কর্ম কর। কোন্ কর্ম? বললেন– '**নিয়তং কুরু কর্ম**'- নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কোন্‌টি? বললেন– '**যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**।' (৩/৯)- অর্জুন! যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এই যজ্ঞের অতিরিক্ত যা কিছু কার্য করা হয়, তা' এই লোকেরই বন্ধন, কর্ম নয়। কর্ম সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। অতএব '**তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর**।'- যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার জন্য সঙ্গদোষ থেকে তফাতে অবস্থান করে উত্তমরূপে যজ্ঞের আচরণ কর। এখানে এক নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন যে, সেই যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্ম সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে? তিনি কর্মের বিশেষত্বের উপর জোর দিলেন, বললেন যজ্ঞের উৎপত্তি হল কোত্থেকে? যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি? বৈশিষ্টের বর্ণনা করেছেন; কিন্তু যজ্ঞ কি? তা এখনও বললেন না।

এখন সেই যজ্ঞকেই এখানে স্পষ্ট করছেন–

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।। ২৫।।

আগের শ্লোকটিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মস্থিত মহাপুরুষের যজ্ঞের নিরুপণ করেছেন; কিন্তু অন্যযোগীগণ, যাঁরা এখনও সেই তত্ত্বে স্থিত হননি, ক্রিয়াতে

প্রবেশ করবেন, তাঁরা কোত্থেকে আরম্ভ করবেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, অন্যযোগীগণ **'দৈবং যজ্ঞম্'** অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ হৃদয়ে সংগ্রহ করেন, যা' করবার নির্দেশ ব্রহ্মা দিয়েছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে উন্নত কর। যেমন যেমন হৃদয়ক্ষেত্রে দৈবী সম্পদ্ অর্জন হবে, তেমন তেমন প্রগতি হবে এবং ক্রমশঃ পরস্পর উন্নতি করে পরমশ্রেয় লাভ কর। দৈবী সম্পদ্ হৃদয় ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা প্রাথমিক শ্রেণীর যোগীদের যজ্ঞ।

ঐ দৈবী সম্পদের, ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা' আছে সকলের মধ্যে, কেবল মহত্বপূর্ণ কর্তব্য মনে করে সেগুলিকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, তা'তে লিপ্ত হতে হবে। এগুলিকেই ইঙ্গিত করে যোগেশ্বর বলছেন- অর্জুন! তুমি শোক করো না, কারণ তোমার মধ্যে দৈবী সম্পদের সমাবেশ হয়েছে, তুমি আমাতে নিবাস করবে, আমার শাশ্বত স্বরূপ লাভ করবে। এই দৈবী সম্পদ্ পরমকল্যাণকর এবং এর বিপরীত আসুরী সম্পদ্ নীচ এবং অধম যোনির কারণ। আসুরী সম্পদের আহুতি দেওয়া হয়, সেই জন্য এর নাম যজ্ঞ এবং এখান থেকেই এই যজ্ঞ আরম্ভ হয়।

অন্যযোগীগণ **'ব্রহ্মাগ্নৌ'**- পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলছেন যে, এই দেহে 'অধিযজ্ঞ' আমি। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ যজ্ঞ যাতে বিলীন হয়, সেই পুরুষ আমি। শ্রীকৃষ্ণ যোগী, সদ্গুরু ছিলেন। এই প্রকার অন্যযোগীগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ সদগুরুকে উদ্দেশ্য করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সারাংশতঃ সদ্গুরুর স্বরূপের ধ্যান করেন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।। ২৬।।

অন্যযোগীগণ শ্রোত্রাদিক (শ্রোত্র, নেত্র, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা) সকল ইন্দ্রিয়ের সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে আকর্ষণ করে সংযত করেন। এখানে আগুন জ্বলে না। আগুনে যেমন প্রত্যেকটি বস্তু ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ সংযম এক প্রকার আগুন, যা' ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী প্রবাহ দগ্ধ করে। আরও অন্যান্য যোগীগণ শব্দাদিক (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ সে সমস্তের অর্থ পরিবর্তন করে সাধনোপযোগী করে নেন।

সাধককে সংসারে থেকেই ভজন করতে হয়। সাংসারিক ব্যক্তিদের ভালমন্দ শব্দ সবই শোনেন। বিষয়োত্তেজক শব্দ শোনামাত্র সাধক সে সবের আশয় বৈরাগ্যে সহায়ক, বৈরাগ্যোত্তেজক ভাবে পরিবর্তিত করে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেন। যেমন একবার অর্জুন চিন্তনে রত ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁর কর্ণকুহরে সঙ্গীত লহরী প্রতিধ্বনিত হল। মাথাতুলে দেখলেন উর্বশী দাঁড়িয়ে, যে বেশ্যা ছিল। সকলেই তার রূপে মুগ্ধ ছিল, কিন্তু অর্জুন তাকে স্নেহদৃষ্টিতে মাতৃবৎ দেখলেন। এইভাবে দেখামাত্র শব্দ ও রূপে বিকৃত করে যে বিকারগুলি, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

এখানে অগ্নি ইন্দ্রিয়। অগ্নিতে যেমন যে কোন বস্তু ভস্মীভূত হয়, সেই প্রকার অর্থ পরিবর্তন করে ইষ্টের অনুকূল করে নিলে বিষয়োত্তেজক রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ভস্ম হয়ে যায়, সাধকের মনে কুপ্রভাব পড়ে না। সাধক এই শব্দগুলিতে রুচি দেখান না, এগুলি গ্রহণ করেন না।

এই শ্লোকগুলিতে 'অপরে', 'অন্যে' শব্দ একজন সাধকেরই উঁচু-নীচু অবস্থা-বিশেষ, যজ্ঞকর্তার উঁচু-নীচু স্তর। 'অপর'- এর তাৎপর্য পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ নয়।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।। ২৭।।

এখনপর্যন্ত যোগেশ্বর যে যজ্ঞের চর্চা করলেন, তাতে ক্রমশঃ দৈবী সম্পদ্ অর্জন করা হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের সমস্ত চেষ্টাগুলিকে সংযত করা হয়, বিষয়োত্তেজক শব্দগুলির প্রবল আঘাতের পরও, সেগুলির অর্থ পরিবর্তন করে তাদের প্রভাব এড়ানো যায়। এর থেকে উন্নত অবস্থাযুক্ত যোগীগণ ইন্দ্রিয়সমূহের সকল চেষ্টা এবং প্রাণের ব্যাপারকে সাক্ষাৎকারের পর জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত পরমাত্ম-স্থিতিরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। যখন সংযমের ক্ষমতা আত্মার সঙ্গে তদ্রূপ হয়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার শান্ত হয়ে যায় সেই সময় বিষয়গুলিকে উদ্দীপ্ত করে যে ধারা এবং ইষ্টে প্রবৃত্তি প্রদান করে যে ধারা, দুটি ধারাই আত্মসাৎ হয়ে যায়। পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ হয়। যজ্ঞের পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়। এই হ'ল যজ্ঞের পরাকাষ্ঠা যে পরমাত্মা লাভের ইচ্ছা ছিল, যখন তাঁতেই স্থিতিলাভ হয়েছে, তখন বাকী রইল কি? পুনরায় যোগেশ্বর যজ্ঞের বিশদ বর্ণনা করলেন—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।। ২৮।।

কেউ কেউ দ্রব্যযজ্ঞ করেন অর্থাৎ আত্মপথে মহাপুরুষের সেবায় পত্র-পুষ্প অর্পণ করেন। তাঁরা সমর্পণের সঙ্গে মহাপুরুষের সেবাতে দ্রব্যদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলছেন যে, ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প, ফল, জল যা কিছু আমাকে অর্পণ করা হয়, তা আমি গ্রহণ করি এবং তারজন্য পরমকল্যাণ সৃজন করি। এটাও যজ্ঞ। প্রত্যেক আত্মার সেবা, ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আত্মপথে নিয়ে আসা দ্রব্যযজ্ঞ। কারণ দ্রব্যযজ্ঞ প্রাকৃতিক সংস্কার ভস্মীভূত করতে সমর্থ।

এই প্রকার অন্য কেউ কেউ '**তপোযজ্ঞাঃ**'- স্বধর্ম পালনে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করেন অর্থাৎ স্বভাবজাত ক্ষমতা অনুসারে যজ্ঞের নিম্ন এবং উন্নত অবস্থাগুলির মাঝে অবস্থান করেন। এই পথে যার জ্ঞান অল্প সে প্রথম শ্রেণীর সাধক শূদ্র পরিচর্যাদ্বারা, বৈশ্য দৈবী সম্পদ্ সংগ্রহদ্বারা, ক্ষত্রিয় কাম-ক্রোধাদির উন্মুলনদ্বারা এবং ব্রাহ্মণ ব্রহ্মে প্রবেশের যোগ্যতার স্তর থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেন। একই পরিশ্রম সকলকেই করতে হয়। বাস্তবে যজ্ঞ একটাই। অবস্থা অনুসারে উঁচু-নীচু শ্রেণী পার হতে থাকে।

'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন- "মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি ও শরীরকে লক্ষ্যের অনুরূপ সংযত করাকেই তপ বলে। এরা লক্ষ্য থেকে দূরে পালাবে, এদের সংযত করে সেই দিকেই নিযুক্ত কর।"

অনেক পুরুষ যোগযজ্ঞের আচরণ করেন। প্রকৃতিতে দিক্‌ভ্রান্ত আত্মার প্রকৃতি থেকে পর পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের নাম 'যোগ'। যোগের পরিভাষা অধ্যায় ৬/২৩-এ দ্রষ্টব্য। সামান্যতঃ দুটি বস্তুর মিলনকে যোগ বলা হয়। কাগজের সঙ্গে কলম, থালা ও টেবিল ঘনিষ্ঠভাবে থাকলে, একে কি যোগ বলা যেতে পারে? না, এ সমস্ত পঞ্চভূতে নির্মিত পদার্থ। একটাই, দুটো নয়। দুই হ'ল প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতিতে স্থিত আত্মা নিজেরই শাশ্বতরূপ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করে, তখন প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়ে যায়, তাকেই যোগ বলে। অতএব অনেক পুরুষ এই মিলনে সহায়ক শম, দম ইত্যাদি নিয়মগুলির উত্তমরূপে আচরণ করেন। যোগ যজ্ঞের কর্তা এবং অহিংসাদি তীক্ষ্ম ব্রতগুলির সঙ্গে সংযুক্ত যত্নশীল পুরুষ '**স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ**'- নিজের

অধ্যয়ন, স্ব-রূপের অধ্যয়ন করেন তিনিই জ্ঞানযজ্ঞের কর্তা। এখানে যোগের অঙ্গগুলি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি) কে অহিংসাদি তীক্ষ্ণব্রতগুলি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনেকেই স্বাধ্যায় করেন। বই পড়া স্বাধ্যায়ের আরম্ভিক স্তর। বিশুদ্ধ স্বাধ্যায় হল নিজের অধ্যয়ন, যার ফলে স্বরূপের উপলব্ধি হয়, যার পরিণাম জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার।

যজ্ঞের পরবর্তী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলছেন—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।। ২৯।।

বহু যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন এবং এই প্রকার কোন কোন যোগী প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন। এর থেকে সুক্ষ্ম অবস্থা হলে অন্য যোগীগণ প্রাণ এবং অপান উভয়ের গতিরুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান।

যাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-অপান বলছেন, তাকেই মহাত্মা বুদ্ধ 'অনাপান' বলেছেন। একেই তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস বলেছেন। প্রাণ সেই শ্বাসকে বলে, যা আপনি গ্রহণ করেন এবং অপান সেই শ্বাসকে বলে, যা' ত্যাগ করেন। যোগীগণ অনুভব করেছেন যে, আপনি শ্বাসের সঙ্গে বাহ্য বায়ুমণ্ডলের সঙ্কল্পও গ্রহণ করেন এবং প্রশ্বাসে আন্তরিক ভাল-মন্দ চিন্তনের তরঙ্গ ত্যাগ করেন। বাহ্য কোন সঙ্কল্প গ্রহণ না করা প্রাণের আহুতি এবং অন্তরে সঙ্কল্প জাগ্রত না হতে দেওয়াকে অপানের আহুতি বলে। অন্তরে সঙ্কল্পের স্ফুরণ যেন না হয় এবং বাহ্য জগতের কোন চিন্তন অন্তরে যাতে ক্ষোভ উৎপন্ন না করতে পারে। এই প্রকার প্রাণ এবং অপান উভয়ের গতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হলে, প্রাণের আয়াম অর্থাৎ নিরুদ্ধ হয়, একেই প্রাণায়াম বলা হয়। এই হল মনকে জয় করা। প্রাণের গতি রুদ্ধ করা এবং মনের গতি রুদ্ধ করা একই কথা।

প্রত্যেক মহাপুরুষ এই প্রকরণটি নিয়েছেন। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে- **'চত্বারি বাক্ পারমিতা পদানি'- (ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৫, অথর্ববেদ ৯/১৫/২৭)** এ বিষয়ে 'পূজ্যমহারাজজী' বলতেন-"হো! একটা নামকেই চারটি শ্রেণীতে জপ করা হয়-যেমন বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী এবং পরা। **বৈখরী** অর্থাৎ যা' ব্যক্ত হয়, নামের উচ্চারণ এতে এমনভাবে হয় যে, জপকর্তা ছাড়াও আশে-পাশে কেউ থাকলে তিনিও শুনতে পাবেন। **মধ্যমা** অর্থাৎ মধ্যম স্বরে জপ, জপকর্তা ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবেন

না। এই উচ্চারণ কণ্ঠ থেকে উদ্ভুত হয়, ধীরে ধীরে নামের একতানের সাহায্যে তন্ময়তা চলে আসে। সাধনা আরও সূক্ষ্ম হবার পর- **পশ্যন্তী** অর্থাৎ নাম দেখবার ক্ষমতা চলে আসে, এই অবস্থাতে আর জপ করতে হয় না। নাম শ্বাস-এ নিরন্তর হতে থাকে। এইস্তরে মনকে দ্রষ্টারূপে স্থির করে দেখতে হয় যে, শ্বাস কি বলতে চাইছে? কখন গ্রহণ করা হয়? কখন ত্যাগ করা হয়? শ্বাস কি বলে? মহাপুরুষগণ বলেন এই শ্বাস 'নাম' ছাড়া কিছুই বলে না। এই স্তরে সাধক নাম-জপ করেন না, কেবল উচ্চারিত ধ্বনি শোনেন, শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সেইজন্য এই স্তরকে 'পশ্যন্তী' বলে।

'পশ্যন্তী' স্তরে মনকে দ্রষ্টারূপ লক্ষ্য রাখতে হয়; কিন্তু সাধন আরও উন্নত হলে শোনারও প্রয়োজন হয় না। জপ আরম্ভ করলে স্বতঃই শোনা যায়। **'জপৈ ন জপাবৈ, অপনৈ সে আবৈ।'**- স্বয়ং জপ করবার দরকার হয় না, না মনকেই বাধ্য করা হয়, কিন্তু জপ অনবরত হতে থাকে, একেই অজপা বলে। এমন নয় যে জপ আরম্ভ না করেই অজপা স্থিতিলাভ হয়। যদি কেউ জপ আরম্ভই করেনি, তাহলে তার কাছে অজপা বলে কিছু থাকে না। অজপার অর্থ এই যে, জপ না করা সত্ত্বেও জপ অনবরত হতে থাকে। একবার শ্বাসে জপ আরম্ভ করলেই, তা' প্রবাহিত হয় এবং নিরন্তর হয়। এই স্বাভাবিক জপকে বলে **অজপা** এবং এই হল 'পরাবাণী'র জপ। এই জপ প্রকৃতির উর্ধ্বের তত্ত্ব পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে। এর পর বাণীতে আর কোন পরিবর্তন হয় না। পরম-এর দিগ্দর্শন করে তাতেই বিলীন হয়ে যায়, সেইজন্য একে 'পরা' বলা হয়।

প্রস্তুত শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কেবল শ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখতে বললেন, যদিও আগামী অধ্যায়ে (৮/১৩) তিনি ওঁ জপের উপর জোর দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধও 'অনাপান সতী'তে শ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণ-অপান)- এরই চর্চা করেছেন। তাহলে সেই মহাপুরুষ বলতে কি চাইছেন? বস্তুতঃ শুরুতে বৈখরী, তার থেকে মধ্যমাতে প্রবেশ এবং এর থেকে উন্নত হলে জপের পশ্যন্তী অবস্থাতে শ্বাস ধরা পড়ে। এই সময় জপ শ্বাসে অনবরত হতে থাকে, সেইজন্য জপ করবার প্রয়োজন হয় না, তখন কেবল শ্বাসকে লক্ষ্য করে যেতে হয়। সেই জন্য প্রাণ-অপান শুধু বললেন, 'নাম জপ কর'- এরূপ বলেননি, কারণ বলবার প্রয়োজন নেই। যদি বলেন তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে নিম্ন শ্রেণীগুলিতে ঘোরা ফেরা করতে থাকবে। মহাত্মা বুদ্ধ, 'গুরুদেব

ভগবান্’ এবং প্রত্যেক মহাপুরুষ যাঁরা এই পথ দিয়ে গমন করেছেন, সকলেই একই কথা বলেছেন। বৈখরী এবং মধ্যমা নামজপের প্রবেশ দ্বারমাত্র। পশ্যন্তী স্তর থেকেই নামে প্রবেশ হয়। পরা শ্রেণীতে নাম অনবরত হতে থাকে, জপ বন্ধ হয় না।

এই মন শ্বাসের সঙ্গে জড়িত। যখন শ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখা হয়, শ্বাসে নাম নিরন্তর হতে থাকে, অন্তরে সঙ্কল্প উদয় হয় না এবং বাহ্য বায়ু মণ্ডলের সঙ্কল্প অন্তরে প্রবেশ করে না, এটাই মনজয়ের অবস্থা। এরই সঙ্গে যজ্ঞের পরিণাম দেখা যায়।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।। ৩০।।

অন্য যাঁরা নিয়মিত আহার করেন, তাঁরা প্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেন। ‘পূজ্য মহারাজজী’ বলতেন, “যোগীর আহারে নিয়ন্ত্রণ, আসন দৃঢ় এবং নিদ্রাতে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত।” আহার-বিহারের উপর নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। এরূপ বহু যোগী প্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেন অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণকেই লক্ষ্য করেন, প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখেন না। শ্বাস গ্রহণের সময় ওঁ শোনেন, পুনরায় শ্বাস গ্রহণের সময় ‘ওঁ’ শোনেন। এই প্রকার যজ্ঞদ্বারা যাঁদের সমুদয় পাপ নষ্ট হয়েছে, সেই সকল পুরুষ যজ্ঞের জ্ঞাতা। এই নির্দিষ্ট বিধিগুলির মধ্যে যে কোন একটি বিধির আচরণ করলেও তারার সকলেই যজ্ঞের জ্ঞাতা। এখন যজ্ঞের পরিণাম বলছেন–

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।। ৩১।।

কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! ‘**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো**’- যজ্ঞ যা’ সৃষ্টি করে, শেষে যা’ প্রদান করে, তা হল অমৃত। তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জ্ঞান। সেই জ্ঞানামৃত যিনি পান করেন অর্থাৎ প্রাপ্তকর্তা যোগীগণ ‘**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**’- শাশ্বত, সনাতন পরমব্রহ্মকে লাভ করেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন পরব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করলে কি কোন আপত্তি আছে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যজ্ঞরহিত পুরুষ পুনরায় এই মনুষ্যলোক অর্থাৎ মানবদেহ লাভ করে না, তাহলে অন্যলোকে কি সুখ পাওয়া যাবে? তার জন্য তির্যক্ যোনিসকল সুরক্ষিত, এর বেশী কিছুই নয়। অতএব যজ্ঞ করা নিতান্ত আবশ্যক। যজ্ঞ মানুষ মাত্রের জন্য।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজান্বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।। ৩২।।

এই প্রকার উপর্যুক্ত বহুবিধ যজ্ঞ বেদবাণীতে বিস্তারিত ও ব্রহ্মমুখে ব্যাখাত হয়েছে। প্রাপ্তির পরে মহাপুরুষগণের দেহ পরব্রহ্ম ধারণ করেন। ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন অবস্থাযুক্ত ঐ মহাত্মাগণের বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র হয়ে যায়। তাঁদের মাধ্যমে ব্রহ্মই কথা বলেন। তাঁদের বাণীতে এই যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সমস্ত যজ্ঞকে তুমি '**কর্মজান্ বিদ্ধি**'- কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে। এই কথা পূর্বেও বলেছেন, '**যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ' (৩/১৪)**। সেই সমস্ত এইভাবে ক্রিয়া চলে জানবার পর (এখানে বললেন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যাঁদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরাই যজ্ঞের যথার্থ জ্ঞাতা) অর্জুন! তুমি '**বিমোক্ষ্যসে**'- সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে যোগেশ্বর কর্ম কি, তা' স্পষ্ট করেছেন। সেই ক্রিয়াই কর্ম, যার আচরণ করলে উপর্যুক্ত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

এখন যদি দৈবী সম্পদের অর্জন, সদ্গুরুর ধ্যান, ইন্দ্রিয়গুলির সংযম, নিঃশ্বাসকে (প্রাণকে) প্রশ্বাসে আহুতি, প্রশ্বাসকে (অপানকে) নিঃশ্বাসে আহুতি, প্রাণ-অপানের গতিরোধ, এই সমস্ত কর্ম, কৃষিকর্মে, ব্যবসা-চাকুরী অথবা রাজনীতিতে সম্ভব হয়, তাহলে আপনি করুন। যজ্ঞ এরূপ ক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পরব্রহ্মে প্রবেশ সম্ভব। বাহ্য কোন কার্যদ্বারা পরব্রহ্ম লাভ অসম্ভব।

বস্তুতঃ এ সমস্তই যজ্ঞ চিন্তনের অন্তঃক্রিয়া, আরাধনার চিত্রণ, যাতে আরাধ্যদেব বিদিত হন। যজ্ঞ আরাধ্যদেব পর্যন্ত পৌঁছানোর নির্ধারিত প্রক্রিয়া-বিশেষ। এই যজ্ঞ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণ-অপান), প্রাণায়াম ইত্যাদি যে ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই কার্য-প্রণালীর নাম 'কর্ম'। কর্মের শুদ্ধ অর্থ 'আরাধনা', 'চিন্তন'।

প্রায়ই লোকে বলে যে, সংসারে যা' কিছু করা হয়, সে সমস্তই কর্ম। কামনাশূণ্য হয়ে যা' কিছু করা হবে, তাই নিষ্কাম কর্ম হবে। কেউ বলে বেশী লাভ করবার জন্য বিদেশী বস্ত্রবিক্রি করলে আপনি সকামী। দেশ-সেবার জন্য স্বদেশী বস্ত্রবিক্রি করলে আপনি নিষ্কাম কর্মযোগী। নিষ্ঠাপূর্বক চাকুরী করলে, লাভ-লোকসানের চিন্তা-ত্যাগ করে ব্যবসা করলে আপনি নিষ্কাম কর্মযোগী। জয়-পরাজয়ের চিন্তা না করে যুদ্ধ

করলে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে নিষ্কর্মী, মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায়? বস্তুতঃ এমন কিছুই হয় না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই নিষ্কাম কর্মে নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই- **'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।'** অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। যজ্ঞ কি? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আহুতি, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, যজ্ঞস্বরূপ মহাপুরুষের ধ্যান, প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিরোধ। এই হ'ল মনকে জয় করা। মনের প্রসারই এই জগৎ। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে, **'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।' (৫/১৯)**- যাঁদের মন সমভাবে স্থিত, সেই পুরুষগণ চরাচর জগৎ এখানেই জয় করতে সক্ষম। মনের সমতা এবং জগৎ জয় উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ? যদি জগৎ জয় করা হ'ল, তাহলে বাধা কোথায়? তখন বলছেন, সেই ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, যদি মনও নির্দোষ এবং সমভাব যুক্ত হয়, তাহলে তখন মন ব্রহ্মে স্থিত হয়।

সারাংশতঃ মনের প্রসারই জগৎ। চরাচর জগৎ আহুতির সামগ্রী রূপে বিদ্যমান। মন সর্বথা নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতের নিরোধ হয়ে যায়। মন নিরুদ্ধ হলেই যজ্ঞের পরিণাম বেরিয়ে আসে। যজ্ঞ যে জ্ঞানামৃত সৃষ্টি করে, সেই জ্ঞানামৃত যাঁরা পান করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। এই সকল যজ্ঞের বিবরণ ব্রহ্মস্থিত মহাপুরুষের বাণীদ্বারা বিবৃত হয়েছে। এমন নয় যে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সাধকগণ পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ করেন, বরং এই সমস্ত যজ্ঞই সাধকের উঁচু-নীচু অবস্থামাত্র। এই যজ্ঞ যে উপায়ে অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ার নাম কর্ম। গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও সাংসারিক কার্য-ব্যবসার সমর্থন করে না।

প্রায়ই যজ্ঞ বলতে লোকে এক যজ্ঞবেদী তৈরী করে তিল, যব ইত্যাদি নিয়ে 'স্বাহা' বলে হোম করতে শুরু করেন। কিন্তু এটা ফাঁকিবাজি। দ্রব্যযজ্ঞ অন্য, যা শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবারই বলেছেন। পশুবলি, বস্তু-দাহ ইত্যাদির সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। ৩৩।।

অর্জুন! সাংসারিক দ্রব্যগুলি দ্বারা যে যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, তার থেকে জ্ঞানযজ্ঞ [যার পরিণাম জ্ঞান (সাক্ষাৎকার), যজ্ঞ যার সৃষ্টি করে, সেই অমৃত তত্ত্বকে জানা

জ্ঞান, এরূপ যজ্ঞ।] শ্রেয়স্কর, পরমকল্যাণকর। হে পার্থ! সম্পূর্ণ কর্ম জ্ঞানে শেষ হয়, '**পরিসমাপ্যতে**'- উত্তমরূপে সমাহিত হয়। যজ্ঞের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান। তারপরে কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং কর্মত্যাগ করলে সেই মহাপুরুষের কোন লোকসানও হয় না।

এই প্রকার ভৌতিক দ্রব্যগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞকেও যজ্ঞই বলে, কিন্তু সেই যজ্ঞের তুলনায়, যার পরিণাম সাক্ষাৎকার, সেই জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা অত্যল্প। আপনি কোটি টাকার হোম করুন, শত শত যজ্ঞবেদী তৈরী করুন, সৎপথে দ্রব্যদান করুন, সাধু-সন্ত মহাপুরুষগণের সেবাতে দ্রব্যদান করুন; কিন্তু তা এই জ্ঞান-যজ্ঞ অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প। বস্তুতঃ যজ্ঞ শ্বাস-প্রশ্বাসে (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে) অনুষ্ঠিত হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, মন নিরোধ, এগুলিকেই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ বলেছেন। এই যজ্ঞ কিরূপে লাভ হবে? তার পদ্ধতি কোত্থেকে শেখা হবে? মন্দির, মসজিদ, গিরজাঘরে লাভ হবে অথবা পুস্তকে? তীর্থযাত্রা করলে লাভ হবে অথবা নদীতে অবগাহন করলে লাভ হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– না, লাভ করবার স্রোত একটাই তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ; যেমন–

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। ৩৪।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে উত্তমরূপে প্রণত হয়ে (প্রণাম করে, অহংকার ত্যাগ করে, শরণাগত হয়ে), উত্তমরূপে সেবা করে, নিষ্কপট ভাবে প্রশ্ন করে সেই জ্ঞানলাভ কর। ঐ তত্ত্বের জ্ঞাতা জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান-সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন, সাধনা পথে এগিয়ে দেবেন। আত্মসমর্পণ করে সেবা করবার পরই এই জ্ঞান অনুশীলন করার ক্ষমতা আসে। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দিগ্‌দর্শন করেছেন। তাঁরা যজ্ঞের বিধি-বিশেষের জ্ঞাতা এবং সেই বিধি-বিশেষ আপনাকেও শেখাবেন। অন্য যজ্ঞ হলে জ্ঞানী-তত্ত্বদর্শীর কি দরকার ছিল?

অর্জুন তো ভগবানেরই সম্মুখে ছিলেন, তাহলে তাঁকে ভগবান কেন তত্ত্বদর্শীর কাছে পাঠাচ্ছেন? বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। তাঁর আশয় কেবল এই ছিল যে, আজ তো অর্জুন আমার সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু ভবিষ্যতে অনুরাগীদের যেন কোন ভ্রম উৎপন্ন না হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তো চলে গেছেন, এখন বর্তমানে কার শরণে যাওয়া

যাবে ? সেই জন্য স্পষ্ট করলেন যে, তত্ত্বদর্শীর সান্নিধ্যে যাবে। ঐ জ্ঞানীগণ তোমাকে উপদেশ দেবেন, এবং–

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।। ৩৫।।

সেই জ্ঞানলাভ করলে তুমি আর এই প্রকার মোহমুগ্ধ হবে না। তাঁদের দেওয়া জ্ঞানের দ্বারা, সেই অনুসারে আচরণ করলে তুমি ভূতসমূহকে নিজের আত্মাতে দেখতে পাবে অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে এই আত্মার বিস্তার দেখবে। যখন সর্বত্র একই আত্মার প্রসার দেখবার ক্ষমতা আসবে, তখন তুমি আমাতে একীভূত হবে। অতএব সেই পরমাত্মাকে লাভ করবার সাধন 'তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ'। জ্ঞানের সম্বন্ধে, ধর্ম এবং শ্বাশত সত্যের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে তত্ত্বদর্শীর কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করা বিধেয়।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।। ৩৬।।

সকল পাপী থেকেও যদি তুমি অধিক পাপিষ্ঠ হও, তবুও জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা সকল পাপ থেকে নিঃসন্দেহে উত্তমরূপে উদ্ধার হবে। এর আশয় এই নয় যে, অধিক থেকে অধিক পাপ করে কখনও না কখনও উদ্ধার হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের বলবার অর্থ এই যে, আপনার যেন ভ্রম উৎপন্ন না হয়, যে "আমি তো খুব পাপী, আমার উদ্ধার হবে না"– এরূপ মনে করবেন না যেন, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহ এবং আশ্বাস দিচ্ছেন যে, সকল পাপীর পাপসমূহ থেকেও বেশী পাপ করে থাকলেও, তত্ত্বদর্শীগণ দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা তুমি নিঃসন্দেহে সমুদয় পাপরাশি উত্তমরূপে পার করবে। কিরূপে–

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে তথা।। ৩৭।।

অর্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করে। এটা জ্ঞানের প্রবেশিকা নয়, যেখান থেকে যজ্ঞে প্রবেশ পাওয়া যায় বরং এই জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের পরাকাষ্ঠার চিত্রণ, যাতে

আগে বিজাতীয় কর্ম ভস্ম হয় এবং পরে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তন কর্ম তাতেই বিলয় হয়। যাঁকে লাভ করা উদ্দেশ্য ছিল, যখন তাঁকে লাভ করেছি, তখন চিন্তনদ্বারা কার খোঁজ করব? এরূপ সাক্ষাৎকার যাঁর হয়েছে, সেই জ্ঞানী সমস্ত শুভাশুভ কর্মের অন্ত করে নেন। সেই সাক্ষাৎকার হবে কোথায়? বাইরে হবে অথবা ভিতরে? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। ৩৮।।

জ্ঞানের সমান পবিত্র এই সংসারে আর কিছু নেই। সেই জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) তুমি স্বয়ং (অন্য কেউ নয়) যোগের পরিপক্ক অবস্থায় (আরম্ভে নয়) নিজের আত্মার অন্তর্গত হৃদয়-ক্ষেত্রেই অনুভব করবে, বাইরে নয়। এই জ্ঞানের জন্য কোন্ যোগ্যতার প্রয়োজন? যোগেশ্বরেরই বাণীতে–

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৩৯।।

শ্রদ্ধাবান্, তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই জ্ঞানলাভ করতে পারেন। ভাবপূর্বক জিজ্ঞাসা না হলে, তো তত্ত্বদর্শীর শরণাগত হলেও জ্ঞানলাভ হয় না। কেবল শ্রদ্ধা পর্যাপ্ত নয়। শ্রদ্ধাবান্ শিথিল প্রযত্নশীল হতে পারেন। অতএব মহাপুরুষদ্বারা নির্দিষ্ট পথে তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার নিষ্ঠা আবশ্যক। এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম অনিবার্য। যে বাসনা থেকে বিরত নয়, তার জন্য সাক্ষাৎকার (জ্ঞানপ্রাপ্তি) কঠিন। কেবল শ্রদ্ধাবান্, আচরণেরত সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ করে তিনি তৎক্ষণাৎ পরমশান্তি লাভ করেন। তারপর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। এটাই অন্তিম শান্তি। এর পর কখনও তিনি আর অশান্ত হন না। এবং যেখানে শ্রদ্ধা নেই–

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।। ৪০।।

অজ্ঞানী– যজ্ঞের বিধি-বিশেষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি এই পরমার্থ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়। এদের মধ্যেও সংশয়যুক্ত ব্যক্তির জন্য সুখ,

পুনরায় মনুষ্যদেহ বা পরমাত্মা কিছুই নেই। অতএব তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কাছে প্রশ্ন করে এই পথের সংশয়গুলির নিবারণ করে নেওয়া উচিত, অন্যথা তারা দুর্লভ অবস্থার পরিচয় কখনও পাবে না। তাহলে কে লাভ করেন?–

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।। ৪১।।

যাঁর কর্ম যোগদ্বারা ভগবানে সমাহিত, যাঁর সম্পূর্ণ সংশয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে নষ্ট হয়ে গেছে, পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত এরূপ পুরুষকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না। যোগের আচরণদ্বারাই কর্মগুলি শান্ত হয়। জ্ঞানলাভের পরই সংশয় নষ্ট হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। ৪২।।

সেইজন্য ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যোগে স্থিত হও এবং অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থিত নিজের এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারিদ্বারা ছেদন কর এবং যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। সাক্ষাৎকারে বাধক সংশয় শত্রু যখন মনের ভিতরে, তখন বাইরে কেউ কারও সঙ্গে কেন যুদ্ধ করবে? বস্তুতঃ যখন আপনি চিন্তন পথে এগিয়ে যান, তখন সংশয়জাত বাহ্য প্রবৃত্তিগুলি বাধারূপে উপস্থিত হয় এবং শত্রুরূপে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে। সংযমের সঙ্গে যজ্ঞের বিধি-বিশেষের আচরণ করে এই বিকারগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়াই যুদ্ধ, যার পরিণাম পরমশান্তি। এই হল শাশ্বত বিজয়, এর পরে আর পরাজয় নেই।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, এই যোগসম্বন্ধে আগে আমি সূর্যকে বলেছি, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছেন এবং রাজর্ষিগণ জেনেছেন। অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত অথবা আমি বলেছি। মহাপুরুষও অব্যক্ত স্বরূপযুক্ত। দেহটা তাঁদের জন্য নিবাসস্থান মাত্র। এরূপ মহাপুরুষের বাণীতে পরমাত্মাই কথা বলেন। এইরূপ মহাপুরুষ থেকে যোগক্রিয়া সূর্যের আলোকরশ্মির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। সেই পরম প্রকাশরূপের প্রসার শ্বাসের অন্তরালে হয়, সেইজন্য সূর্যকে বলেছি।

শ্বাসে সঞ্চারিত সেগুলির সংস্কাররূপে উদয় হয়। শ্বাসে সঞ্চিত হলে, উপযুক্ত কালে সে সমস্ত সংকল্পরূপে উৎপন্ন হয়। তার মহত্ব অবগত হলেই, সেই বাক্যের প্রতি কামনা জন্মায় এবং যোগ কার্যরূপ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে এই যোগ ঋদ্ধি-সিদ্ধির রাজর্ষিত্ব শ্রেণীপর্যন্ত পৌঁছলেই নষ্ট হওয়ার স্থিতিতে এসে পৌঁছায়; কিন্তু যে প্রিয়ভক্ত, অনন্য সখা তাকে মহাপুরুষই রক্ষা করেন।

অর্জুনের জিজ্ঞাসার পর যে, আপনার জন্ম তো এখন হয়েছে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে অব্যক্ত, অবিনাশী, অজন্মা এবং সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার পর আত্মমায়া, যোগপ্রক্রিয়াদ্বারা নিজের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আবির্ভূত হই। আবির্ভূত হয়ে কি করেন? সাধ্য বস্তুগুলিকে পরিত্রাণ করবার জন্য এবং যার মাধ্যমে দূষিত, তার বিনাশ করতে এবং পরমধর্ম পরমাত্মাকে স্থির করবার জন্য আমি আরম্ভ থেকে পূর্তিকালপর্যন্ত জন্ম নিতে থাকি। আমার সেই জন্ম এবং কর্ম দিব্য, যা' কেবল তত্ত্বদর্শীই জানতে পারেন। কলিযুগের অবস্থা থেকেই ভগবানের আবির্ভাব হয় (বাস্তবিক নিষ্ঠা থাকলে তা' হয়।); কিন্তু প্রারম্ভিক সাধক, ভগবান বলছেন অথবা এমনিই কোন সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে, তা বুঝতে পারে না। আকাশ থেকেই বা কে কথা বলেন? 'মহারাজজী' বলতেন, যখন ভগবান কৃপা করেন, রথী হয়ে যান, তখন স্তম্ভ থেকে, বৃক্ষ থেকে, পাতা থেকে, শূণ্য থেকে, সর্বত্র থেকে কথা বলেন, সামলান। উত্থান হতে হতে যখন পরমতত্ত্ব পরমাত্মা বিদিত হন, তখন স্পর্শের সঙ্গেই তাঁকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সেইজন্য অর্জুন! আমার ঐ স্বরূপ তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন এবং আমাকে জানবার পর তাঁরা আমাতেই বিলীন হয়ে গেছেন, যে স্থান থেকে আর গমনাগমন করতে হয় না।

এই প্রকার তিনি ভগবানের আবির্ভাবের বিধি বললেন যে, সেই আবির্ভাব কোন কোন অনুরাগীর হৃদয়েই হয়, বাইরের জগতে আবির্ভাব ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। এই স্তর থেকে যিনি জানেন, তাঁকেও কর্ম আবদ্ধ করে না। এইরূপ বিবেচনা করেই মুমুক্ষু পুরুষগণ কর্মের আরম্ভ করেছিলেন। সেই সমস্ত স্তর সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি সেইরূপ হন, যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, এই উপলব্ধি নিশ্চিত হবেই। যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন। যজ্ঞের পরিণাম পরমতত্ত্ব পরমশান্তি বললেন। এই জ্ঞান

কোথায় লাভ হবে?– এই প্রসঙ্গে কোন তত্ত্বদর্শীর কাছে গিয়ে সেই বিধি-বিশেষের আচরণ করতে বলেছেন, যাতে সেই মহাপুরুষ তাঁর প্রতি অনুকূল হন।

যোগেশ্বর স্পষ্ট বলছেন যে, সেই জ্ঞান তুমি স্বয়ং আচরণ করে লাভ করবে, অন্য কেউ আচরণ করলে তাতে তোমার কোন লাভ হবে না। তা'ও যোগের সিদ্ধিকালে লাভ হবে, আরম্ভে নয়। সেই জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) হৃদয়-দেশে লাভ হবে, বাইরে নয়। শ্রদ্ধালু, তৎপর সংযত ইন্দ্রিয় এবং সংশয়রহিত পুরুষই এই জ্ঞানলাভ করেন। অতএব হৃদয়স্থিত সংশয়কে বৈরাগ্যের তরবারিদ্বারা ছেদন কর। এটা হৃদয়-দেশের যুদ্ধ। বাহ্য যুদ্ধের সঙ্গে গীতোক্ত যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই।

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যরূপে যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন ও বলেছেন, যে প্রক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, সেই কার্যপ্রণালীর নাম কর্ম। বর্তমান অধ্যায়ে উত্তমরূপে কর্ম-সম্বন্ধে বলেছেন, অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'যজ্ঞকর্মস্পষ্টীকরণম্' নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

এইরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'যজ্ঞকর্ম স্পষ্টীকরণ' নামক চতুর্থ অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'যজ্ঞকর্মস্পষ্টীকরণম্' নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'যজ্ঞকর্ম স্পষ্টীকরণ' নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভগবন্! যদি জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে আপনি কেন আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মে নিযুক্ত করছেন? নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ অর্জুনের সরল বলে মনে হয়েছিল; কারণ জ্ঞানযোগে পরাজয় হলে দেবত্ব লাভ হয় এবং জয়ে মহামহিম স্থিতি- উভয় অবস্থাতেই মনে হয়েছিল লাভ। কিন্তু এখন অর্জুন উত্তমরূপে অবগত হয়েছেন যে, উভয়মার্গেই কর্ম করতে হবে। (যোগেশ্বর তাঁকে সংশয়শূণ্য হয়ে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিলেন; কারণ জ্ঞানলাভের স্রোত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ।) অতএব উভয় পথের মধ্যে থেকে একটি নির্বাচনের পূর্বে তিনি নিবেদন করলেন—

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১।।

হে কৃষ্ণ! আপনি কখনও সন্ন্যাস অবলম্বন করে যে কর্ম করা হয় সেই কর্মের এবং কখনও নিষ্কাম দৃষ্টিদ্বারা যে কর্ম করা হয় সেই কর্মের প্রশংসা করছেন। উভয়ের মধ্যে আপনি যেটি উত্তমরূপে নির্দিষ্ট করেছেন, যেটি পরমকল্যাণকর তা আমাকে বলুন। দুটি পথ যদি একই জায়গায় পৌঁছোয়তাহলে আপনি সুবিধাজনক পথ কোনটি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন। যদি না করেন, তাহলে জানতে হবে যে, আপনি যাবেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎকর্মযোগো বিশিষ্যতে।।২।।

অর্জুন! সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক যে কর্ম করা হয় অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে যে কর্ম করা হয় এবং **'কর্মযোগঃ'**- নিষ্কামভাবে যে কর্ম করা হয়, উভয়ই পরমশ্রেয় প্রদান করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সন্ন্যাস অথবা জ্ঞানদৃষ্টি প্রসূত কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। এখন প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, শ্রেষ্ঠ কিরূপে?

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎপ্রমুচ্যতে।। ৩।।

মহাবাহু অর্জুন! যিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না, কিছুই আকাঙ্খা করেন না, তাঁকে সর্বদা সন্ন্যাসী বলে জানবে। তিনি জ্ঞানমার্গী অথবা নিষ্কাম কর্মযোগীই হোন না কেন। রাগ, দ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন সেই পুরুষ ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।। ৪।।

এই পথে যাদের জ্ঞান এখন অত্যল্প তারা নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়কেই ভিন্নভিন্ন মনে করেন; কিন্তু পূর্ণজ্ঞাতা পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করেন না; কারণ উভয়ের মধ্যে একটিতেও উত্তমরূপে স্থিত পুরুষ উভয়ের ফলরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। উভয়ের ফল এক, সেইজন্য উভয়ই সমতুল বলে বিবেচিত হয়।

যৎসাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। ৫।।

সাঙ্খ্যদৃষ্টি ভাবাপন্ন কর্মযোগী যেখানে পৌঁছান, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে যিনি কর্ম করেন, তিনিও সেই একই স্থানে পৌঁছান। সেইজন্য যিনি উভয়কেই ফলের দৃষ্টিতে এক দেখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যদি উভয়েই একই স্থানে পৌঁছায়, তবে নিষ্কাম কর্মযোগ বিশেষ কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৬।।

অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ ব্যতীত **'সন্ন্যাসঃ'**- অর্থাৎ সর্বস্বের ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া দুঃখপ্রদ। যখন যোগের আচরণ আরম্ভই হয়নি, তখন তা প্রায় অসম্ভব।

সেইজন্য যিনি ভগবৎ স্বরূপ মনন করেন তিনিই মুনি, যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ মৌন, নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ করে শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

স্পষ্ট হল যে, জ্ঞানযোগে নিষ্কাম কর্মযোগেরই আচরণ করতে হয়, কারণ দুটিতেই ক্রিয়া এক—সেই যজ্ঞের ক্রিয়া, যার শুদ্ধ অর্থ 'আরাধনা'। উভয় মার্গেই তফাৎ কেবল কর্তার দৃষ্টিকোণের। একজন নিজের ক্ষমতা বুঝে লাভ-লোকসান বিবেচনা করে এই কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং অন্যজন যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি ইষ্টের উপর নির্ভর করে এই ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তিগতভাবে পড়ে, অন্যজন সংস্থাগতভাবে। উভয়ের পাঠ্যক্রম এক, পরীক্ষা এক, পরীক্ষক-নিরীক্ষক উভয়েই এক। এইরূপ উভয়ের সদ্‌গুরু তত্ত্বদর্শী এবং উপাধি এক। কেবল পড়বার পদ্ধতি তাদের ভিন্ন। হ্যাঁ, সংস্থাগত ছাত্রের জন্য সুবিধা অধিক থাকে।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কাম এবং ক্রোধ দুর্জয় শত্রু। অর্জুন ! এদের তুমি বিনাশ কর। অর্জুনের মনে হল, এ-তো বড় কঠিন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—না, দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ মন, মন থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ তোমার স্বরূপ। সেখান থেকেই তুমি প্রেরিত। এই প্রকার নিজের ক্ষমতা বুঝে, নিজের শক্তি সম্বল করে, স্বাবলম্বী হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া 'জ্ঞানযোগ'। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, চিত্তকে ধ্যানস্থ করে, কর্মগুলি আমাকে সমর্পণ করে আশা, মমতা এবং সন্তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ কর। সমর্পণের সঙ্গে ইষ্টের উপর নির্ভর করে, সেই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্কাম কর্মযোগ। উভয়ের ক্রিয়া এবং পরিণাম এক।

এরই উপর জোর দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে, যোগের আচরণ ব্যতীত সন্ন্যাস অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মের সমাপ্তির স্থিতিলাভ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এরূপ কোন যোগ নেই যে, হাত গুটিয়ে বসে এটা বললেই যে- "আমি পরমাত্মা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, আমার কর্ম করবার প্রয়োজন নেই, আমার কোন বন্ধন নেই। আমি ভাল-মন্দ যা কিছু করি, তা' আমি করি না। ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত।"- এরূপ কপটতা শ্রীকৃষ্ণের শব্দে কোথাও নেই। সাক্ষাৎ যোগেশ্বরও নিজের অনন্য সখা অর্জুনকে কর্ম ছাড়া এই স্থিতি প্রদান করতে পারেননি। এরূপ করতে পারলে, গীতার প্রয়োজন কি ছিল ? কর্ম করতেই হবে। কর্ম করেই সন্ন্যাসের স্থিতিলাভ করা সম্ভব এবং যোগযুক্ত পুরুষ শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন। এরূপ পুরুষের লক্ষণ কি ? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।। ৭।।

'**বিজিতাত্মা**'-যিনি বিশেষরূপে দেহ জয় করেছেন, '**জিতেন্দ্রিয়ঃ**'- যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন এবং '**বিশুদ্ধাত্মা**'- যাঁর অন্তঃকরণ বিশেষরূপে শুদ্ধ, এরূপ পুরুষ '**সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**'- সম্পূর্ণ ভূতপ্রাণির আত্মার মূল উদ্গম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত এবং যোগযুক্ত হন। তিনি কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। তাহলে করেন কে? অনুগামীদের মধ্যে পরমকল্যাণকর বীজের সংগ্রহের জন্য। কেন লিপ্ত হন না? কারণ সম্পূর্ণ প্রাণিগণের যিনি মূল উদ্গম, যাঁর নাম পরমতত্ত্ব, সেই তত্ত্বে তিনি স্থিত হয়ে গেছেন। এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, যার খোঁজ করা হবে। যাবতীয় বস্তু যেগুলি ত্যাগ করে এসেছেন, সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে, তাহলে আসক্তি কার উপর করবেন? সেইজন্য তিনি কর্মে আবদ্ধ হন না। এটাই যোগযুক্তের শেষ সীমা। পুনরায় যোগযুক্ত পুরুষের স্থিতি স্পষ্ট করছেন যে, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও তাতে লিপ্ত হন না কেন?–

নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্গচ্ছন্স্বপন্শ্বসন্।। ৮।।

প্রলপন্বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। ৯।।

পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎসহিত অনুভুত যোগযুক্ত পুরুষের মনের স্থিতি অর্থাৎ অনুভুতি এই যে, আমি কিঞ্চিন্মাত্রও করি না। এটা তাঁর কল্পনা নয়, বরং এই স্থিতি তিনি কর্ম করে লাভ করেছেন। যথা '**যুক্তো মন্যেত**'- এখন প্রাপ্তির পর তিনি সমস্ত কিছু পশ্যনে, শ্রবণে, স্পর্শণে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, বাযু গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষেও 'ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত', এইরূপ ধারণাযুক্ত হন। পরমাত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, এবং যখন তিনি সেই পরমাত্মাতেই স্থিত, তখন তার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন্ সুখের কামনা করে তিনি কারও স্পর্শ ইত্যাদি করবেন? যদি এর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু থাকত, তাহলে আসক্তি অবশ্যই হত। কিন্তু প্রাপ্তির পর এখন এগিয়ে যাবেন কোথায়? এবং কি ত্যাগ করবেন? সেইজন্য যোগযুক্ত পুরুষ লিপ্ত হন না। একেই একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন–

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।। ১০।।

পদ্ম ফুলের জন্ম কাদায় হয়, পদ্মপাতা জলে ভাসতে থাকে। তরঙ্গ রাত-দিন তার উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করে; কিন্তু এর পাতা দেখবেন শুকনোই থাকে। জলের একটা বিন্দুও তার উপর স্থির হতে পারে না। জল এবং পাঁকের মধ্যে থেকেও পদ্মপাতা তাতে লিপ্ত হয় না। সেইরূপ যে পুরুষ সমস্ত কর্ম পরমাত্মাতে বিলয় করে (সাক্ষাৎকারের সঙ্গেই কর্মের বিলয় হয়, এর পূর্বে নয়), আসক্তি ত্যাগ করে (কারণ এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, অতএব আসক্তিও থাকে না, সেই জন্য আসক্তি ত্যাগ করে) কর্ম করেন, এইরূপ তিনিও লিপ্ত হন না। তাহলে তিনি করেন কেন? আপনাদের জন্য, সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য, অনুগামীদের পথ দেখানোর জন্য। এই প্রসঙ্গেই জোর দিলেন—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।। ১১।।

যোগীগণ কেবল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং দেহের আসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। কর্ম ব্রহ্মে লীন হওয়ার পরেও কি আত্মা অশুদ্ধ থাকে? না, তিনি 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' হয়ে যান। সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি নিজের আত্মাকে ব্যাপ্ত দেখেন। সেই সকল আত্মার শুদ্ধির জন্য, আপনাদের সকলের পথ-প্রদর্শনের জন্য তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তিনি কর্ম করেন। তাঁর স্বরূপ কোন কর্ম করে না, স্থির থাকে। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে সক্রিয় মনে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরে অসীম শান্তি প্রবাহিত থাকে। যেমন পোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না, শুধু আকারটুকু বাকী থাকে।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।। ১২।।

'যোগযুক্ত' অর্থাৎ যিনি যোগের ফললাভ করেছেন, সেই পুরুষ সকল প্রাণীর আত্মার মূল পরমাত্মা যিনি, তাঁতে স্থিত, এইরূপ যোগী কর্মের ফলত্যাগ করে (কর্মফল পরমাত্মা এবং তিনি ভিন্ন নন, সেইজন্য এখন কর্মফল ত্যাগ করে) **'নৈষ্ঠিকীম্ শান্তিম্ আপ্নোতি'**- শান্তির অন্তিম অবস্থা লাভ করেন, যারপর আর কোন শান্তি লাভ করা

বাকী থাকে না অর্থাৎ তিনি আর কখনও অশান্ত হন না। কিন্তু অযুক্ত পুরুষ, যিনি যোগের পরিণামের সঙ্গে যুক্ত নন, পথিক- এরূপ পুরুষ ফলে আসক্ত হয়ে (ফল হলেন পরমাত্মা, তাঁতে আসক্ত হওয়া আবশ্যক, সেইজন্য ফলে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও) **'কামকারেণ নিবধ্যতে'**- কামনা করে আবদ্ধ হন অর্থাৎ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কামনাগুলি জাগে, অতএব সাধককে চরম অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। 'মহারাজজী' বলতেন, "হো! তনিকৌ হম অলগ, ভগবান অলগ হ্যাঁয়, তো মায়া কাময়াব হো সকতী হ্যায়।" কালকে লাভ হবে তবুও আজ তো সে অজ্ঞানীই। অতএব পূর্তিপর্যন্ত সাধকের অসাবধান হওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গেই দেখুন–

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্।। ১৩।।

যিনি সম্পূর্ণরূপে স্ব-বশে, যিনি কায়, মন, বুদ্ধি এবং প্রকৃতির ঊর্ধ্বে স্বয়ং-এ স্থিত, এরূপবশী পুরুষ নিঃসন্দেহে নিজে কিছু করেন না এবং কাউকে কর্মে প্রবর্তিতও করেন না। অনুগামীদের দিয়ে করালেও তাঁর আন্তরিক শান্তিকে কিছু স্পর্শ করতে পারে না। এরূপ স্বরূপস্থ পুরুষ শব্দাদি বিষয়গুলিকে যে নবদ্বারের মাধ্যমে অনুভব করেন, সেই নবদ্বার (দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি নাসিকা ছিদ্র, একটা মুখ, উপস্থ এবং পায়ু) যুক্ত দেহরূপ গৃহে সমস্ত কর্ম মন থেকে ত্যাগ করে স্বরূপানন্দেই স্থিত থাকেন। বাস্তবপক্ষে তিনি কিছু করেন না এবং করানও না।

পুনরায় একেই শ্রীকৃষ্ণ অন্য শব্দে বলেছেন যে, সেই প্রভু নিজে কিছু করেন না, কাউকে কোন কর্মে প্রবর্তিতও করেন না। সর্দগুরু, ভগবান, প্রভু, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ, যুক্ত ইত্যাদি একে অন্যের পর্যায়। আলাদাভাবে কোন ভগবান কিছু করবার জন্য আসেন না। যখন কিছু করেন, তখন এই স্বরূপস্থ ইষ্টের মাধ্যমে করান। মহাপুরুষের জন্য দেহ গৃহমাত্র, অতএব পরমাত্মা করুন অথবা মহাপুরুষ, একই ব্যাপার; কারণ তিনি তাঁদের মাধ্যমে করেন। বস্তুতঃ সেই পুরুষ করেও কিছুই করেন না। এই প্রসঙ্গেই এর পরের শ্লোকটি দেখুন–

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।। ১৪।।

সেই প্রভু ভূতপ্রাণীগণের কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন না; বরং স্বভাবে যে প্রকৃতির চাপ সেই অনুসারেই সকলেই প্রবর্তিত হয়। যার যেমন প্রকৃতি- সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক, সেই স্তর থেকেই সে প্রবর্তিত হয়। প্রকৃতি তো বিস্তৃত, কিন্তু আপনার উপর ততটাই প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যতটা আপনার স্বভাব বিকৃত অথবা উন্নত।

প্রায়ই লোকে বলে যে, কর্ম করেন-করান ভগবান, আমরা তো যন্ত্রমাত্র। আমাদের দিয়ে তিনি ভাল করান অথবা মন্দ। কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, প্রভু স্বয়ং কিছু করেন না, কাউকে দিয়ে করানও না এবং জোগাড়ও করে দেন না, লোকে স্বভাবে স্থিত প্রকৃতির চাপ অনুসারেই আচরণ করে। স্বত-ই কার্য করে। তারা নিজের স্বভাবের জন্য করতে বাধ্য হয়, ভগবান করেন না। তাহলে লোকে বলে কেন যে, ভগবান করেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন–

নাদত্তে কস্যচিৎপাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।। ১৫।।

যাঁকে আগে প্রভু বলা হয়েছে, এখানে তাঁকেই বিভু বলা হ'ল, কেননা তিনি সম্পূর্ণ বৈভবযুক্ত। প্রভুতা এবং বৈভবে সংযুক্ত সেই পরমাত্মা কারও পাপকর্ম অথবা কারও পুণ্যকর্ম গ্রহণ করেন না তবুও লোকে বলে কেন? এই কারণে যে অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হয়ে। আছে তাদের এখনও প্রত্যক্ষ গোচরীভূত যে জ্ঞান, তা হয়নি। তারা এখনও জন্তু। মোহবশতঃ যা কিছু বলতে পারে। জ্ঞানদ্বারা কি হয়? একে স্পষ্ট করলেন–

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।। ১৬।।

যাঁদের অন্তঃকরণের সেই অজ্ঞান (যার দ্বারা জ্ঞান আবৃত ছিল) আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে এবং যিনি উপর্যুক্ত রূপে জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর সে জ্ঞান সূর্যের মত পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। তাহলে কি পরমাত্মা অন্ধকারের নাম? না, তিনি তো 'স্বয়ং প্রকাশরূপ দিন রাতী'- স্বয়ং প্রকাশমান। আছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের উপভোগের জন্য নয়, দেখা তো যায় না? যখন জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান অপসারিত হয়, তখন সেই জ্ঞান সূর্যের মত পরমাত্মাকে নিজের

মধ্যে প্রবাহিত করে দেয়। তখন তাঁর জন্য কোথাও অন্ধকার বলে কিছু থাকে না। সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি?–

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।। ১৭।।

যখন সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার অনুরূপ বুদ্ধি হয়, তত্ত্বের অনুরূপ প্রবাহিত মন হয়, পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতেই নিরন্তর স্থিতি এবং তৎপরায়ণ হয়, একেই জ্ঞান বলে। জ্ঞান তর্কের বিষয় নয়। এই জ্ঞানদ্বারা পাপমুক্ত পুরুষ পুনরাগমন মুক্ত পরমগতি লাভ করেন। পরমগতি প্রাপ্ত, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই পণ্ডিত বলে। আরও দেখুন-

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ১৮।।

জ্ঞানদ্বারা যাঁদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে, যাঁরা 'অপুনরাবর্তী পরমগতি' লাভ করেছেন, এইরূপ জ্ঞানীগণ বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে, গরু, কুকুর ও হাতীতে সমদর্শী হন। তাঁদের দৃষ্টিতে বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে কোন বিশেষত্ব হয় না এবং চণ্ডালের প্রতি কোন হেয়ভাব হয় না। তাঁদের দৃষ্টিতে গাভী ধর্ম নয়, কুকুর অধর্ম নয় এবং হাতির মধ্যেও কোন বিশেষত্ব নেই। এরূপ পণ্ডিত, জ্ঞাতাগণ সমদর্শী এবং সমবর্তী হন। তাঁদের দৃষ্টি চর্মে নয়, আত্মাতে পড়ে। পার্থক্য কেবল এতটাই বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন স্বরূপের কাছে হন এবং বাকী যারা, তারা কিছু দূরে থাকে। কেউ একস্তর উপরে, কেউ একস্তর নীচে থাকে। দেহটা তো বস্ত্র। তাঁদের দৃষ্টি বস্ত্রকে গুরুত্ব দেয় না বরং তাদের হৃদয়ে স্থিত আত্মাতে পড়ে। সেই জন্য তাঁরা পার্থক্য করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যথেষ্ট গোসেবা করেছিলেন। তাঁকে গাভীর প্রতি গৌরবপূর্ণ শব্দ বলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সেরূপ কিছু বলেননি। শ্রীকৃষ্ণ গাভীকে ধর্মে কোন স্থান দেন নি। তিনি কেবল এইটুকু স্বীকার করেছিলেন যে, অন্য আরও জীবাত্মার মত তাদের মধ্যেও আত্মা বিদ্যমান। গাভীর আর্থিক মহত্ব যা হোক না কেন, তাদের ধার্মিক বৈশিষ্ট পরবর্তী মানুষেরা জোর করে চাপিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গত অধ্যায়ে বলেছেন যে, অবিবেকীদের বুদ্ধি অনন্ত ভেদযুক্ত হওয়ার জন্য তারা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। অনর্থক শোভাযুক্ত বাণীতে তারা সে সমস্ত ব্যক্তও করে। তাদের বাণীর

প্রভাব যাদের চিত্তের উপর পড়ে, তাদের বুদ্ধিও নাশ হয়। কিছু লাভ হয় না, বরং অনেক কিছু লোকসান হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে অর্জুন! নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই—যজ্ঞের প্রক্রিয়া 'আরাধনা'। গাভী, কুকুর, হাতী, অশ্বত্থ, নদীর ধার্মিক মহত্ব এই অনন্ত শাখাযুক্ত অবিবেকীদেরই সৃষ্ট। যদি এগুলির ধার্মিক মহত্ব থাকত, তাহলে তা' শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই বলে থাকতেন। হ্যাঁ মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি পূজার স্থানের প্রয়োজন সাধনার আরম্ভিক কালে অবশ্যই থাকে। সেখানে প্রেরণাদায়ক সামূহিক উপদেশ পাওয়া যায়, তার উপযোগিতা অবশ্যই আছে, এগুলি ধর্মোপদেশ কেন্দ্র।

প্রস্তুত শ্লোকে দুইজন পণ্ডিতের উল্লেখ করা হয়েছে। একজন পূর্ণজ্ঞাতা এবং অন্যজন বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন। কিরূপে তাঁরা দুজন? বস্তুতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর সীমা দুটি —অধিকতম সীমা পরাকাষ্ঠা এবং প্রবেশিকা অথবা নিম্নতম সীমা। উদাহরণস্বরূপ ভক্তির নিম্নতম সীমা সেখানে, যেখান থেকে ভক্তি আরম্ভ করা হয়; বিবেক-বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে যখন আরাধনা করা হয় এবং অধিকতম সীমা সেটা, যেখানে ভক্তি পরিণাম দেওয়ার স্থিতিকে থাকে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীতেও এইরূপ হয়। যখন ব্রহ্মে স্থিতিলাভের ক্ষমতা চলে আসে, তখন বিদ্যা, বিনয় স্বাভাবিক ভাবে সাধকের মধ্যে পাওয়া যায়। মনে শান্তভাব, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, অনুভূতির সঞ্চার, ধারাবাহিক চিন্তন, ধ্যান এবং সমাধি ইত্যাদি ব্রহ্মে স্থিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা তার অন্তরালে স্বাভাবিকভাবে কার্য করে। একে ব্রাহ্মণত্বের নিম্নতম সীমা বলে। যখন ক্রমশঃ উন্নত হতে হতে ব্রহ্মের দিগ্‌দর্শন করে সাধক তাঁতেই বিলীন হন, তখন উচ্চতম সীমা উপস্থিত হয়। যাঁকে জানবার জন্য সাধনারত ছিলেন, তাঁকে লাভ করে তিনি পূর্ণজ্ঞাতা হন। অপুনরাবৃত্তিযুক্ত এরূপ মহাপুরুষ সেই বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুকুর, হাতী, গাভী সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হন, কারণ তাঁর দৃষ্টি হৃদয়স্থিত আত্মস্বরূপে পড়ে। এরূপ মহাপুরুষ পরমগতি লাভ করে কি পেয়েছেন এবং কিরূপে? এর উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।। ১৯।।

সেই পুরুষগণ জীবিত অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সংসার জয় করেন, যাঁদের মন সমভাবে স্থিত। মনের সমভাবের সঙ্গে সংসার জয় করার কি সম্বন্ধ? সংসার লুপ্ত হওয়ার পর সেই পুরুষ থাকেন কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, '**নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম**'-

সেই ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম হন, এদিকে সেই পুরুষের মনও নির্দোষ ও সমস্থিতি যুক্ত হয়ে যায়। **'তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ'**- সেইজন্য তাঁরা ব্রহ্মে স্থিত হতে পারেন। একেই অপুনরাবর্তী পরমগতি বলে। এটা কখন লাভ হয়? যখন সংসাররূপ শত্রুকে জয় করে নেওয়া হয়। এই সংসারকে কখন জয় করা সম্ভব হয়? যখন মন নিরুদ্ধ হয়, সমভাবে স্থিত হয় (কারণ মনের প্রসারই জগৎ)। যখন তাঁরা ব্রহ্মে স্থিত হন, তখন ব্রহ্মবিদের লক্ষণ কি? তাঁদের অবস্থিতি স্পষ্ট করলেন–

ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ।। ২০।।

তাঁর প্রিয়-অপ্রিয় বলে কেউ থাকে না। সেইজন্য সাধারণ লোকে যাকে প্রিয় বলে মনে করে, তাকে পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হন না এবং যাকে লোকে অপ্রিয় বলে ভাবে (যেমন ধর্মাবলম্বী প্রতীকরূপে ব্যবহার করেন) তাকে পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হন না। এরূপ স্থিরবুদ্ধি, **'অসংমুঢ়'**- সংশয়শূণ্য, **'ব্রহ্মবিদ্'**- ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্মবেত্তা **'ব্রহ্মণি স্থিতঃ'**- পরাৎপর ব্রহ্মে সদৈব স্থিত থাকেন।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।। ২১।।

বাহ্য সংসারের বিষয়-ভোগে অনাসক্ত পুরুষ অন্তরাত্মাতে স্থিত যে সুখ বিদ্যমান, সেই সুখলাভ করেন। সেই পুরুষ **'ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'**- পরব্রহ্ম পরমাত্মায় মিলিত হয়ে যুক্তাত্মা হন, সেইজন্য তিনি অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন, যে আনন্দ কখনও ক্ষয় হয় না। এই আনন্দ উপভোগ কে করতে সমর্থ? যিনি বাহ্য বিষয় ভোগে অনাসক্ত। তাহলে কি ভোগ বাধক? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। ২২।

কেবল ত্বক্‌ই নয়, সকল ইন্দ্রিয় স্পর্শ করে। দেখা–চোখের স্পর্শ, শোনা–কানের স্পর্শ। এই প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিষয়সমূহের সংযোগে উৎপন্ন সকল ভোগ যদ্যপি ভোগকালে সুখদায়ক বলে মনে হয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে সে সকল **'দুঃখযোনয়ঃ'**- দুঃখদায়ক যোনির কারণ। এই ভোগই যোনিগুলির কারণ। তাই শুধু

নয়, ভোগের কামনা মনে জাগে এবং কামনা পূরণের পর তা নাশ হয়ে যায়, ভোগ নাশবান্। সেইজন্য কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ তাতে আবদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়সমূহের এই স্পর্শে কি থাকে? কাম এবং ক্রোধ, রাগ এবং দ্বেষ। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।। ২৩।।

সেইজন্য যে মনুষ্য দেহ বিনাশের পূর্বেই কাম এবং ক্রোধ থেকে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে (নাশ করতে) সক্ষম হন, তিনি নর (যিনি রমণ করেন না।)। তিনিই এই লোকে যোগযুক্ত এবং সুখী। এর পর আর দুঃখ নেই, সেই সুখে অর্থাৎ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন। জীবিত অবস্থাতেই এর প্রাপ্তির বিধান, মৃত্যুর পর নয়। সন্ত কবীর এই বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন- '**অবধু! জীবত মে কর আশা।**' তাহলে কি মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ হয় না? তিনি বলেছেন- '**মুএ মুক্তি গুরু কহে স্বার্থী, ঝুঠা দে বিশ্বাসা।**' এই কথন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও যে, দেহ থাকতেই, মৃত্যুর পূর্বেই যিনি কাম-ক্রোধের বেগ নাশ করতে সক্ষম, সেই পুরুষ এই লোকে যোগী, তিনিই সুখী। কাম, ক্রোধ, বাহ্য স্পর্শই শত্রু। এদের জয় করুন। এইরূপ পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে পুনরায় বলছেন—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।। ২৪।।

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখী, '**অন্তরারামঃ**'- অন্তরাত্মাতেই প্রশান্তচিত্ত এবং যিনি অন্তরাত্মাতেই প্রকাশমান (যিনি সাক্ষাৎকার করেছেন) সেই যোগী '**ব্রহ্মভূতঃ**'- ব্রহ্মে একীভূত হয়ে '**ব্রহ্মনির্বাণম্**'- বাণীর ঊর্ধ্বে যে ব্রহ্ম, সেই শাশ্বত ব্রহ্মকে লাভ করেন। অর্থাৎ সর্বপ্রথম বিকারসমূহের (কাম-ক্রোধের) অন্ত, তারপরে দর্শন এবং শেষে প্রবেশ। আরও দেখুন—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।। ২৫।।

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে যাঁদের পাপ নাশ হয়েছে, যাঁদের সংশয় নষ্ট হয়েছে এবং সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত (যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরাই এরূপ

করতে পারেন। যারা গর্তে পড়ে আছে, তারা কি অন্যকে বাইরে বার করবে? সেইজন্য মহাপুরুষগণের স্বাভাবিক গুণ করুণা) এবং **'যতাত্মানঃ'**- জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ শান্ত পরব্রহ্মকে লাভ করেন। সেই মহাপুরুষের স্থিতির উপর পুনরায় আলোকপাত করলেন–

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্।। ২৬।।

কাম এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত, যিনি চিত্ত জয় করেছেন, যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেছেন, সেই জ্ঞানীপুরুষগণ সর্বদিক্ থেকে শান্ত পরব্রহ্মকে লাভ করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বার বার সেই পুরুষের স্থিতির উপর জোর দিচ্ছেন যাতে প্রেরণা লাভ করে সাধক এতে প্রবৃত্ত হন। প্রশ্নটি প্রায় সম্পূর্ণ হল। এখন তিনি পুনরায় জোর দিচ্ছেন যে, এই স্থিতিলাভ করবার আবশ্যক অঙ্গ হল 'প্রাণ-অপানে (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে) চিন্তণ'। যজ্ঞের প্রক্রিয়াতে প্রাণের অপানে আহুতি, অপানের প্রাণে আহুতি, প্রাণ এবং অপান উভয়ের গতি কিরূপে নিরুদ্ধ করতে হয় বলেছেন। সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন–

স্পর্শান্‌কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।। ২৭।।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।। ২৮।।

অর্জুন! বাহ্য বিষয়, দৃশ্যগুলির চিন্তন না করে, সেগুলি ত্যাগ করে, দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করে, 'ভ্রূবোঃ অন্তরে'এর অর্থ নয় যে, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে অথবা ভ্রূযুগলের মধ্যেই কোথাও দেখবার চিন্তা করে দৃষ্টি স্থির করবেন। ভ্রূযুগলের মধ্যের অর্থ এটাই যে, সোজা হয়ে বসলে দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে দিয়ে যেন সোজা সম্মুখে পড়ে। কখনও ডানদিকে, কখনও বাঁদিকে, এদিক্-ওদিক্ অস্থির দৃষ্টি যেন না হয়। নাকের অগ্রভাগে সোজা দৃষ্টি স্থির করে (নাক যেন নজরে না পড়ে), নাকের মধ্যে যে প্রাণ এবং অপান বায়ু বিচরণ করে, সেই বায়ু সমান করে অর্থাৎ দৃষ্টি সেখানে হবে এবং স্মৃতি শ্বাসে যুক্ত করতে হবে, সে শ্বাস কখন ভিতরে যায়? কতক্ষণ থাকে? (প্রায় আধ সেকেণ্ডের মত থাকে, জোর করে বেশীক্ষণ শ্বাসবন্ধ

রাখা উচিত নয়।) কখন বাইরে আসে? বাইরে কতক্ষণ থাকে? বলবার দরকার নেই যে, শ্বাসে যে নামধ্বনি হয়, তা শুনতে পাওয়া যাবে। এইভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যখন স্মৃতি স্থির হবে, তখন ধীরে ধীরে শ্বাস অচল, স্থির হয়ে যাবে, সম হয়ে যাবে। মনে কোন সংকল্পের উদয় হবে না এবং বাহ্য কোন সঙ্কল্প অন্তরে প্রবেশ করে মনকে নাড়া দিতেও পারবে না। বাহ্য ভোগ সমূহের চিন্তন বাইরেই ত্যাগ করে দিলে অন্তরেও সঙ্কল্প জাগবে না। স্মৃতি একদম স্থির হয়ে যাবে, তৈলধারার সদৃশ। তৈলধারা জলের মত বিন্দু বিন্দু পড়ে না, যতক্ষণ পড়ে ধারাতেই পড়ে। এইরূপ প্রাণ ও অপানের গতি সমান, স্থির করে ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি যিনি জয় করেছেন; ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধরহিত, যিনি মননশীলতার চরমসীমায় পৌঁছেছেন, এরূপ মোক্ষপরায়ণ মুনি সদা 'মুক্ত'। মুক্ত হয়ে তিনি কোথায় যান? কি লাভ করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন-

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। ২৯।।

সেই মুক্ত পুরুষ আমাকে যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর, সকল প্রাণীর স্বার্থরহিত হিতৈষী সাক্ষাৎ এইরূপ জেনে শান্তিলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই পুরুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা আমি। যজ্ঞ এবং তপস্যা অবশেষে যার মধ্যে বিলীন হয়, সে আমি। সেই পুরুষ আমাকে লাভ করেন। যজ্ঞের শেষে যার নাম শান্তি তা' আমারই স্বরূপ। সেই মুক্ত পুরুষ আমাকে জানেন এবং জানবার পর আমাকেই লাভ করেন। একেই শান্তি বলে। আমি যেমন ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সেইরূপ তিনিও।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কখনও আপনি নিষ্কাম কর্মযোগের এবং কখনও সন্ন্যাস মার্গ অনুসারে যে কর্ম করা হয়, তার প্রশংসা করছেন, অতএব উভয়ের মধ্যে যেটা আপনি চূড়ান্ত বলে নির্দিষ্ট করেছেন, যা' পরম কল্যাণকর, তা আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন! দুটিই পরমকল্যাণকর। উভয় মার্গেই নির্ধারিত যজ্ঞের প্রক্রিয়াই সম্পাদন করা হয়; কিন্তু তবুও নিষ্কাম কর্মযোগ বিশিষ্ট। এর অনুষ্ঠান না করলে সন্ন্যাস (শুভাশুভ কর্মগুলি শেষ) হয় না।

সন্ন্যাস পথের নাম নয়, গন্তব্যের নাম সন্ন্যাস। যিনি যোগযুক্ত, তিনিই সন্ন্যাসী। যোগযুক্তের লক্ষণ বললেন যে, তিনিই প্রভু। তিনি কিছু করেন না, কাউকে দিয়ে কিছু করানও না, বরং স্বভাববশতঃ প্রকৃতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে মানুষ নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকে। যিনি সাক্ষাৎ আমাকে জানতে পারেন, তিনি জ্ঞাতা এবং পণ্ডিত। যজ্ঞের পরিণামে পুরুষ আমাকে জানতে পারেন। প্রাণ-অপানে জপ এবং যজ্ঞ-তপস্যা যাঁর মধ্যে বিলীন হয়, সে আমি। যজ্ঞের পরিণামস্বরূপ আমাকে জানবার পর তাঁরা যে শান্তি লাভ করেন, তা'ও আমি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাপুরুষের মত স্বরূপ তাঁরাও লাভ করেন। তিনিও ঈশ্বরের ঈশ্বর, আত্মারও আত্মস্বরূপময় হয়ে যান, সেই পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হন (এক হতে যতগুলি জন্মই লাগুক না কেন।)। বর্তমান অধ্যায়ে স্পষ্ট করলেন যে, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, মহাপুরুষেরও অন্তরে বিদ্যমান শক্তি মহেশ্বর, অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে "যজ্ঞভোক্তামহাপুরুষস্থ মহেশ্বরঃ" নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।।৫।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'যজ্ঞ ভোক্তা মহাপুরুষস্থ মহেশ্বর' নামক পঞ্চম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'যজ্ঞভোক্তা মহাপুরুষস্থ মহেশ্বরঃ' নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।।৫।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে যজ্ঞভোক্তা মহাপুরুষস্থ মহেশ্বর' নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।।

সংসারে ধর্মের নামে ভিন্নভিন্ন রীতি-নীতি, পূজা- পদ্ধতি, সম্প্রদায়ের বাহুল্য হলে, কুরীতি শান্ত করে এক ঈশ্বরের স্থাপনা এবং তার প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে প্রশস্ত করবার জন্য মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ক্রিয়া পরিত্যাগ, নিজেকে জ্ঞানী বলে পরিচয় দেওয়ার ভণ্ডামী কৃষ্ণের কালেও অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। সেই জন্য বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে চতুর্থবার বললেন যে, জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মযোগ উভয়ের অনুসারেই কর্ম করতেই হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন- অর্জুন! ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ থেকে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর আর কোন পথ নেই। এই যুদ্ধে পরাজিত হলে দেবত্ব এবং জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতিলাভ করবে-এইরূপ চিন্তা করে যুদ্ধ কর। অর্জুন! এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। সেটা কোন বুদ্ধি? এই যে যুদ্ধ কর। জ্ঞানযোগে যে কর্ম করতে হয় না, তা নয়। জ্ঞানযোগে কেবল নিজের লাভ-লোকসানের বিচার করে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ থেকে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে; যদিও প্রেরক মহাপুরষই। জ্ঞানযোগে যুদ্ধ অনিবার্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভগবন্! নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ যদি শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে আমাকে ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? নিষ্কাম কর্মযোগ অর্জুনের কঠিন বলে মনে হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, এই দুটি সিদ্ধান্ত আমার দ্বারা বলা হয়েছে, কিন্তু কোন পথেই কর্মত্যাগ করে চলবার বিধান নেই। কর্ম আরম্ভ না করে কেউ পরম নৈষ্কর্ম্যের স্থিতিলাভ করতে পারে না এবং ক্রিয়া আরম্ভ করে তা ত্যাগ করে দিলেও কেউ পরমসিদ্ধি লাভ করতে পারে না। উভয় মার্গেই নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া করতেই হয়।

এখন অর্জুন উত্তমরূপে বুঝেছেন যে জ্ঞানমার্গ ভাল লাগুক অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, উভয় দৃষ্টিতেই কর্ম করতে হবে; এর পরেও পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, ফলের দিক্ দিয়ে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? কোনটা সুবিধাজনক? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- অর্জুন! দুটিই পরমশ্রেয় প্রদান করে। দুটিই এক স্থানে পৌঁছায়, তবুও সাংখ্য অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কারণ নিষ্কাম কর্মের আচরণ না করে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে না। দুই মার্গেই কর্ম একটাই। অতএব স্পষ্ট হ'ল যে, সেই নির্ধারিত কর্ম না করে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে না এবং না কেউ যোগীই হতে পারে। কেবল এই পথের পথিকের দুটি দৃষ্টিকোণ, যা' পূর্বেই বলা হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।১।।

শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বললেন- অর্জুন! কর্মফলের আশ্রয় না করে অর্থাৎ যিনি কর্ম করবার সময় কোন প্রকার কামনা করেন না, '**কার্যম্ কর্ম**'- করণীয় প্রক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি কেবল অগ্নিত্যাগ করেছেন এবং ক্রিয়াত্যাগ করেছেন, তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। ক্রিয়ার সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে থেকে '**কার্যম্ কর্ম**'-করবার যোগ্য ক্রিয়া, '**নিয়ত কর্ম**'- নির্ধারিত কোন ক্রিয়া-বিশেষ আছে। তা' হ'ল, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। যার শুদ্ধ অর্থ হ'ল আরাধনা, যা' আরাধ্যদেব লাভ করবার বিধি-বিশেষ। তাকে কার্যরূপ দেওয়া কর্ম। যিনি এই কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যারা অগ্নিত্যাগী বলে যে, 'আমরা অগ্নি স্পর্শ করি না' অথবা কর্মত্যাগী বলে যে, 'আমাদের কর্ম করবার দরকার নেই, আমরা আত্মজ্ঞানী'।–কর্ম আরম্ভ না করে যারা এরূপ বলে, করণীয় ক্রিয়া-বিশেষের আচরণ করে না, তারা সন্ন্যাসীও নয়, যোগীও নয়। এই প্রসঙ্গে আরও দেখুন–

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২।।

অর্জুন! যাঁকে 'সন্ন্যাস' এইরূপ বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে; কারণ সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কোন পুরুষ যোগী অথবা সন্ন্যাসী কোনটাই হতে পারেন না অর্থাৎ কামনা-ত্যাগ উভয়মার্গীর জন্য আবশ্যক। তাহলে তো ভালই, বলে দিই যে, আমি সঙ্কল্প করি না, তাহলেই যোগী-সন্ন্যাসী। হয়ে যাবে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এরূপ হয় না–

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।। ৩।।

যোগে আরোহণ করতে ইচ্ছুক মননশীল পুরুষের জন্য যোগের প্রাপ্তির জন্য কর্মানুষ্ঠানই কারণ এবং যোগের অনুষ্ঠান করতে করতে যখন তা পরিণাম দেওয়ার স্থিতিতে আসে, সেই যোগারূঢ়ত্বে '**শমঃ কারণম্ উচ্যতে**'- সকল সঙ্কল্পের অভাবই কারণ। এর পূর্বে সঙ্কল্পের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, এবং–

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে।।৪।।

যে কালে পুরুষ ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হন না এবং কর্মেও আসক্ত হন না (যোগের পরিপক্ক অবস্থাতে পৌঁছানোর পর কর্ম করে আর কার খোঁজ করা হবে? অতএব নিয়ত কর্ম আরাধনার আর প্রয়োজন হয় না, সেইজন্য তিনি আর কর্মে আসক্ত হন না।), সেই সময় '**সর্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী**'- সর্বসঙ্কল্পের অভাব দেখা দেয়। একেই বলে সন্ন্যাস এই হল যোগারূঢ়ত্ব। পথে সন্ন্যাস বলে কিছুই নেই। এই যোগারূঢ়ত্বে কি লাভ?–

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।৫।।

অর্জুন! মানুষের কর্তব্য এই যে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে। আত্মার যাতে অধোগতি না হয়; কারণ এই জীবাত্মা স্বয়ং নিজের বন্ধু আবার স্বয়ং নিজের শত্রুও। কখন শত্রু হয় ও কখন মিত্র হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।। ৬।।

যে জীবাত্মা দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সহিত দেহ জয় করা হয়েছে, তার জন্য তারই জীবাত্মা বন্ধু এবং যার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সহিত দেহ জয় করা হয়নি, তার জন্য শত্রু সে স্বয়ং।

উপরোক্ত দুটি শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ একটা কথাই বললেন যে, নিজের আত্মাকে নিজেই উদ্ধার করুন, তাকে অধোগতিতে নিয়ে যাবেন না; কারণ আত্মাই বন্ধু। এই সৃষ্টিতে অন্য কেউ শত্রু বা বন্ধু নয়। কিরূপে ? যিনি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন, তাঁর জন্য তাঁর আত্মাই বন্ধুর মত ব্যবহার করে, পরমকল্যাণকর এবং যিনি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেননি, তাঁর জন্য তাঁর আত্মাই শত্রুর মত ব্যবহার করে, নীচ যোনি এবং যাতনার দিকে নিয়ে যায়। প্রায়ই লোকে বলে- 'আমি তো আত্মা।' গীতাশাস্ত্রে বলেছে, "একে শস্ত্র ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। আত্মা নিত্য, অমৃতস্বরূপ, শাশ্বত, অপরিবর্তশীল এবং সেই আত্মা আমাতেই বিদ্যমান।" তারা গীতাশাস্ত্রের এই পংক্তিগুলি লক্ষ্য করে না যে আত্মা অধোগতিতেও যায়। আত্মার উদ্ধারও হয়, যার জন্য '**কার্যম্ কর্ম**'- করণীয় প্রক্রিয়ার আচরণ করলেই উপলব্ধি হয় বলা হয়েছে। এখন অনুকূল আত্মার লক্ষণ দেখুন—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।। ৭।।

শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে এবং মান ও অপমানে যাঁর অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ শান্ত, এইরূপ স্বাধীন আত্মা যাঁর, তাঁর মধ্যে পরমাত্মা সদা স্থিত। কখনও পৃথক্ হন না। 'জিতাত্মা' অর্থাৎ যিনি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন, বৃত্তি পরমশান্তিতে প্রবাহিত। (একেই আত্মার উদ্ধারের অবস্থা বলে।) আরও বললেন—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।। ৮।।

যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত, যাঁর স্থিতি অচল, স্থির এবং নির্বিকার, যিনি বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন, যাঁর দৃষ্টিতে মাটি, পাথর ও সোনা এক, এইরূপ যোগীকে 'যুক্ত' বলা হয়। যুক্তের অর্থ যোগে সংযুক্ত। একেই বলে

যোগের পরাকাষ্ঠা, যোগেশ্বর পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা সাত থেকে বারো পর্যন্ত যা'র বর্ণনা করেছেন। পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার এবং সেই সঙ্গে তাঁকে জানাকেই জ্ঞান বলে। সাধক ইষ্ট থেকে যদি এক ইঞ্চি দূরেই থাকে, জানবার ইচ্ছুক, তবুও তাকে অজ্ঞানীই বলে। সেই প্রেরক কিরূপে সর্বব্যাপ্ত? কিরূপে প্রেরণা প্রদান করেন? কিরূপে অনেকগুলি আত্মার একসঙ্গে পথ-প্রদর্শন করেন? কিরূপে তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞাতা? সেই প্রেরক ইষ্টের কার্য-প্রণালীর জ্ঞানই 'বিজ্ঞান'। যেদিন থেকে হৃদয়ে ইষ্টের আবির্ভাব ঘটে, সেদিন থেকেই তিনি নির্দেশ দিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শুরুতে সাধক বুঝতে পারেন না। পরাকাষ্ঠা কালেই যোগী তাঁর আন্তরিক কার্য-প্রণালী সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন। এই বোঝার ক্ষমতাকেই বিজ্ঞান বলে। যোগারূঢ় অথবা যুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত থাকে। এইরূপ যোগযুক্ত পুরুষের স্থিতির নিরুপণ করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন–

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।

সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।। ৯।।

লাভ করবার পর মহাপুরুষ সমদর্শী ও সমবর্তী হন। যেরূপ পূর্বের শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, যিনি পূর্ণজ্ঞাতা অথবা পণ্ডিত, তিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গরু, কুকুর, হাতীতে সমদর্শী হন। এই শ্লোক তারই পুরক। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে পরের উপকার করেন, এরূপ সহৃদয়, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, দ্বেষী, বন্ধু, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের প্রতিও সমানদৃষ্টিসম্পন্ন যোগযুক্ত পুরুষ অতি শ্রেষ্ঠ। তারা কি করে, না করে, কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি দেন না, তাদের ভিতরে যে আত্মা আছে, সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে। এদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই দেখেন যে, কেউ কিছু নিম্নতরে দাঁড়িয়ে, কেউ নির্মলতার কাছাকাছি পৌঁছেছেন; কিন্তু সে ক্ষমতা সকলের মধ্যেই আছে। এখানে যোগযুক্তের লক্ষণ পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

কিভাবে যোগযুক্ত অবস্থা-লাভ করা যায়? কিভাবে যজ্ঞ করা হয়? যজ্ঞস্থলী কিভাবে প্রস্তুত হবে? আসন কেমন হবে? কিরূপে আসনে উপবেশন করা হবে? যজ্ঞকর্তা দ্বারা যে নিয়মগুলি পালন করা হবে, আহার-বিহার, শয়ন-জাগরণে সংযম এবং কর্মচেষ্টা কিভাবে সম্পাদন হবে? এই বিন্দুগুলির উপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এর

পরের পাঁচটি শ্লোকে আলোকপাত করেছেন, আপনিও যাতে সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি যজ্ঞের নাম নিয়ে বলেছেন যে, যজ্ঞের প্রক্রিয়াই সেই নিয়ত কর্ম। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি যজ্ঞের স্বরূপ বিস্তারপূর্বক বলেছেন, যাতে প্রাণের অপানে আহুতি, অপানের প্রাণে আহুতি, প্রাণ-অপানের গতিরোধ করে মনকে নিরুদ্ধ করা হয়। যজ্ঞের শুদ্ধ অর্থ আরাধনা এবং আরাধ্য দেবপর্যন্ত যে প্রক্রিয়ার দ্বারা পৌঁছানো যায়, সেই বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়েও বলা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য ভূমি, আসন, করবার বিধি ইত্যাদির সম্বন্ধে বলা বাকী ছিল। তারই উপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে আলোকপাত করছেন—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।। ১০।।

চিত্ত জয় করবার জন্য প্রযত্নশীল যোগী মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দেহ সংযত করে, বাসনা ও সংগ্রহরহিত হয়ে, নির্জন স্থানে একাকী চিত্তকে (আত্মোপলব্ধি করবার) যোগক্রিয়াতে নিযুক্ত করবেন। তার জন্য কেমন স্থান হওয়া দরকার ? আসন কিরূপ হবে ?—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।। ১১।।

শুদ্ধভূমির উপর কুশ, মৃগচর্ম, বস্ত্র অথবা এর থেকে উত্তরোত্তর (রেশমী, উলের বস্ত্র, তক্তাপোষ যা কিছু হোক) স্থির আসন স্থাপন করবেন। আসন যেন অতি উঁচু বা অতি নিচু না হয়। শুদ্ধভূমির অর্থ হ'ল স্থান যেন পরিষ্কার হয়। ভুমিতে কিছু পেতে নেওয়া উচিত-মৃগচর্ম, মাদুর, বস্ত্র অথবা তক্তাপোষ যা হোক কিছু পেতে নেওয়া উচিত। আসন যেন একটুও না দোলে, স্থিরভাবে 'স্থাপন হয়'। 'পূজ্য মহারাজজী' প্রায় পাঁচ ইঞ্চি উঁচু আসনের উপর বসতেন। একবার ভক্তগণ এক ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের এক চৌকী এনে দিয়েছিলেন। মহারাজজী মাত্র একদিন ব্যবহার করেছিলেন, পরদিনই বলেছিলেন- "না হো ! সাধুদের এত উঁচু আসনে বসা উচিত নয়, এতে অভিমান চলে আসে। আবার নীচুতেও বসা উচিত নয়, হীনভাব ও ঘৃণা

উৎপন্ন হয়।” সেটা সরিয়ে বাগানে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে কখনও যেতেন না। এখনও কেউ যায় না। এইরূপ ছিল সেই মহাপুরুষের শিক্ষা-পদ্ধতি। সাধকের জন্য বেশী উঁচু আসন ব্যবহার উচিত নয়, না হলে ভজন সম্পূর্ণ হবে পরে, আগে অহঙ্কারটাই প্রাধান্য পাবে। এর পরে–

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।। ১২।।

সেই আসনে বসে (বসেই ধ্যান করবার বিধান), মনকে একাগ্র করে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াকে বশে রেখে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করবেন। কিভাবে উপবেশন করা হবে, তা বলছেন–

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।১৩।।

দেহ, গ্রীবা ও মস্তককে সোজা, অচল-স্থির করে (যেমন কোন সরলরেখা হয়) এইরূপ সোজা, দৃঢ় হয়ে বসুন এবং স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ দেখেন। (নাসিকার অগ্রভাগ দেখবার নির্দেশ দিচ্ছেন না বরং সোজা বসলে নাকের সোজাসুজি যেখানে দৃষ্টি পড়ে, সেখানেই দৃষ্টি থাকবে। এদিক্-ওদিক্ দেখবার চঞ্চলতা যেন না হয়) অন্য দিকে না দেখেন স্থির হয়ে বসবেন। এবং–

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।। ১৪।।

ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত (প্রায়ই লোকে বলে যে জননেন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য; কিন্তু মহাপুরুষগণের অনুভূতি এই যে, মন থেকে বিষয়ের স্মরণ করে, চোখ দিয়ে সে রকম দৃশ্য দেখে, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করে, কানে বিষয়োত্তেজক শব্দ শুনে জননেন্দ্রিয় সংযম সম্ভব নয়। ব্রহ্মচারীর বাস্তবিক অর্থ হল, ‘**ব্রহ্ম আচরতি স ব্রহ্মচারী**’- ব্রহ্মের আচরণ হ’ল নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া, যার অনুষ্ঠান করে ‘**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**’- সনাতন ব্রহ্মে বিলীন হওয়া যায়। এর অনুষ্ঠানের সময় ‘**স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্**’- বাহ্য স্পর্শ, মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহের স্পর্শ বাইরেই ত্যাগ করে চিত্তকে ব্রহ্ম চিন্তনে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে (প্রাণ-অপানে), ধ্যানে নিযুক্ত করতে হবে। মন ব্রহ্মে নিযুক্ত থাকলে,

বাহ্য স্মরণ কে করবে? যদি তবুও বাহ্য স্মরণ হয়, তাহলে মন নিযুক্ত হয়েছে কোথায়? বিকার দেহে নয়, মনের তরঙ্গের মধ্যে থাকে। মন যদি ব্রহ্মাচরণে রত, তাহলে কেবল জননেন্দ্রিয় সংযমই নয়, বরং সকলেন্দ্রিয় সংযম স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতএব ব্রহ্মাচরণে স্থিত থেকে) ভয়রহিত এবং উত্তমরূপে শান্ত অন্তঃকরণযুক্ত, মনকে সংযত করে, আমাতেই চিত্ত নিযুক্ত করে, মৎপরায়ণ হয়ে স্থিত হবেন। এরূপ আচরণের পরিণাম কি?—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।। ১৫।।

এইরূপ নিজেকে নিরন্তর সেই চিন্তনে নিযুক্ত করে, সংযত মনযুক্ত যোগী আমাতে স্থিতিরূপ পরাকাষ্ঠাযুক্ত শান্তি প্রাপ্ত হন। সেইজন্য নিজেকে নিরন্তর কর্মে নিযুক্ত করুন। এই প্রশ্নটি এখানেই সম্পূর্ণ হ'ল। এর পরে দুটি শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, পরমানন্দযুক্ত শান্তির জন্য শারীরিক সংযম, যুক্তাহার, বিহারও আবশ্যক—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।। ১৬।।

অর্জুন! এই যোগ অতিভোজীর সিদ্ধ হয় না এবং একান্ত অনাহারীরও সিদ্ধ হয় না, অত্যন্ত নিদ্রালুর এবং অতি অনিদ্রা-অভ্যাসীরও সিদ্ধ হয় না। তাহলে কার সিদ্ধ হয়?—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।। ১৭।।

দুঃখের নাশক এই যোগ তাঁর পূর্ণ হয়, যিনি পরিমিত আহার-বিহার করেন, কর্মে পরিমিত চেষ্টা করেন এবং যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ সংযমিত। অধিক ভোজনে আলস্য, নিদ্রা এবং প্রমাদ ঘিরে ধরে, তখন সাধনা ব্যাহত হয়। আহার ত্যাগ করলেও ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্বল হয়ে যায়, অচল-স্থির হয়ে বসবার ক্ষমতা থাকে না। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন যে, যতটা খোরাক তার থেকে একটা দুটো রুটি কম খাওয়া উচিত। বিহার অর্থাৎ সাধনের অনুকূল বিচরণ, অল্প পরিশ্রমও করা উচিত, কোন কাজ খুঁজে নিতে হয় অন্যথা রক্তসঞ্চার শিথিল হয়ে যাবে, যার ফলে রোগ-ব্যাধির

শিকার হবে। আয়ু নিদ্রা ও জাগরণ, আহার ও অভ্যাসে কম-বেশী হয়। 'মহারাজজী' বলতেন– "যোগীকে চার ঘন্টা শয়ন করা উচিত এবং সবসময় স্মরণ-মনন করা উচিত। যে বৃথা জাগরণ করে, সে শীঘ্রই পাগল হয়ে যায়।" কর্মে পরিমিত চেষ্টা হওয়া দরকার অর্থাৎ নিয়ত কর্ম আরাধনার অনুরূপ নিরন্তর প্রযত্নশীল হওয়া দরকার। বাহ্য বিষয়গুলির স্মরণ না করে সর্বদা তাতেই যিনি নিযুক্ত, তাঁরই যোগে সিদ্ধিলাভ হয়; সঙ্গে সঙ্গে–

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। ১৮।।

এই প্রকার যোগের অভ্যাসদ্বারা বিশেষরূপে সংযতচিত্ত যেকালে পরমাত্মাতে উত্তমরূপে স্থিত হন, প্রায় বিলীন হয়ে যান, সেইকালে কামনা থেকে মুক্ত পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয়। এখন বিশেষরূপে বিজিত চিত্তের লক্ষণ কি?–

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।। ১৯।।

যে প্রকার বায়ুশূণ্য স্থানে অবস্থিত প্রদীপের দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, শিখা ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাতে কম্পন হয় না, সেই উপমা দেওয়া হয়েছে পরমাত্মার ধ্যানে প্রবৃত্ত চিত্তজয়ী যোগীর সঙ্গে। প্রদীপ তার উদাহরণ মাত্র। বর্তমান সময়ে প্রদীপের প্রচলন কমে গেছে। বায়ুতে বেগ না থাকলে, ধূপকাঠির ধোঁয়া সোজা উপরের দিকে যায়। এটা যোগীর বিজিত চিত্তের একটা উদাহরণ মাত্র। এখন যদিও চিত্ত জয় করা হয়েছে, নিরোধও হয়ে গেল, কিন্তু এখনও চিত্ত তো বিদ্যমান। যখন এই নিরুদ্ধ চিত্তেরও বিলয় হয়, তখন কি বিভূতি লাভ হয়? দেখুন–

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।। ২০।।

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্তেরও নিবৃত্তি হয়, বিলীন হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, সেই অবস্থায় '**আত্মনা**'- স্বীয় আত্মার দ্বারা '**আত্মানম্**'-পরমাত্মার দর্শন করে '**আত্মনি এব**'- স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়। দর্শন করেন পরমাত্মার কিন্তু সন্তুষ্ট হন স্বীয় আত্মাতে। কারণ প্রাপ্তিকালে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু পরক্ষণেই

তিনি নিজের আত্মাকে সেই শাশ্বত ঈশ্বরীয় বিভূতিগুলিতে ওতপ্রোত দেখেন। ব্রহ্ম যেমন অজর, অমর, শাশ্বত, অব্যক্ত ও অমৃতস্বরূপ। তেমনি আত্মাও অজর, অমর, শাশ্বত অব্যক্ত ও অমৃতস্বরূপ। আছে কিন্তু সেই আত্মা অচিন্ত্যও। যতক্ষণ চিত্ত এবং চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ আপনার উপভোগের জন্য নয়। নিরুদ্ধ চিত্ত এবং নিরুদ্ধ চিত্তেরও বিলুপ্তিকালে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় এবং দর্শনের পরেই সেই ঈশ্বরীয় বিভূতিগুলিতে যুক্ত যোগী নিজের আত্মাকে দেখেন। সেই জন্য তিনি নিজের আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন। এই তাঁর স্বরূপ। এই হল পরাকাষ্ঠা। এরই পূরক পরের শ্লোকটি দেখুন—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।। ২১।।

এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অতীত, কেবল শুদ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ যোগ্য যে অসীম আনন্দ আছে, তা' যে অবস্থায় অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিত হয়ে এই যোগী ভগবৎ স্বরূপকে তত্ত্বসহিত জেনে বিচলিত হন না, সর্বদা তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। ২২।।

পরমেশ্বরের প্রাপ্তিরূপ যে লাভ, পরাকাষ্ঠার শান্তিলাভ করে যোগী অন্য লাভ তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ যে অবস্থায় স্থিত যোগী মহাদুঃখেও বিচলিত হন না, তাঁর দুঃখবোধ হয় না, কারণ যে চিত্ত বোধ করত, তা বিলীন হয়ে গেছে, এইরূপ—

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিণ্ণচেতসা।। ২৩।।

যা সংসারের সংযোগ ও বিয়োগ থেকে রহিত, তার নাম যোগ। সে সুখ আত্যন্তিক, তার মিলনকে যোগ বলে। যাঁকে পরমতত্ত্ব পরমাত্মা বলা হয়, তাঁর মিলনকে যোগ বলে। সে যোগ অবিচলিত চিত্তদ্বারা নিশ্চয়পূর্বক করা কর্তব্য। যিনি ধৈর্যধারণ করে রত থাকেন, তিনিই যোগে সফল হন।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ধামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।। ২৪।।

সেইজন্য মানুষের উচিত যে, সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে বাসনা ও আসক্তি সহিত সর্বদা ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বদিকে ভাল প্রকারে বশে করে–

শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।। ২৫।।

অভ্যাস করে ধীরে ধীরে উপরত করবে। চিত্ত নিরুদ্ধ এবং বিলীন হয়ে যাবে। তদনন্তর সে ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে স্থিত করে অন্য কিছুই চিন্তন করবে না। লাভ করবার বিধান নিরন্তর প্রবৃত্ত থেকেই। কিন্তু শুরুতে মন লাগে না, এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন–

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।। ২৬।।

এই অস্থির ও চঞ্চল মন যে যে কারণে সাংসারিক পদার্থে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে সংযমিত করে বার বার অন্তরাত্মাতেই নিরুদ্ধ করবেন। প্রায়ই লোকে বলে যে, মন যেখানে যেতে চায় যেতে দাও, প্রকৃতির মধ্যেই কোথাও যাবে এবং প্রকৃতিও ব্রহ্মের অন্তর্গত, প্রকৃতিতে বিচরণ করা ব্রহ্মের বাইরে নয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এটা ভুল। গীতায় এই সমস্ত মান্যতাগুলির কোন স্থান নেই। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, যে মাধ্যমে যায়, সেই মাধ্যমকেই সংযত করে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করবেন। মনকে নিরুদ্ধ করা সম্ভব। এই নিরুদ্ধের পরিণাম কি?–

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।। ২৭।।

যাঁর মন পূর্ণরূপে শান্ত, যিনি পাপমুক্ত, যাঁর রজোগুণ শান্ত হয়ে গেছে, ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত এরূপ যোগী সর্বোত্তম আনন্দলাভ করেন, যার থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে পুনরায় জোর দিলেন–

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।। ২৮।।

এইরূপে আত্মাকে নিরন্তর সেই পরমাত্মাতে যুক্ত করে নিষ্পাপ যোগী সুখপূর্বক পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির অসীম আনন্দের অনুভব করেন। তিনি **'ব্রহ্মসংস্পর্শ'** অর্থাৎ ব্রহ্মের স্পর্শ এবং তাঁতে স্থিত হওয়ার সঙ্গে অসীম আনন্দের অনুভব করেন। অতএব ভজন অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে আরও বলছেন–

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।। ২৯।।

যোগের পরিণামের সঙ্গে যুক্ত আত্মবান্, সর্বভূতে সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতেই প্রবাহিত দেখেন। এরূপ দর্শন করলে কি লাভ?–

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।। ৩০।।

যিনি সর্বভূতে পরমাত্মারূপ আমাকে দর্শন করেন, ব্যাপ্ত দেখেন এবং সর্বভূতকে সর্বাত্মা আমাতে দর্শন করেন, তাঁর জন্য আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার জন্য অদৃশ্য হন না। এটাই প্রেরকের মুখোমুখি মিলন, সখ্যভাব, সামীপ্যমুক্তি।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।। ৩১।।

যিনি বহুর মধ্যে উপর্যুক্ত একত্বভাবে আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকারের কার্যে নিযুক্ত থেকেও আমাতেই অবস্থিতি করেন; কারণ আমি ব্যতীত তাঁর জন্য আর কেউ নেই, তাঁর সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে। সেইজন্য এখন তিনি ওঠাবসা, যা কিছু করেন, আমার সঙ্কল্পেই করেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। ৩২।।

হে অর্জুন! যিনি নিজের সমান সর্বভূতকে দেখেন, সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায় অনুভব করেন, তিনি (যাঁর ভেদ-ভাব সমাপ্ত হয়ে গেছে) সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। এই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।। ৩৩।।

হে মধুসূদন! যে যোগ আপনি ব্যাখ্যা করলেন, যাতে সমদর্শী হওয়া যায়, মন চঞ্চল, এই কারণে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্থিতিতে আমি নিজেকে দেখছি না।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।। ৩৪।।

হে কৃষ্ণ! এই মন অতি চঞ্চল, প্রমথন স্বভাবযুক্ত (প্রমথন অর্থাৎ যা' আলোড়ন সৃষ্টি করে), অবিবেচক এবং প্রবল, সেইজন্য একে বশে করা আমি বায়ুর ন্যায় অতি দুষ্কর মনে করি। ঝড়ের বায়ুকে এবং মনকে নিবৃত্ত করা দুই-ই সমান। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। ৩৫।।

মহান্, কার্যে প্রযত্নশীল অর্থাৎ মহাবাহু অর্জুন! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং একে বশ করা অতি কঠিন; পরন্তু কৌন্তেয়! মন অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায়। যেখানে চিত্ত নিযুক্ত করতে হবে, সেখানে স্থির করবার জন্য বার বার প্রযত্ন করাকে অভ্যাস বলে এবং দেখা-শোনা বিষয়-বস্তু থেকে (সংসার অথবা স্বর্গাদি ভোগগুলিতে) রাগ অর্থাৎ আসক্তির ত্যাগ বৈরাগ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে মনকে বশীভূত করা কঠিন; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা যায়।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ।। ৩৬।।

অর্জুন! যে পুরুষ মনকে বশে করে নাই, তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যাঁর মন স্ববশ, সেই প্রযত্নশীল পুরুষ যোগলাভ করতে পারেন, এই আমার অভিমত। যত কঠিন তুমি মনে করছ, তত কঠিন নয়। অতএব একে কঠিন মনে করে ত্যাগ করে দিও না। প্রযত্নপূর্বক এই যোগলাভ কর, কারণ মন বশীভূত হলেই যোগ সম্ভব। এই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।। ৩৭।।

যোগ করতে করতে যদি কোন ব্যক্তির মন বিচলিত হয়, যদ্যপি তিনি এখনও শ্রদ্ধাবান্, তথাপি এরূপ ব্যক্তি ভগবৎ সিদ্ধি লাভ না করে কোন্ গতি পেয়ে থাকেন?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।। ৩৮।।

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! ভগবৎ প্রাপ্তির মার্গ থেকে বিচলিত সেই মোহিত ব্যক্তি ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের ন্যায় উভয় দিক্ থেকে নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যান কি? এক খণ্ড মেঘ বর্ষাও দিতে পারে না আবার বড় মেঘের সঙ্গে মিশতেও পারে না বরং দেখতে দেখতে হাওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেইরূপ শিথিল প্রযত্নশীল, কিছুকাল সাধনা করে স্থগিত করে দিলে তিনি নষ্ট হয়ে যান কি? তিনি আপনার সঙ্গে একীভূত হতে পারেন না এবং ভোগগুলিও ভোগ করতে পারেন না, তাহলে তাঁর গতি কি হয়?

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।। ৩৯।।

হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর করতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। আপনি ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে এই সংশয় দূর করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।। ৪০।।

পার্থিব দেহকেই রথ ভেবে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর অর্জুন! সেই পুরুষের না এই লোকে এবং না পরলোকেই নাশ হয়; কারণ হে বৎস! সেই পরম কল্যাণকর নিয়ত কর্মের আচরণ করেন যিনি, তাঁর কখনও দুর্গতি হয় না। তাহলে তাঁর কি হয়?–

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে।। ৪১।।

মন বিচলিত হলে যোগভ্রষ্ট সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্‌গণের লোকাদিতে বাসনাগুলি ভোগ করেন (যে বাসনাগুলির জন্য তিনি যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন, ভগবান্ অল্পসময়ের মধ্যেই সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেন, সেগুলিকে ভোগ করে) তিনি '**শুচীনাং শ্রীমতাম্**'-সদাচারসম্পন্ন শ্রীমান্ পুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। (শ্রীমান্ তিনি, যিনি শুদ্ধ আচরণ করেন।)

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।। ৪২।।

অথবা সেস্থানেও যদি জন্ম না হয়, তাহলে স্থিরবুদ্ধি যোগিগণের কুলে তিনি প্রবেশ পেয়ে যান। শ্রীমান্ পুরুষের গৃহে পবিত্র সংস্কার ছেলেবেলা থেকেই পড়তে থাকে; কিন্তু সেখানে জন্ম না হলে তিনি যোগিগণের কুলে (গৃহে নয়) শিষ্য-পরম্পরায় প্রবেশ পেয়ে যান। কবীর, তুলসী, রৈদাস, বাল্মীকি এঁরা শুদ্ধ আচরণযুক্ত শ্রীমান্‌গণের গৃহে নয়, যোগীকুলে স্থান পেয়েছিলেন। সদ্‌গুরুর কুলে সংস্কারের পরিবর্তনও একটা জন্ম এবং এইরূপ জন্ম সংসারে নিঃসন্দেহে অতিদুর্লভ। যোগীগণের কুলে জন্মের অর্থ কেবল তাদের পুত্ররূপেই উৎপন্ন হওয়া নয়। গৃহত্যাগের পূর্বে যারা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, তারা মোহবশতঃ মহাপুরুষকে পিতা বলে মনে করলেও সেই মহাপুরুষের জন্য ঘর-পরিবারের নামে আপনজন বলে কেউ থাকে না। যে শিষ্য তাঁর আদর্শকে সম্বল করে নিষ্ঠা ভরে তার অনুষ্ঠান করেন, তাঁর মহত্ব পুত্র অপেক্ষা বহুগুণ বেশী, সেই কারণে সেই শিষ্যই তাঁর বাস্তবিক পুত্র।

যে ব্যক্তি যোগের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাকে মহাপুরুষগণ শিষ্য বলে গ্রহণ করেন না। 'পূজ্য মহারাজজী' যদি কেবল গেরুয়াধারী সাধুর সংখ্যা-বৃদ্ধি করতে

চাইতেন, তাহলে হাজার হাজার ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন; কিন্তু তিনি কাউকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে, কারও বাড়ীতে চিঠি দিয়ে, বুঝিয়ে, ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ জিদ করলে তিনি যত রকম কুলক্ষণই দেখতে পেতেন। অন্তর থেকে নিষেধ হত যে, এর মধ্যে সাধু হওয়ার একটা লক্ষণও নেই, একে রাখা ঠিক হবে না, এ পার হতে পারবে না। নিরাশ হয়ে দু'একজন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে জীবনত্যাগও করেছিল, কিন্তু মহারাজজী তাদেরও নিজের আশ্রমে স্থান দেননি। পরে জানতে পেরে বলেছিলেন- "যদিও জানতাম খুবই ব্যাকুল, তবুও মরে যাবে জানলে পরে রেখে নিতাম। একজন পতিত ব্যক্তিই থাকত আর কি হত।" মমত্ব তাঁর মধ্যেও খুব বেশী ছিল, তবুও রাখেননি। ৬-৭ জন যাঁদের জন্য আদেশ হয়েছিল যে- "আজ একজন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি আশ্রমে আসছে, জন্ম-জন্মান্তর থেকে ভ্রমিত হয়ে চলে আসছে। এই তার নাম, এই তার রূপ, তাকে স্থান দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দাও, তাকে এগিয়ে দাও।" কেবল তাদেরই রেখেছিলেন। আজও তাঁদের মধ্যে একজন মহাপুরুষ ধারকুণ্ডীতে আছেন, একজন অনুসুইয়াতে, দু-তিনজন অন্যত্রও আছেন। এঁরাই বাস্তবিকরূপে সদ্‌গুরুর কুলে স্থান পেয়েছিলেন। এরূপ মহাপুরুষের সান্নিধ্য-লাভ অতি দুর্লভ।

তত্র তং বুদ্ধিসংয়োগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।। ৪৩।।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পূর্বজন্মে যে সাধন করেছিলেন সেই বুদ্ধির সংযোগকে সেখানে অনায়াসেই লাভ করেন এবং হে কুরুনন্দন! তার প্রভাবে তিনি পুনরায় **'সংসিদ্ধৌ'**- ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন করেন।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে।। ৪৪।।

শ্রীমানের গৃহে বিষয়ের বশীভূত হয়েও তিনি পূর্বজন্মের সেই অভ্যাসদ্বারা ভগবৎপথের দিকে আকর্ষিত হন এবং যোগে শিথিল প্রযত্নশীল সেই জিজ্ঞাসু ও বাণীর বিষয়কে পার করে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হন। এটাই তাঁর প্রাপ্তির উপায়। এক জন্মে কেউ লাভ করেনও না।

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ৪৫।।

অনেক জন্ম থেকে প্রযত্নশীল যোগী পরমসিদ্ধি লাভ করেন। যিনি প্রযত্নপূর্বক অভ্যাস করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেন। এটাই প্রাপ্তির ক্রম। সর্বপ্রথম শিথিল প্রযত্নদ্বারা যোগের আরম্ভ হয়, মন বিচলিত হয়ে পথভ্রষ্ট হলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়, পরে সদ্গুরুর কুলে প্রবেশ পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক জন্মে অভ্যাসে প্রবৃত্ত থেকে সেখানেই পৌঁছান, যাকে পরমগতি, পরমধাম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই যোগে বীজের নাশ হয় না। আপনি এই পথে শুধু দু-পা চলুন, সেই সাধনের কখনও নাশ হবে না। যে কোন পরিস্থিতিতে পুরুষ এতটা নিশ্চয়ই করতে পারেন, কারণ অল্প সাধন নানা পরিস্থিতিতে ঘিরে থাকে যে ব্যক্তি সেই করতে পারে, কারণ তার সময় নেই। আপনি কালো, ফর্সা যা-ই হোন, এই পৃথিবীতে কোথাও আপনার বসতি হোক, এই গীতাশাস্ত্র সকলের জন্য। আপনার জন্যও, শর্ত এই যে, আপনি মানুষ হবেন। উৎকট প্রযত্নশীল যিনি হোন; কিন্তু শিথিল প্রযত্নশীল কেবল গৃহস্থই হয়। গীতা গৃহস্থ-বৈরাগ্যবান্, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সর্বসাধারণ মানুষমাত্রের জন্য। শুধু সাধু নামের বিশেষ প্রাণীর জন্য নয়। শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নির্ণয় করলেন–

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন।। ৪৬।।

যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীগণ অপেক্ষা এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব অর্জুন! তুমি যোগী হও।

তপস্বী– তপস্বী মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযম করে যোগ স্থিতিতে পৌঁছাবার জন্য তপস্যা করেন। এখনও যোগযুক্ত হননি।

কর্মী– কর্মী এই নিয়ত কর্মকে জেনে তাতে প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজের সামর্থ্যের বিবেচনা না করেই প্রবৃত্ত হন এবং সমর্পণের ভাব নিয়েও প্রবৃত্ত হন না। কর্ম করেন মাত্র।

জ্ঞানী– জ্ঞানমার্গী সেই নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া-বিশেষ উত্তমরূপে অবগত হয়ে, নিজের ক্ষমতা বিবেচনা করে তাতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর লাভ-লোকসানের দায়িত্ব তাঁর নিজের উপরই থাকে। তাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলেন।

যোগী– নিষ্কাম কর্মযোগী ইষ্টের উপর নির্ভর করে, পূর্ণসমর্পণের সঙ্গে সেই নিয়ত কর্ম 'যোগসাধনা'তে প্রবৃত্ত হন। তাঁর যোগক্ষেমের দায়িত্ব স্বয়ং ভগবান্ এবং যোগেশ্বর বহন করেন। পতনের পরিস্থিতি এলেও তাঁর পতনের ভয় নেই, কারণ যে পরমতত্ত্ব লাভের তিনি ইচ্ছুক, সেই পরমতত্ত্ব তাঁর সব ভারবহন করেন।

তপস্বী নিজেকে যোগযুক্ত করবার জন্য প্রযত্নশীল। কর্মী শুধু কর্ম জেনেই এতে প্রবৃত্ত। উভয়েরই পতনের সম্ভবনা অধিক; কারণ এদের মধ্যে সমর্পণের ভাব থাকে না এবং নিজের লাভ-লোকসান বুঝবার ক্ষমতাও নেই; কিন্তু জ্ঞানী যোগের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত, নিজের সামর্থ্য বোঝেন, তাঁর সব ভার তাঁর নিজের উপরই থাকে। এবং নিষ্কাম কর্মযোগী নিজেকে ইষ্টের উপর ছেড়ে দেন, এই ভেবে যে, ইষ্টদেবই সব ভার, সব দায়িত্ব নেবেন। পরমকল্যাণের পথে উভয়েই ঠিক চলেন; কিন্তু যাঁর সবভার ইষ্ট নেন, তিনি এদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ প্রভু তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর লাভ-লোকসান সবকিছু প্রভু দেখেন, সেইজন্য যোগী শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য অর্জুন ! তুমি যোগী হও। সমর্পণের সঙ্গে যোগের আচরণ ক'র।

যোগী শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি অন্তর থেকে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসঙ্গে বলছেন–

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। ৪৭।।

সম্পূর্ণ নিষ্কাম কর্মযোগীগণের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাবিভোর হয়ে অন্তর থেকে, অন্তর্চিন্তনদ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করেন, সেই যোগী পরমশ্রেষ্ঠ, এটা আমার অভিমত। ভজন আড়ম্বর অথবা প্রদর্শন নয়। আড়ম্বর অথবা প্রদর্শনে সমাজ অনুকূল হতে পারে; কিন্তু প্রভু প্রতিকূল হয়ে যান। ভজন অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা' অন্তঃকরণ থেকেই হয়। এর উত্থান-পতন অন্তঃকরণের উপর নির্ভর করে।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ফলের আশা-ত্যাগ করে যিনি 'কার্যম্ কর্ম' অর্থাৎ করণীয় প্রক্রিয়া-বিশেষের আচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং সেই কর্মের কর্তা বাস্তবিক যোগী। সকলক্রিয়া ত্যাগী অথবা অগ্নিত্যাগী যোগী অথবা সন্ন্যাসী হন না। সংকল্প-ত্যাগ না করলে কোন পুরুষ যোগী অথবা সন্ন্যাসী হতে পারেন না। 'আমি সকল্প করি না' বললেই সংকল্প-ত্যাগ হয় না। যিনি যোগে আরূঢ় হতে চান, তাঁকে সর্বদা 'কার্যম্ কর্ম'-এর আচরণে তৎপর থাকা উচিত। এই কর্মে অনবরত নিযুক্ত থাকলেই একদিন যোগী যোগারূঢ় হন এবং তখনই সর্বসঙ্কল্পের অভাব হয়, এর পূর্বে নয়। সর্বসংকল্পের অভাবই সন্ন্যাস।

যোগেশ্বর পুনরায় বলছেন যে, আত্মা অধোগতিতে যায় এবং তার উদ্ধারও হয়। যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মন জয় করেছেন, তাঁর আত্মা তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে এবং পরমকল্যাণকর হয়। যিনি জয় করেননি, তাঁর আত্মা তাঁরজন্য শত্রু হয়ে শত্রুতা করে, যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব মানুষের উচিত যাতে আত্মা অধোগতিতে না যায় তার চেষ্টা করা, উদ্ধারের জন্য কর্ম করা উচিত।

যোগেশ্বর ভগবৎ প্রাপ্তযোগীর স্থিতি স্পষ্ট করলেন। 'যজ্ঞস্থান', উপবেশন করবার আসন ও উপবেশনের নিয়ম সম্বন্ধে তিনি বললেন যে, স্থান যেন নির্জন ও পবিত্র হয়। বস্ত্র, মৃগচর্ম অথবা কুশাসনের মধ্যে যে কোন একটা হওয়া উচিত। কর্মের অনুরূপ চেষ্টা, যুক্তাহার-বিহার, নিদ্রা-জাগরণের সংযমের উপর তিনি জোর দিলেন। যোগীর নিরুদ্ধ চিত্তের উপমা তিনি বায়ুশূণ্য স্থানের অকম্পিত প্রদীপ-শিখার সঙ্গে দিলেন। এবং এই প্রকার নিরুদ্ধ চিত্তও যখন বিলীন হয়ে যায়, তখন তিনিই যোগের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ অসীম আনন্দ লাভ করেন। সংসারের সংযোগ-বিয়োগ শূণ্য অনন্তসুখকে মোক্ষ বলে। যোগের অর্থ হ'ল তার সঙ্গে মিলন। যিনি এর সঙ্গে একীভূত হন, তিনি সমদর্শী হন। নিজের আত্মা যেরূপ, সেইরূপ সকলের আত্মাকে দেখেন। তিনি পরম পরাকাষ্ঠারূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। অতএব যোগ আবশ্যক। মন যেখানেই যাক, সেখান থেকেই আকর্ষণ করে বার বার একে নিরুদ্ধ করবার প্রযত্ন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করলেন যে মনকে বশীভূত করা কঠিন, কিন্তু একে বশীভূত করা সম্ভব। মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত হয়। শিথিল প্রযত্নশীল

ব্যক্তিও বহুজন্মের অভ্যাসের পর সেখানেই পৌঁছান, যাকে পরমগতি অথবা পরমধাম বলে। তপস্বীগণ, জ্ঞানমার্গীগণ এবং কেবল কর্মীগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য অর্জুন! তুমি যোগী হও। সমর্পণের সঙ্গে অন্তর থেকে যোগের আচরণ কর। প্রস্তুত অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখরূপে যোগ-প্রাপ্তির জন্য অভ্যাসের উপর জোর দিলেন। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে 'অভ্যাসযোগো' নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।। ৬।।

এইরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'অভ্যাসযোগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'অভ্যাসযোগো' নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।।৬।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'অভ্যাস যোগ' নামক ষষ্ঠম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ।।

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে গীতার সকল প্রমুখ প্রশ্নের প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম এবং যজ্ঞের স্বরূপ এবং তার বিধি, যোগের বাস্তবিক স্বরূপ এবং তার পরিণাম এবং অবতার, বর্ণসঙ্কর, সনাতন, আত্মস্থিত মহাপুরুষেরও লোকহিতার্থে কর্ম করবার উপর জোর, যুদ্ধ ইত্যাদির উপর বিশদ চর্চা করা হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নগুলিরই সঙ্গে সম্বন্ধিত বহু পূরক প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, যেগুলির সমাধান এবং অনুষ্ঠান আরাধনাতে সহায়ক সিদ্ধ হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে যোগেশ্বর এই বলে প্রশ্নের স্বয়ং বীজারোপণ করেছেন যে, '**মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা**'– আমাতে উত্তমরূপে স্থিত অন্তঃকরণযুক্ত যোগী অতিশয় শ্রেষ্ঠ, এটা আমার অভিমত। পরমাত্মায় উত্তমরূপে স্থিতি অবস্থা কি? অনেক যোগী পরমাত্মাকে লাভ করেন ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও কোন অপূর্ণতা তাঁরা অনুভব করেন। এরূপ অবস্থা লাভ কখন হয়, যখন লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না? সম্পূর্ণভাবে কখন পরমাত্মাকে জানা যায়? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।। ১।।

পার্থ! তুমি আমাতে আসক্ত মনযুক্ত, বাহ্য নয় বরং '**মদাশ্রয়ঃ**'- অর্থাৎ মৎপরায়ণ হয়ে, যোগে সংযুক্ত (ত্যাগ করে নয়) আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর। যা জানবার পর লেশমাত্রও সংশয় থাকবে না। বিভূতিসকলকে সমগ্রভাবে জানবার উপর পুনরায় জোর দিলেন–

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।। ২।।

আমি তোমাকে এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বলব। যজ্ঞ সমাপনের পর যজ্ঞ থেকে যে অমৃততত্ত্বের সৃষ্টি হয়, সেই অমৃততত্ত্বের প্রাপ্তির সঙ্গে প্রাপ্ত অনুভবকে জ্ঞান বলে। পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে জানাই জ্ঞান। মহাপুরুষ একসঙ্গে সর্বত্র কার্য করবার যে ক্ষমতা লাভ করেন, তা' বিজ্ঞান। তাহলে সেই প্রভু একসঙ্গে সকলের হৃদয়ে কিভাবে কার্য করেন? কিভাবে নিয়ন্ত্রণ, করে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে স্বরূপে পৌঁছিয়ে দেন? তাঁর এই কার্যপ্রণালীর নাম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বলব, যা জানবার পর (শুনে নয়) সংসারে আর কিছু জানা বাকী থাকবে না। তাঁকে জানে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম–

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।। ৩।।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আমার প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নশীল হন এবং ঐ প্রযত্নশীল যোগীগণের মধ্যেও কোন বিরল পুরুষই আমাকে তত্ত্বের (সাক্ষাৎকারের) মাধ্যমে জেনে থাকেন। এই সমগ্র তত্ত্বকে জানা যাবে কিরূপে? একস্থানে পিণ্ডরূপে বিদ্যমান অথবা সর্বত্রব্যাপ্ত? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। ৪।।

অর্জুন! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার-এই আটভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। এটাই অষ্টধা মূল প্রকৃতি।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।। ৫।।

'ইয়ম্' অর্থাৎ এই আট প্রকারের আমার অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড় প্রকৃতি। মহাবাহু অর্জুন! যেটা এর থেকে ভিন্ন সেটা আমার জীবরূপ 'পরা' অর্থাৎ চৈতন্য প্রকৃতি জানবে, যে শক্তি সারা জগৎ ধারণ করে আছে, সে হল জীবাত্মা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় এও প্রকৃতি।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। ৬।।

অর্জুন! এমন জান যে সমস্ত ভূত '**এতদ্যোনীনি**'- এই মহাপ্রকৃতি, এই দুই প্রকৃতি পরা ও অপরা থেকেই উৎপন্ন হয়। এই দুটিই হল একমাত্র যোনি। আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়রূপ অর্থাৎ মূলকারণ। জগতের উৎপত্তি আমার থেকে হয় এবং (প্রলয) বিলযও আমাতেই হয়। প্রকৃতি যতক্ষণ বিদ্যমান ততক্ষণ আমিই তার উৎপত্তি এবং যখন কোন মহাপুরুষ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চলে যান, তখন মহাপ্রলয়ও আমি, যা' অনুভবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয়ের প্রশ্নকে মানব সমাজ কৌতুহলের সঙ্গে দেখেছে। বিশ্বের বহুশাস্ত্রে একে কোন না কোন ভাবে বুঝবার প্রয়াস চলে আসছে। কেউ বলে—প্রলয়ে সংসার মজ্জমান হয়, তো কারও মত অনুসারে সূর্য পৃথিবীর এত কাছে চলে আসে যে পৃথিবী জ্বলে শেষ হয়ে যায়। কেউ একেই প্রলয় (কয়ামত) বলে, যে এই দিন সকলের নির্ণয সুনান হয়, তো কেউ নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়ের গণনাতে ব্যস্ত আছে; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে প্রকৃতি অনাদি, পরিবর্তন হয়েই চলেছে; কিন্তু কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের অনুসারে মনু প্রলয় দেখেছিলেন। তার সঙ্গে এগারোজন ঋষি মৎস্য শৃঙ্গে নৌকা বেঁধে হিমালয়ের এক উত্তুঙ্গ শিখরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। লীলাকার শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এবং জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত তাঁর সমকালীন শাস্ত্র ভাগবতে মৃকণ্ডু মুনির পুত্র মার্কণ্ডেয়জী প্রলয়ের যে দৃশ্য সচক্ষে দেখেছিলেন তার বর্ণনা নিম্নে প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি হিমালয়ের উত্তরে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বাস করতেন।

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের অনুসারে শৌনকাদি ঋষিগণ সূতজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি মহাপ্রলয়ের সময় বটপাতার

উপরে ভগবান্ বালমুকুন্দের দর্শন করেছিলেন; কিন্তু তিনি আমাদেরই বংশের ছিলেন, আমাদের থেকে কিছুসময় পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মের পর কোন প্রলয় ঘটেনি এবং সৃষ্টিও লোপ পায়নি। সবকিছু আগেকার মতই আছে, তাহলে তিনি কিরূপ প্রলয় দেখেছিলেন?

সূতজী বলছেন যে, মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে নরনারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেছিলেন যে, আমি আপনার মায়া কি তা দেখতে চাই, যার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই আত্মা অনন্ত যোনিতে ভ্রমণ করে। ভগবান্ স্বীকার করেছিলেন তাঁর প্রার্থনা। একদিন যখন মুনি নিজের আশ্রমে ভগবানের চিন্তনে তন্ময় ছিলেন তখন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, চারদিক্ থেকে সমুদ্র স্ফীত হয়ে উত্তালরূপে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। তাতে কুমীর লাফাচ্ছে। তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঋষি মার্কণ্ডেয় বাঁচবার জন্য দিক্ভ্রান্ত হয়ে ছুটছেন। আকাশ, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্রমা, স্বর্গ, জ্যোতির্মণ্ডল সবকিছু সেই সমুদ্রে প্লাবিত হচ্ছে। এমন সময় মার্কণ্ডেয় ঋষি এক বটবৃক্ষ এবং তার পাতায় এক শিশুকে দেখতে পেয়েছিলেন, শ্বাসের সঙ্গে তিনি শিশুর উদরে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের আশ্রম, সূর্যমণ্ডল এবং সৃষ্টি জীবন্ত দেখতে পেয়েছিলেন এবং নিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায় শিশুর উদর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ খোলার পর মার্কণ্ডেয় ঋষি নিজেকে সেই আশ্রমের মধ্যেই নিজের আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন।

স্পষ্ট হ'ল যে কোটি বছর ভজনের পর মুনি ঈশ্বরীয় দৃশ্য নিজের হৃদয়ে, অনুভবে দেখেছিলেন। বাইরে যেমনটি ছিল তেমনিই রইল। অতএব যোগীর হৃদয়েই প্রলয়, ঈশ্বর লাভ করবার উপায়। ভজন শেষ হয়ে গেলে যোগীর হৃদয়ে সংসারের প্রবাহ বিনষ্ট হয়ে কেবলমাত্র পরমাত্মার চিন্তাটুকু থেকে যায়। এই হল প্রলয়। বাইরে প্রলয় হয় না। শরীর থাকাকালীনই অদ্বৈত অবস্থার অনির্বচনীয় স্থিতিকে মহাপ্রলয় বলে। এটা ক্রিয়াত্মক। কেবল বুদ্ধিদ্বারা যারা নির্ণয় করে, তারা কেবল ভ্রম সৃষ্টি করে। তাতে আমি হই অথবা আপনি। এই প্রসঙ্গে আরও দেখুন–

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। ৭।।

ধনঞ্জয়! আমা-ছাড়া কিঞ্চিন্মাত্র অন্য বস্তু নেই। যেমন সুতোয় মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনি সমগ্র জগৎ আমাতে অনুস্যূত। তা' অবিচ্ছিন্ন কখন জানা যায়? যখন (বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক অনুসারে) অনন্য আসক্তি (ভক্তি) দ্বারা আমার প্রতি নিষ্ঠাবান্ হয়ে যোগে সেইরূপ প্রবৃত্ত হবেন। এছাড়া সম্ভব নয়। যোগে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষুঃ।। ৮।।

কৌন্তেয়! জলে আমি রস, চন্দ্রে ও সূর্যে প্রকাশ, চারি বেদে ওঁকার। (ও + অহং + কার) স্বয়ং আকার। আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য মধ্যে পুরুষত্ব রূপে বিরাজ করি। এবং আমি–

পুণ্যে গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।। ৯।।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ এবং অগ্নিতে দীপ্তি। সর্বভূতে জীবন ও তপস্বিগণের মধ্যে তপঃশক্রিরূপে বিরাজ করি।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।। ১০।।

পার্থ! তুমি আমাকে সকলভূতের সনাতন কারণ অর্থাৎ বীজ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃ স্বরূপ। এই ক্রমে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ।। ১১।।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! বলবানগণের কামনা ও আসক্তিশূণ্য বল আমি। সংসারে সকলেই শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করে। কেউ ডন-বৈঠক লাগায়, কেউ পরমাণু একত্র করে; কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, কাম ও রাগের ঊর্ধ্বে যে বল,

সেই বল আমি। তাই বাস্তবিক বল। সর্বভূতে ধর্মের অনুকূল কামনা আমি। পরব্রহ্ম পরমাত্মাই একমাত্র ধর্ম, যিনি সকলকে ধারণ করে স্থিত। শাশ্বত আত্মাই ধর্ম, তার অবিরোধী কামনা আমি। পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন ! আমাকে লাভ করবার ইচ্ছা কর। সমস্ত কামনাগুলি বর্জিত; কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তির কামনা আবশ্যক, অন্যথা আপনি সাধন কর্মে প্রবৃত্ত হবেন না। এরূপ কামনাও আমারই কৃপা।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২।।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ থেকে উৎপন্ন আরও যে সমস্ত ভাব আছে, তা তুমি আমা থেকেই উৎপন্ন জানবে। পরন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে আমি এবং তারা আমাতে নেই। কারণ আমি তাদের প্রতি অনুরক্ত নই এবং তারাও আমাতে স্থিত নয়; কারণ আমার কর্মে স্পৃহা নেই। আমি নির্লিপ্ত, এই ভাবগুলি থেকে আমার কিছুই লাভ করার নেই, সেইজন্য আমাতে প্রবেশ করতে পারে না। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও–

যেরূপ আত্মার উপস্থিতিতেই দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব হয়, আত্মার অন্ন অথবা জলে কোন প্রয়োজন নেই, সেইরূপ প্রকৃতি পরমাত্মার উপস্থিতিতেই নিজের কাজ করতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা প্রকৃতির গুণ এবং কার্য থেকে নির্লিপ্ত থাকে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩।।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক- এই ত্রিগুণের কার্যরূপ ভাবের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ মোহমুগ্ধ হয়ে আছে। এই কারণে লোকে ত্রিগুণাতীত, অবিনাশীরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে না। আমি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ যতক্ষণ এই ত্রিগুণের যৎসামান্য আবরণও বিদ্যমান, ততক্ষণ কেউ আত্মাকে জানতে পারে না। তার পথ চলা বাকী, এখনও সে পথিক। এবং–

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪।।

এই তিনগুণের সঙ্গে সংযুক্ত আমার অদ্ভুত মায়া দুস্তর; কিন্তু যে পুরুষ নিরন্তর আমারই ভজনা করেন, তারা এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। এটা দৈবী মায়া, পরন্তু ধূপ-ধূনা দিয়ে এর পূজা আরম্ভ করে দেবেন না যেন। উত্তীর্ণ হতে হবে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫।।

যিনি নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনি জানেন। তবুও লোকে ভজনা করে না। মায়াদ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, যারা আসুর স্বভাব আশ্রয় করেছে, মনুষ্যগণের মধ্যে নিকৃষ্ট, কাম-ক্রোধাদি দুষ্কর্মকারী যারা, ঐ মূঢ়ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করে না। তাহলে কে ভজনা করে?—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। ১৬।।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! **'সুকৃতিনঃ'**- উত্তম অর্থাৎ নিয়ত কর্মের (যার পরিণাম স্বরূপ শ্রেয়লাভ হয়, সেই কর্মের) যিনি আচরণ করেন, **'অর্থার্থী'** অর্থাৎ সকাম, **'আর্তঃ'** অর্থাৎ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক, **'জিজ্ঞাসুঃ'** অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে জানতে ইচ্ছুক এবং **'জ্ঞানী'** অর্থাৎ যিনি প্রবেশের স্থিতিযুক্ত- এই চারপ্রকার ভক্তগণ আমার ভজনা করেন।

যার দ্বারা আমাদের দেহ অথবা অন্য যাবতীয় সম্বন্ধের পূরণ হয় তা হল 'অর্থ'। সেইজন্য অর্থ, কামনা সবকিছু আগে ভগবানের দ্বারা পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমিই পূরণ করি; কিন্তু এটুকুই বাস্তবিক অর্থ নয়। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি, একেই অর্থ বলে।

সাংসারিক অর্থের পূর্তি করতে করতে ভগবান বাস্তবিক অর্থ আত্মিক সম্পত্তির দিকে এগিয়ে দেন; কারণ তিনি জানেন যে, এইটুকুতেই আমার ভক্ত সুখী হবে না। সেইজন্য তিনি আত্মিক সম্পত্তিও তাকে প্রদান করতে থাকেন। **'লোক লাহু পরলোক নিবাহু'**- অর্থাৎ এই লোকে লাভ এবং পরলোকে নির্বাহ, এই দু-ই ভগবানের বস্তু। নিজের ভক্তকে তিনি রিক্ত রাখেন না।

'আর্তঃ'- যে দুঃখী, **'জিজ্ঞাসুঃ'**- সমগ্ররূপে জানবার ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসু আমার ভজনা করেন। সাধনার পরিপক্ক অবস্থাতে দিগ্‌দর্শনের (প্রত্যক্ষ দর্শন) অবস্থাযুক্ত জ্ঞানীও আমার ভজনা করেন। এরূপ চার স্তরের ভক্ত আমার ভজনা করেন, যাদের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞানীও ভক্তই। এদের মধ্যেও—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।। ১৭।।

অর্জুন! এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যেও নিত্য আমাতে একীভাবে স্থিত, অনন্য ভক্তিযুক্ত জ্ঞানী বিশিষ্ট; কারণ সাক্ষাৎকার করে যিনি আমাকে জানেন এইরূপ জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং ঐ জ্ঞানীও আমার অতিপ্রিয়। ঐ জ্ঞানী মৎস্বরূপ—

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।। ১৮।।

যদ্যপি এই চার প্রকারের ভক্তই উদার (কি উদারতা করলেন? আপনি ভক্তি করলে ভগবানের কি কিছু লাভ হয়? ভগবানের কি কিছুর অভাব আছে, যা' আপনি পূর্ণ করে দিয়েছেন? না, প্রকৃত পক্ষে তিনিই উদার, যিনি নিজের আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যান না, যিনি তাকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এইরূপে এঁরা সকলেই উদার।) পরন্তু জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ, এরূপ আমার অভিমত; কারণ সেই স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী ভক্ত সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাতেই স্থিত। অর্থাৎ তিনি আমিই, তিনি আমাতেই স্থিত। আমাতে এবং তাঁতে কোন ভেদ নেই। এই প্রসঙ্গে পুনরায় জোর দিলেন—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।। ১৯।।

অভ্যাস করতে করতে বহু জন্মের পর শেষ জন্মে, প্রাপ্তির জন্মে সাক্ষাৎকার করে 'সমুদায় জীবজগৎ বাসুদেব'- এইরূপ জেনে জ্ঞানী আমার ভজনা করেন। এইরূপ মহাপুরুষ দুর্লভ। তিনি কোন বাসুদেবের প্রতিমা স্থাপন করেন না বরং অন্তরে যে পরমঈশ্বর অধিষ্ঠিত তা অনুভব করেন। ঐ জ্ঞানী মহাপুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ

তত্ত্বদর্শীও বলেছেন। এই মহাপুরুষদ্বারা সমাজের কল্যাণ সংভব। এইরূপ প্রত্যক্ষ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে অতি দুর্লভ।

যখন শ্রেয় এবং প্রেয় (মুক্তি এবং ভোগ) ভগবানের কাছ থেকেই লাভ হয়, তখন সকলেরই একমাত্র ভগবানের ভজনা করা উচিত। তবুও লোকে তাঁর ভজন করে না। কেন? শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীতে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০।।

"সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মা অথবা পরমাত্মাই সবকিছু"- এইরূপ লোকে জানতে পারে না, কারণ ভোগের কামনাদ্বারা তাদের বিবেক অভিভূত হয়েছে, সেইজন্য তারা স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের অর্জিত সংস্কারের স্বভাবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে 'আমি পরমাত্মা' থেকে ভিন্ন অন্য দেবতাগনের এবং তাঁদের জন্য প্রচলিত নিয়মের আশ্রয় নেয়। এখানে 'অন্য দেবতা'র প্রসঙ্গ প্রথমবার এসেছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।। ২১।।

যে যে সকামীভক্ত যে যে দেবতার স্বরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করতে ইচ্ছুক, আমি তাদের শ্রদ্ধা সেই সেই দেবতার প্রতি স্থির করি। আমি স্থির করি, কারণ যদি দেবতার অস্তিত্ব থাকত, তাহলে সেই দেবতাই শ্রদ্ধা স্থির করতেন।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।। ২২।।

সেই পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেব-বিগ্রহের পূজাতে তৎপর হন এবং সেই দেবতার মাধ্যমে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্য লাভ করেন। ভোগ প্রদান করেন কে? আমি প্রদান করি। তাঁর শ্রদ্ধার পরিণাম হ'ল ভোগ, তা কোন দেবতার কৃপা নয়। কিন্তু তিনি ফললাভ তো করেন, তাহলে ক্ষতি কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩।।

পরন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল অস্থায়ী। আজ ফল আছে, তা উপভোগ করবার পর শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্য নাশবান্। দেবোপাসকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেবতাও নাশবান্। দেবতা থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ জগৎ পরিবর্তনশীল এবং মরণধর্মা। আমার ভক্ত আমাকেই লাভ করেন, যা অব্যক্ত 'নৈষ্ঠিকীম্ পরমশান্তি' লাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণের অর্থাৎ দৈবী সম্পদের উন্নতি কর। যেমন যেমন দৈবী সম্পদ্ উন্নত হবে, তেমন তেমন তোমাদেরও উন্নতি হবে। ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে পরমশ্রেয় লাভ কর। এখানে দেবতা সেই দৈবী সম্পদের সমূহ, যাদের মাধ্যমে পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব অর্জন করা হয়। মোক্ষের জন্য দৈবী সম্পদের প্রয়োজন হয়, যার ছাব্বিশটি লক্ষণের নিরুপণ গীতার ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

'দেবতা' হৃদয়ের অন্তরালে পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব অর্জন করতে সাহায্য করে যে সদ্গুণসমূহ, তাদের নাম। এটা অন্তরের বস্তু; কিন্তু কালান্তরে লোকেরা অন্তরের বস্তুকে বাইরে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। মূর্তি গড়ে, কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি করে, যথার্থ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চারটি শ্লোকের মাধ্যমে এই ভ্রান্তি দূর করেছেন। প্রথমবার 'অন্যান্য দেবতা'র নাম উল্লেখ করে তিনি বললেন, দেবতার অস্তিত্বই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যে দেবতার স্বরূপের প্রতি হয়, আমি তাদের শ্রদ্ধা সেই দেবতার প্রতিই স্থির করি এবং ফলও প্রদান করি। সেই ফলও নাশবান্। ফল নষ্ট হয়ে যায়, দেবতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দেবভক্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাঁদের বিবেক লোপ পেয়েছে, সেই মূঢ়গণই অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এও বলেছেন যে, অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করার বিধানই অযৌক্তিক। (নবম অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে এ বিষয়েই বর্ণনা করা হয়েছে।)

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।২৪।।

যদ্যপি দেবতার অস্তিত্ব নেই, যা' ফললাভ হয় তা'ও অস্থায়ী তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তি আমার ভজনা করে না; কারণ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি (পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে

যে, কামনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অভিভূত হয়েছে, তারা) আমার সর্বোত্তম, অবিনাশী এবং পরমপ্রভাব উত্তমরূপে জানে না। সেইজন্য তারা অব্যক্ত পুরুষ আমাকে ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত মানুষ বলে মনে করে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্য দেহধারী যোগী ছিলেন, যোগেশ্বর ছিলেন। যিনি স্বয়ং যোগী এবং অন্যকেও যোগ প্রদান করবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। সঠিক পথে সাধনা করে ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে মহাপুরুষও সেই পরমভাব-এ স্থিত হন। দেহধারী হয়েও তিনি সেই অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত হন; তা সত্ত্বেও কামনাদ্বারা অভিভূত হয়ে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাঁদের সাধারণ ব্যক্তি বলেই মনে করে। সেই মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণ চিন্তণ করে যে, এঁদের জন্ম তো আমাদেরই মত হয়েছে, তাহলে এঁরা ভগবান কি করে হতে পারেন? তাদের এই ধরণের বিচারের দোষ কোথায়? দৃষ্টিপাত করলে তো দেহটাই দেখা যায়। তারা মহাপুরুষের যথার্থ স্বরূপ-দর্শন করতে অসমর্থ হয় কেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকেই শুনুন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫।।

সামান্য ব্যক্তির জন্য মায়া আবরণ স্বরূপ, যার দ্বারা পরমাত্মা সর্বদা আবৃত থাকেন। যোগসাধনা বুঝে এতে প্রবৃত্ত হতে হয়। তার পর যোগমায়া অর্থাৎ যোগক্রিয়াও এক আবরণস্বরূপ। যোগের অনুষ্ঠান করতে করতে এর পরাকাষ্ঠা যোগারূঢ় হওয়ার ক্ষমতালাভ হলে, যে পরমাত্মা অন্তরে স্থিত, তাঁর দর্শন লাভ হয়। যোগেশ্বর বলছেন যে, আমি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা আবৃত। কেবলমাত্র যোগের পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার যথার্থ স্বরূপ দর্শন করতে পারেন। আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, সেইজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তি অজন্মা (যাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না), অবিনাশী (যাঁর নাশ হবে না), অব্যক্ত স্বরূপ (যাঁকে পুনরায় ব্যক্ত হতে হবে না) আমাকে জানে না। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণক নিজের মত মানুষ মনে করেছিলেন। তার পর তিনি দৃষ্টিপ্রদান করলেন যেই, তখন অর্জুন অনুনয়-বিনয়, কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বস্তুতঃ যিনি অব্যক্ত স্থিতি লাভ করেছেন, এরূপ মহাপুরুষকে চিনতে আমরা প্রায়ই অক্ষম। এর পর বললেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।। ২৬।।

অর্জুন! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ –এই তিনকালের সমস্ত ভূতকেই আমি জানি; পরন্তু কেউ আমাকে জানতে পারে না। কেন জানতে পারে না?–

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।। ২৭।।

ভরতবংশীয় অর্জুন! ইচ্ছা এবং দ্বেষ অর্থাৎ রাগ এবং দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের মোহদ্বারা সংসারের সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত মোহমুগ্ধ, সেইজন্য আমাকে জানতে পারে না। তাহলে কি কেউ জানবে না? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ।। ২৮।।

পরন্তু পুণ্যকর্মা (যা সংসৃতির নাশ করে, যার নাম কার্যম্ কর্ম, নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া বলে বার বার বুঝিয়েছেন, সেই কর্ম) যে সকল ভক্তগণের পাপনাশ হয়েছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের মোহ থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হয়ে, দৃঢ়ব্রতী হয়ে আমার ভজনা করেন। কেন ভজনা করেন?

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্।। ২৯।।

যাঁরা জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে প্রযত্ন করেন, তাঁরা সেই ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং কর্মসমূহ অবগত হন। এবং এই ক্রমে-

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।। ৩০।।

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে বিদ্যমান আমাকে জানেন, সেই সকল আমাতে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকেই জানেন, আমাতেই স্থিত হন এবং সদাই আমাকে লাভ করে থাকেন। ২৬ ও ২৭শ শ্লোকে তিনি বলেছেন

যে, আমাকে কেউ জানে না, কারণ তারা মোহমুগ্ধ; কিন্তু যাঁরা সেই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যত্নশীল, তাঁরা (১) সম্পূর্ণ ব্রহ্ম, (২) সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, (৩) সম্পূর্ণ কর্ম, (৪) সম্পূর্ণ অধিভূত, (৫) সম্পূর্ণ অধিদৈব এবং (৬) সম্পূর্ণ অধিযজ্ঞসহিত আমাকে জানেন অর্থাৎ এই সমস্তের পরিণাম আমি (সদ্‌গুরু)। তাঁরাই আমাকে জানেন, এমন নয় যে কেউ জানে না।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, অনন্যভাবে আমার শরণাগত হয়ে, আমার আশ্রিত হয়ে যিনি যোগে প্রবৃত্ত হন, তিনি সমগ্ররূপে আমাকে জানেন। আমাকে জানবার জন্য শত-সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন একজন ব্যক্তিই প্রযত্ন করেন এবং এঁদের মধ্যেও কোন কোন পুরুষই আমাকে জানেন। তিনি আমাকে কেবল পিণ্ডরূপে এক দেশীয় নয় বরং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখেন। অষ্টভেদযুক্ত আমার জড়-প্রকৃতি এবং এর অন্তরালে জীবরূপ আমার চেতন প্রকৃতি বিদ্যমান। উভয়ের সংযোগে এই সম্পূর্ণ জগৎ টিকে আছে। আমিই তেজ এবং শক্তিরূপে বিদ্যমান। রাগ এবং কামমুক্ত যে শক্তি এবং যা' ধর্মানুকূল কামনা, তা আমি। যেমন সমস্ত বিষয়-কামনা বর্জিত, কিন্তু আমার প্রাপ্তির জন্য কামনা কর। এইরূপ ইচ্ছার অভ্যুদয় হওয়া আমার কৃপা। কেবল পরমাত্মাকে লাভ করার কামনাই হ'ল ধর্মের অনুকূল কামনা।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি ত্রিগুণাতীত। পরম-এর স্পর্শ করে পরমভাব-এ স্থিত; কিন্তু ভোগে আসক্ত মূঢ়ব্যক্তিগণ আমার ভজনা না করে অন্য দেবতাগণের উপাসনা করে, যদ্যপি দেবতার অস্তিত্ব নেই। তথাপি পাথর, জল, গাছ যা' কিছুকে তারা পূজা করে, তাদের শ্রদ্ধা সেই বস্তুতেই আমি স্থির করি। অন্তরালে থেকে আমিই ফল প্রদান করি; কারণ সেখানে কোন দেবতা নেই, সেইজন্য তাদের কাছে কোন ভোগ্য বস্তুও নেই। লোকে আমাকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করে আমার ভজনা করে না; কারণ আমি যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারা আবৃত। অনুষ্ঠান করে যোগমায়ার আবরণ ভেদ করেই দেহধারী আমাকে অব্যক্তরূপে জানা সম্ভব, অন্য স্থিতিতে নয়।

আমার ভক্ত চার প্রকারের–অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। চিন্তন করতে-করতে বহু জন্মের পর শেষের জন্মে প্রাপ্তিযুক্ত জ্ঞানী আমারই স্বরূপ অর্থাৎ বহু জন্ম ধরে চিন্তন করে সেই ভগবৎ স্বরূপ লাভ করা যায়। রাগ-দ্বেষে মোহাক্রান্ত

ব্যক্তি আমাকে কখনও জানতে পারে না; কিন্তু রাগ-দ্বেষের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যিনি নিয়ত কর্মের (সংক্ষেপে আরাধনা বলা যেতে পারে) চিন্তন করে জরা-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযত্নশীল, সেই পুরুষ সমগ্রভাবে আমাকে জানতে পারেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, সম্পূর্ণ অধিদৈব, সম্পূর্ণ কর্ম এবং সম্পূর্ণ যজ্ঞসহিত আমাকে জানেন। তিনি আমাতে স্থিত হন এবং মৃত্যুকালেও আমাকেই জানেন অর্থাৎ পুনরায় কখনও তিনি বিস্মৃত হন না।

বর্তমান অধ্যায়ে সমগ্রভাবে পরমাত্মাকে জানার বিবেচনা করা হয়েছে অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'সমগ্রবোধঃ' নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ।।৭।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্বাদে 'সমগ্রবোধ' নামক সপ্তম অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'সমগ্রবোধঃ' নাম সপ্তমোহধ্যায়।।৭।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'সমগ্রবোধ' নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, পুণ্যকর্ম (নিয়ত কর্ম, আরাধনা) করেন যাঁরা সেই যোগীগণ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সেই ব্যাপ্ত ব্রহ্মকে জানেন, অর্থাৎ কর্ম এমন যা' এই ব্যাপ্ত ব্রহ্মকে জানবার সুযোগ এনে দেয়। কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষগণ ব্যাপ্ত ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ কর্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, সম্পূর্ণ অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞসহিত আমাকে জানেন। অতএব কর্ম এই সমস্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এমনকি শেষ সময়েও তাঁরা আমাকেই জানেন। তাঁদের আমাকে জানা কখনও বিস্মৃত হয় না।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই সেই শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।। ১।।

হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈব কাকে বলে?

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।। ২।।

হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে এই দেহে অবস্থিত? প্রমাণিত হল যে, অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা কোন এমন পুরুষ, যে মনুষ্য শরীরের আধারযুক্ত। সমাহিত চিত্তযুক্ত পুরুষগণদ্বারা অন্ত সময়ে আপনি কিভাবে অবগত হন? এই সাতটি জিজ্ঞাসার ক্রমানুসারে সমাধান করবার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।। ৩।।

'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং'- যিনি অক্ষয়, যাঁর ক্ষয় হয় না, তাঁকেই পরব্রহ্ম বলে। **'স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে'**- স্বয়ং-এ স্থিরভাবই অধ্যাত্ম অর্থাৎ এটাই আত্মার আধিপত্য। এর পূর্বে সকলেই মায়ার আধিপত্যে অবস্থান করে; কিন্তু যখন 'স্ব'-ভাব অর্থাৎ স্বরূপে স্থির ভাব (স্বয়ং-এ স্থিরভাব) লাভ হয়, তখন আত্মার আধিপত্য তার উপর আরোপ হয়। এটাই অধ্যাত্ম এই হ'ল অধ্যাত্মের পরাকাষ্ঠা। **'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ'**- ভূতগণের সেই ভাব, যা' কিছু না কিছু উদ্ভব করে অর্থাৎ প্রাণীগণের সেইসব সঙ্কল্প, যা' ভাল অথবা মন্দ সংস্কারের রচনা করে, তাদের বিসর্গ অর্থাৎ বিসর্জন, সে সমস্ত বিলুপ্ত হওয়াই কর্মের পরাকাষ্ঠা। এটাই সম্পূর্ণ কর্ম, যার জন্য যোগেশ্বর বলেছিলেন-'তিনি সম্পূর্ণ কর্মের জ্ঞাতা।' কর্ম তখনই সম্পূর্ণ হয়, এর পরে এর প্রয়োজন হয় না। (নিয়ত কর্ম) এই অবস্থাতে ভূতগণের সেই ভাবগুলি, যেগুলি কিছু না কিছু রচনা করতেই থাকে, ভাল অথবা মন্দ সংস্কার তৈরী করে, সে সমস্ত যখন সর্বথা শান্ত হয়, কর্ম তখন সম্পূর্ণ হয়। এর পরে আর কর্মের প্রয়োজন হয় না। অতএব কর্ম তা'ই যা' ভূতগণের সমস্ত সঙ্কল্পকে, যাদের দ্বারা কিছু না কিছু সংস্কারের সৃষ্টি হয়, শান্ত করে দেয়। কর্মের অর্থ (আরাধনা) চিন্তন, যা' যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।। ৪।।

যতক্ষণ অক্ষয়ভাব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ বিনাশশীল সম্পূর্ণ ক্ষরভাব 'অধিভূত' অর্থাৎ ভূতগণের অধিষ্ঠান। সম্পূর্ণ ক্ষরভাবই হ'ল ভূতগণের উৎপত্তির কারণ। **'পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্'**- প্রকৃতির ঊর্ধ্বে পরমপুরুষ স্থিত যিনি, তিনিই অধিদৈব অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেবগণের (দৈবী সম্পদের) অধিষ্ঠাতা। দৈবী সম্পদ্ সেই পরমদেব-এ বিলীন হয়ে যায়। দেহধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! এই মনুষ্য দেহে আমিই 'অধিযজ্ঞ' অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। অতএব এই দেহে, অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত

মহাপুরুষই অধিযজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। যিনি সম্পূর্ণ যজ্ঞের ভোক্তা, অবশেষে যজ্ঞ তাতে সমাহিত হয়। সেই পরমস্বরূপ লাভ হয়। এইরূপে অর্জুনের ছয়টি প্রশ্নের সমাধান করেছেন। এখন শেষ জিজ্ঞাসা যে, শেষ সময়ে কিভাবে আপনাকে জানতে পারা যায়, যে তার পরে আর কখনও বিস্মৃত হন না?

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।৫।।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যিনি মৃত্যুকালে অর্থাৎ নিরুদ্ধ মনের বিলীন হওয়ার সময় আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে পৃথক্ হয়ে যান, তিনি '**মদ্ভাবং**'- সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ লাভ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেহের বিনাশ শুদ্ধ অন্তকাল নয়। মৃত্যুর পরেও দেহের ক্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। প্রারব্ধ ভোগ হয়ে গেলেই মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এবং যখন নিরুদ্ধ মনেরও বিলয় হয়, তখনই শেষসময়, যার পরে দেহ ধারণ করতে হয় না। এটা ক্রিয়াত্মক, কেবল শুনে, বার্তালাপে বোঝা সম্ভব নয়। যতক্ষণ বস্ত্রের মত দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, ততক্ষণ দেহের অন্ত কোথায় হ'ল? নিরুদ্ধ মন এবং যখন নিরুদ্ধ মনেরও বিলয় হয়, তখন দেহ থাকতেই দেহের সম্বন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি মৃত্যুর পরেই এই অবস্থা লাভ হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ হতেন না। তিনি বলেছেন যে, বহু জন্মের অভ্যাসের পর প্রাপ্তিযুক্ত জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ হন। আমি তাঁতে এবং তিনি আমাতে স্থিত হন। তাঁতে ও আমাতে লেশমাত্রও পার্থক্য থাকে না। এটাই জীবিত থাকাকালীন প্রাপ্তি। যখন আর দেহধারণ করতে হয় না, তখন সেটাই দেহের শেষকাল।

এটা বাস্তবিক শরীরান্তের চিত্রণ, যার পরে আর জন্ম হয় না। অন্য শরীরান্ত মৃত্যু, যা' লোক-প্রচলিত; কিন্তু এই শরীরান্তের পর আবার জন্ম হয়–

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।৬।।

কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাবে চিন্তন করতে করতে দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়। তাহলে তো খুব সোজা আদান-প্রদান, আজীবন

আনন্দ করে, মৃত্যুর সময় ভগবানের স্মরণ করে নিলেই হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এরূপ হয় না, '**সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ**'- সেই ভাবেরই চিন্তন করতে সমর্থ হন, যে ভাবের চিন্তন আজীবন করেছেন। আজীবন 'যা' চিন্তন করে এসেছেন, এরই মনের মধ্যে প্রতিফলন হয়। এর অন্যথা হয় না। অতএব–

তস্মাৎসর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যশংশয়ম্।। ৭।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে। নিরন্তর চিন্তন এবং যুদ্ধ একসঙ্গে কিরূপে সম্ভব? নিরন্তর চিন্তন এবং যুদ্ধের স্বরূপ কি তাহলে এরূপ যে, 'জয় কনহৈয়া লাল কী', 'জয় ভগবান কী' বলে বলে শরসন্ধান করতে থাকবেন। কিন্তু স্মরণের স্বরূপ এর পরের শ্লোকে স্পষ্ট করে যোগেশ্বর বলছেন–

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।। ৮।।

হে পার্থ! সেই স্মরণের জন্য যোগাভ্যাসে যুক্ত হয় (আমার চিন্তন এবং যোগের অভ্যাস একে অন্যের পর্যায়) অনন্যগামী চিত্তে নিরন্তর চিন্তন করতে করতে যোগী পরমপ্রকাশস্বরূপ দিব্যপুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন। মনে করুন এই পেন্সিলটি ভগবান, তাহলে এখন এটা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর স্মরণ উচিত নয়। এর আশে-পাশে যদি আপনি বই অথবা অন্য কিছু দেখতে পান, তাহলে আপনার স্মরণ খণ্ডিত হয়ে গেছে। স্মরণ যখন এইরূপ সূক্ষ্ম হয় যে, ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর স্মরণপর্যন্ত হয় না, মনে তরঙ্গও ওঠে না, তাহলে এখন কথা হল যে, স্মরণ এবং যুদ্ধ একসঙ্গে কি করে হবে? বস্তুতঃ যখন আপনি চিত্তকে সবদিক্ থেকে সংযত করে, নিজের একমাত্র আরাধ্যের স্মরণে প্রবৃত্ত হবেন, তখন মায়াময় প্রবৃত্তিরূপে কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ বাধারূপে উপস্থিত হবে। আপনি স্মরণ করে যাবেন, কিন্তু তারা আপনার অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি করবে, আপনার মনকে স্মরণ থেকে বিচলিত করবার চেষ্টা করবে। এই বাহ্য প্রবৃত্তিগুলির পারে যাওয়াই যুদ্ধ। নিরন্তর চিন্তনের সঙ্গেই যুদ্ধ সম্ভব। অর্থাৎ নিরন্তর চিন্তনে প্রবৃত্ত থাকবার চেষ্টা

করে যাওয়াই যুদ্ধ। গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য জগতের যুদ্ধের সমর্থন করে না। চিন্তন কার করা হবে? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯।।

সেই যুদ্ধের সঙ্গে ঐ পুরুষ সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণ করেন যিনি, অচিন্ত্যস্বরূপ (যতক্ষণ চিত্ত এবং চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ তাঁকে দর্শন করা সম্ভব নয়। যখন নিরুদ্ধ চিত্ত বিলীন হয়, তখনই তাঁকে জানা সম্ভব হয়), নিত্য প্রকাশস্বরূপ এবং অবিদ্যার অতীত সেই পরমাত্মার স্মরণ করেন। পূর্বে বলেছেন—আমার চিন্তন করেন, এখানে বলছেন—পরমাত্মার। অতএব সেই পরমাত্মার চিন্তনের (ধ্যানের) মাধ্যম তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ। এই ক্রমেই-

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

ভ্রূবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।। ১০।।

যিনি নিরন্তর সেই পরমাত্মার স্মরণ করেন, সেই ভক্তিযুক্ত পুরুষ **'প্রয়াণকালে'**- মনের বিলয়কালে যোগবলে অর্থাৎ নিয়ত কর্মের আচরণ করে, ভ্রূ-যুগলের মধ্যে প্রাণ উত্তমরূপে স্থাপন করে (প্রাণ-অপানকে সম করে, অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি হবে না, বাহ্য সঙ্কল্পও গ্রহণ করা হবে না, সত্ত্ব, রজ ও তম উত্তম রূপে শান্ত হবে, স্মৃতি ইষ্টে স্থিত হবে, সেইকালে) সেই অচল মন অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি পুরুষ ঐ দিব্যপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করেন। সতত স্মরণীয় যে, সেই একমাত্র পরমাত্মার প্রাপ্তির বিধান যোগ। তাঁর জন্য নিয়ত ক্রিয়ার আচরণই যোগক্রিয়া, যার সবিস্তার বর্ণনা যোগেশ্বর চতুর্থ-ষষ্ঠ অধ্যায়ে করেছেন। এখন তিনি বলছেন, "নিরন্তর আমাকেই স্মরণ কর।" কিরূপে করা হবে? এই যোগ ধারণায় স্থির থেকে করতে হবে। যিনি এইরূপ কর্ম করেন, তিনি সেই দিব্যপুরুষকে লাভ করেন। যিনি আর কখনও বিস্মৃত হন না। এখানে এই জিজ্ঞাসার সমাধান হল যে, প্রয়াণকালে আপনাকে

কিরূপে জানা সম্ভব ? প্রাপ্তযোগ্য পদের চিত্রণ দেখুন, যার উল্লেখ গীতাশাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে–

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি

তত্তে পদং সঙ্গ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১।।

'বেদবিদ্' অর্থাৎ অবিদিত তত্ত্বকে যারা প্রত্যক্ষভাবে জানেন এবং যে পরমপদকে **'অক্ষরম্'**- অক্ষয় বলেন, বীতরাগ মহাত্মা যাতে প্রবেশের জন্য যত্নশীল এবং যে পরমপদ লাভ করবার জন্য ব্রহ্মচর্যের পালন করেন (ব্রহ্মচর্যের অর্থ কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের সংযম নয়, বরং **'ব্রহ্ম আচরতি স ব্রহ্মচারী'**- বাহ্য স্পর্শ মন থেকে ত্যাগ করে নিরন্তর ব্রহ্মের চিন্তন-স্মরণই ব্রহ্মচর্য। এরূপ আচরণে ব্রহ্মের দর্শন, তাঁতে স্থিতি এবং শান্তি লাভ হয়। এই আচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমই নয় বরং সকলেন্দ্রিয় সংযম স্বাভাবিক ভাবে হয়ে যায়। যিনি এইরূপ ব্রহ্মের আচরণ করেন) , যা হৃদয়ে সংগ্রহের যোগ্য, ধারণের যোগ্য, সেই পরমপদের সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। সেই পদ কি ? কিরূপে লাভ হয় ? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মুর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে অর্থাৎ বাসনা থেকে পৃথক্ অবস্থান করে, মন হৃদয়ে স্থিত করে (ধ্যান হৃদয়েই করা হয়, বাইরে নয়। পূজা বাইরে হয় না) প্রাণ অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্যাপারকে মস্তিষ্কে নিরুদ্ধ করে, যোগধারণাতে স্থিত হয়ে (যোগ ধারণ করতে হবে, অন্য উপায় নেই) এইরূপ স্থিত হয়ে–

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩।।

যে পুরুষ **'ওঁ ইতি'**- ওঁ কেবল, যা' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, এর জপ এবং আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, সেই পুরুষ পরমগতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগেশ্বর, পরমতত্ত্বে স্থিত মহাপুরুষ, সদ্গুরু ছিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, 'ওঁ' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, তুমি এর জপ কর এবং আমার ধ্যান কর। প্রাপ্তিযুক্ত প্রত্যেক মহাপুরুষের নাম সেই হয়, যা তাঁরা লাভ করেন, যাঁর মধ্যে তাঁরা বিলীন হন। সেই নাম ওঁ এবং রূপ নিজের বললেন। যোগেশ্বর 'কৃষ্ণ - কৃষ্ণ' জপ করবার নির্দেশ দেননি। কালান্তরে ভাবুকগণ তাঁর নাম জপ করতে শুরু করে দিয়েছেন এবং শ্রদ্ধা অনুসারে ফলও পেয়ে থাকেন; যেমন—মানুষের শ্রদ্ধা যেখানেই হয়, সেখানেই আমি তার শ্রদ্ধা স্থির করি এবং আমিই ফলের বিধানও করি।

ভগবান শিব 'রাম' নাম জপ করবার উপর জোর দিয়েছেন। **'রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ স রামঃ।'**, **'রা অওর ম কে বিচ মেঁ, কবিরা রহা লুকায়।'** রা ও ম এই দুই অক্ষরের অন্তরালে কবীর নিজের মনকে স্থির করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ 'ওঁ' জপ করবার উপর জোর দিচ্ছেন। **'ও অহং স ওঁ'** অর্থাৎ ঐ সত্তা আমার মধ্যে আছেন, বাইরে খুঁজতে শুরু করে দেবেন না যেন। এই 'ওঁ' ও পরম সত্তার পরিচয় প্রদান করে শান্ত হয়ে যায়। বাস্তবে সেই প্রভুর নাম অনন্ত; কিন্তু জপ করবার জন্য সেই নাম সার্থক যা ছোট, শ্বাসে লীন হয়ে যায় এবং পরমাত্মা এক বোধ করিয়ে দেয়। তাঁকে ভুলে বহু দেবী-দেবতার অবিবেকপূর্ণ কল্পনাতে জড়িয়ে লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবেন না।

'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন- "আমার স্বরূপ-চিন্তন করবে এবং শ্রদ্ধা অনুসারে যে কোন দুই-আড়াই অক্ষরের নাম-'ওঁ', 'রাম', 'শিব' এদের মধ্যে থেকে একটা বেছে, তার চিন্তন এবং তারই অর্থস্বরূপ ইষ্টের স্বরূপের ধ্যান করবে।" ধ্যান সদ্গুরুদেবেরই করা হয়। আপনি রাম, কৃষ্ণ অথবা **'বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।'**- বীতরাগ মহাত্মাগণের অথবা **'যথাভিমতধ্যানাদ্বা।' (পাতঞ্জল যোগ০, ১/৩৭, ৩৯)** অভিমত অর্থাৎ যোগের অভিমত, অনুকূল কোন মহাপুরুষের স্বরূপের ধ্যান করুন, তিনি অনুভবে আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং আপনার সমকালীন কোন সদ্গুরুর দিকে এগিয়ে দেবেন, যাঁর মার্গদর্শনে আপনি ধীরে ধীরে প্রকৃতির ক্ষেত্রের পারে চলে যাবেন। আগে আমিও এক দেবতার (শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ) ছবির ধ্যান করতাম; কিন্তু পূজ্য মহারাজজীর ভাবধারায় প্রবাহিত হয়ে তা শান্ত হয়ে গেছে।

প্রারম্ভিক সাধক নাম-জপ করেন ঠিকই; কিন্তু মহাপুরুষের স্বরূপের ধ্যান করতে তাঁরা ইতস্ততঃ বোধ করেন। অর্জিত সংস্কার ত্যাগ করতে পারেন না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্য দেবতার ধ্যান করতে নিষেধ করেছেন। অতএব পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে কোন জ্ঞানী মহাপুরুষের শরণাগত হলেই। পুণ্য-পুরুষার্থ সবল হবে এবং কুতর্কগুলি শান্ত হবে যার ফলে যথার্থ ক্রিয়াতে প্রবেশ লাভ হবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে 'ওঁ'- জপ এবং পরমাত্মস্বরূপ সদ্‌গুরুর স্বরূপের নিরন্তর স্মরণ করলে মন নিরুদ্ধ এবং বিলীন হয়ে যায় এবং তৎক্ষণেই দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল মৃত্যু হলে দেহধারণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪।।

"আমা ব্যতীত কাউকে চিত্তে ঠাঁই দেন না"- অর্থাৎ অনন্য চিত্ত হয়ে যিনি নিরন্তর আমার স্মরণ করেন, সেই নিত্য আমাতে যুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য। আপনি সহজলভ্য হলে কি লাভ ?—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫।।

আমাকে লাভ করলে তাঁদের দুঃখের স্থানস্বরূপ ক্ষণভঙ্গুর পুনর্জন্ম হয় না, বরং পরমসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ আমাকে লাভ করা অথবা পরমসিদ্ধি লাভ করা একই কথা। কেবল তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না, যাঁরা ভগবানকে লাভ করেছেন। তাহলে পুনর্জন্মের সীমা কতদূর পর্যন্ত ?—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। ১৬।।

অর্জুন ! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যু হয় এবং পুনঃপুনঃ এই ক্রমেই চলতে থাকে; কিন্তু কৌন্তেয় ! আমাকে লাভ করলে সেই পুরুষের আর পুনর্জন্ম হয় না।

ধর্মগ্রন্থগুলিতে লোক-লোকান্তরের পরিকল্পনা ঈশ্বর-পথের বিভূতিগুলির বোধ করিয়ে দেয়, যা' হল আন্তরিক অনুভব। অন্তরিক্ষে এমন কোন গর্ত নেই

যেখানে কীট দংশন করে এবং এমন কোন প্রাসাদও নেই যাকে স্বর্গ বলা হয়। দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত পুরুষই দেবতা এবং আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত মানুষই অসুর। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় কংস রাক্ষস এবং বানাসুর দৈত্য ছিল। দেব, মানব, তির্যক্‌ যোনিগুলিই হল বিভিন্ন লোক। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এই জীবাত্মা মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারসমূহের অনুরূপ নতুন দেহ ধারণ করে।

যে দেবতাদের অমর বলা হয়, তারাও মরণধর্মা- '**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**।' এর থেকে বেশী ক্ষতি কি হতে পারে? সেই দেবদেহে কি লাভ, যাতে সঞ্চিত পুণ্য শেষ হয়ে যায়? দেবলোক, পশুলোক, কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত লোক ভোগলোক মাত্র। কেবল মানুষই কর্মের রচয়িতা, যার দ্বারা সে পরমধামপর্যন্ত লাভ করতে সমর্থ হয়, যেখান থেকে পুনরাবর্তন হয় না। যথার্থ কর্মের আচরণ করে মানুষ দেবতা হোক অথবা ব্রহ্মার স্থিতিলাভ করুক; কিন্তু পুনর্জন্মের হাত থেকে ততক্ষণ রেহাই পায় না, যতক্ষণ মন নিরুদ্ধ না হয়, এবং বিলীন হয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে ঐ পরমভাব-এ স্থিত না হয়। উদাহরণার্থ উপনিষদও এই সত্যের উদ্‌ঘাটন করে–

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিস্থিতাঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।। (কঠো০, ২/৩/১৪)

হৃদয়েস্থিত সমস্ত কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তখন মরণধর্মা ব্যক্তি অমর হয়ে যায় এবং এখানে, এই সংসারেই, এই মনুষ্য দেহেই উত্তমরূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভব করে থাকেন।

প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে কি ব্রহ্মাও মরণধর্মা? তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রাপ্তির পরে বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র হয়ে যায়। তাঁর মাধ্যমে পরমাত্মা ব্যক্ত হন। এরূপ মহাপুরুষগণ দ্বারাই যজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে, এবং এখানে বলছেন যে, ব্রহ্মার স্থিতিলাভ করেছেন যিনি, তিনিও প্রত্যাবর্তন করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন?

বস্তুতঃ যে মহাপুরুষগণের মাধ্যমে পরমাত্মা ব্যক্ত হন, সেই মহাপুরুষগণের বুদ্ধিও ব্রহ্মা নয়; কিন্তু উপদেশ দেন ও কল্যাণের সূত্রপাত করেন, সেইজন্য ব্রহ্মা

বলা হয়। তাঁরাও ব্রহ্মা নন। তাঁদের কাছে নিজের বুদ্ধি বলে কিছু থাকে না। কিন্তু এর পূর্বে সাধনাকালে বুদ্ধিই ব্রহ্মা- **'অহংকার শিব বুদ্ধি অজ, মন সসি চিত্ত মহান।' (মানস, ৬/১৫ ক)**

সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ব্রহ্মা নয়। বুদ্ধি যখন ইষ্টে স্থিত হয়, তখনই ব্রহ্মার রচনা হয়, যার চারটি সোপান সম্বন্ধে মনীষীগণ বলেছেন। পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন, স্মরণের জন্য পুনরায় দেখতে পারেন- ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ সেই বুদ্ধিকে বলে, যা ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত। যিনি ব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্বর। ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ সেই বুদ্ধি, যার সাহায্যে পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাতে দক্ষতাই নয়, বরং তার নিয়ন্ত্রক, সঞ্চালক হয়ে যান। ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বুদ্ধির শেষ সীমা, যার মাধ্যমে ইষ্ট প্রবাহিত হন। বুদ্ধির অস্তিত্ব এতদূর পর্যন্তই, কারণ যে ইষ্ট প্রবাহিত হন তিনি ও গ্রহণকর্ত্তা বুদ্ধি এখনও পৃথক্ পৃথক্। এখনও তা প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন স্বয়ং প্রকাশস্বরূপে যখন বুদ্ধি (ব্রহ্মা) থাকে, জাগ্রত থাকলে সম্পূর্ণ ভূত (চিন্তনের প্রবাহ) জাগ্রত থাকে এবং যখন অবিদ্যাতে থাকে, তখন অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। একেই প্রকাশ ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন বলে সম্বোধন করা হয়। দেখুন–

ব্রহ্মবিদ্বেতার সেই শ্রেণীকে ব্রহ্মা বলে, যার মধ্যে ইষ্টের ভাবধারা প্রবাহিত হয়, ইষ্ট লাভ করেও সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে বিদ্যার (যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ তাঁতে বিলীন করে) দিন এবং অবিদ্যার রাত্রি, প্রকাশ এবং অন্ধকারের ক্রম ক্রমাগত চলতে থাকে। এতদূরপর্যন্ত মায়া সাধকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রকাশকালে অচেতন ভূত সচেতন হয়ে যায়, লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং বুদ্ধির অন্তরালে অবিদ্যার রাত্রির প্রবেশকালে সমস্ত ভূত অচৈতন্য হয়ে যায়। বুদ্ধি নিশ্চয করতে পারে না। স্বরূপের দিকে এগোনো বন্ধ হয়ে যায়। এটাই ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রি। দিনের আলোয় বুদ্ধির হাজার হাজার প্রবৃত্তিগুলিতে ঈশ্বরীয় প্রকাশ অনুভব হয় এবং অবিদ্যার রাত্রিতে এই হাজার হাজার স্তরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থার অন্ধকার নেমে আসে।

শুভ এবং অশুভ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা–এই দুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হওয়ার পরে অর্থাৎ অচেতন এবং সচেতন, রাত্রিতে বিলীন এবং দিনে জেগে ওঠা দুই প্রকার ভূতেরই (সঙ্কল্প প্রবাহ) বিলীন হওয়ার পর সেই অব্যক্ত বুদ্ধিরও অতি

ঊর্ধ্বে শাশ্বত অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, যা আর কখনও নষ্ট হয় না। ভূতের অচেতন এবং সচেতন উভয় স্থিতিলোপ পেলেই সেই সনাতন ভাব প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধির উপর্যুক্ত চারটি অবস্থা পার করেই পুরুষ মহাপুরুষ হতে পারে। সেই মহাপুরুষের অন্তরালে বুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধি পরমাত্মার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যায়; কিন্তু উপদেশ দেওয়ার জন্য, প্রেরণা দেওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে বুদ্ধির উপস্থিতি প্রতীত হয়। কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির স্তরের ঊর্ধ্বে চলে যান। তাঁরা পরম অব্যক্ত ভাবে স্থিত হন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু এই অব্যক্ত স্থিতিলাভের আগে যতক্ষণ তাঁদের কাছে নিজ বুদ্ধি থাকে, যতক্ষণ তাঁরা ব্রহ্মা, ততক্ষণ তাঁরা পুনর্জন্মের পরিধির মধ্যে পড়েন। এই তথ্যগুলির উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।। ১৭।।

যাঁরা সহস্র চতুর্যুগের ব্রহ্মার রাত্রি এবং সহস্র চতুর্যুগের তার দিন সম্বন্ধে অবগত হন, সেই পুরুষগণ সময়ের তত্ত্ব যথার্থ জানেন।

প্রস্তুত শ্লোকে দিবা এবং রাত্রি, বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে বলা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যাসংযুক্ত বুদ্ধি ব্রহ্মার প্রবেশিকা এবং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বুদ্ধি ব্রহ্মার পরাকাষ্ঠা। বিদ্যাসংযুক্ত বুদ্ধিই হল ব্রহ্মার দিন। যখন বিদ্যা কার্যরত হয়, তখন যোগী স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান, অন্তঃকরণের শত শত প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রকাশের সঞ্চার হয়। এইরূপ অবিদ্যার রাত্রির আগমনে অন্তঃকরণের হাজার হাজার প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে মায়ার দ্বন্দ্ব প্রবাহিত হয়। প্রকাশ ও অন্ধকারের সীমা এতদূর পর্যন্তই। এর পরে না অবিদ্যা থাকে, না বিদ্যাই থাকে, তখনই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে জানতে পারা যায়। যিনি একে তত্ত্বতঃ উত্তমরূপে জানেন, সেই যোগী কালের তত্ত্বকে জানেন যে, কখন অবিদ্যার রাত্রি হয়? কখন বিদ্যার দিন উপস্থিত হয়? কালের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত অথবা সময়ের হাত থেকে কখন নিস্তার পাওয়া যায়?

প্রারম্ভিক মনীষীগণ অন্তঃকরণকে চিত্ত অথবা কখনও কখনও বুদ্ধি বলে সম্বোধন করেছিলেন। কালান্তরে অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার এই চারটি প্রমুখ বৃত্তিতে বিভাজন করা হয়েছে, যদিও অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি অনন্ত। বুদ্ধির

অন্তরালেই অবিদ্যার রাত্রি বিদ্যমান এবং সেই বুদ্ধিতেই বিদ্যার দিনও বর্তমান। একেই ব্রহ্মার রাত্রি ও দিন বলে। জগৎরূপ রাত্রিতে সমস্ত জীব অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। প্রকৃতিতে ভ্রান্ত হয়ে তাদের বুদ্ধি সেই প্রকাশ স্বরূপকে দেখতে পায় না; কিন্তু যিনি যোগের আচরণ করেন, তিনি চেতনা লাভ করে স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান, যেমন গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিতমানসে লিখেছেন–

কবহুঁ দিবস মহঁ নিবিড়তম, কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।

বিনসই উপজই গ্যান জিমি, পাই কুসঙ্গ সুসঙ্গ।।

(রামচরিতমানস, ৪/১৫ খ)

বিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধি কুসঙ্গে পড়ে অবিদ্যাতে পরিণত হয়। পুনরায় সুসঙ্গলাভ করে সেই বুদ্ধিতেই বিদ্যার সঞ্চার হয়। এই উত্থান-পতন সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বুদ্ধি, ব্রহ্মা, রাত্রি, দিন কিছুই থাকে না। এই হল ব্রহ্মার দিবা-রাত্রির রূপক। হাজার হাজার বছর দীর্ঘরাত্রি হয় না, না হাজার হাজার চতুর্যুগের দিনই হয় এবং চারমুখযুক্ত কোন ব্রহ্মাও নেই। বুদ্ধির উপর্যুক্ত চারটি ক্রমিক অবস্থাই ব্রহ্মার চারটি মুখ এবং অন্তঃকরণের চারটি প্রমুখ প্রবৃত্তিই তার চতুর্যুগ। এই প্রবৃত্তিগুলিতেই রাত্রি ও দিন ঘটে থাকে। যাঁরা এই রহস্য সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অবগত, সেই যোগীগণ কালের রহস্য সম্বন্ধে অবগত যে, কালের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত এবং কোন পুরুষ কালের অতীত হন? দিবা এবং রাত্রি, বিদ্যা এবং অবিদ্যাতে কার্য ঘটে থাকে, তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করছেন-

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।। ১৮।।

ব্রহ্মার দিনের প্রবেশকালে অর্থাৎ বিদ্যা (দৈবী সম্পদ্) র প্রবেশকালে সমস্ত প্রাণী অব্যক্ত বুদ্ধিতে চেতনালাভ করে এবং রাত্রির প্রবেশকালে সেই অব্যক্ত, অদৃশ্য বুদ্ধিতে জাগ্রত সূক্ষ্মতত্ত্ব অচেতন হয়ে যায়। ঐ সমস্ত প্রাণী অবিদ্যার রাত্রিতে স্বরূপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারে না; কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। জাগ্রত হওয়া এবং অচেতন হওয়ার মাধ্যম এই বুদ্ধি, যা সকলের মধে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান, দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।। ১৯।।

হে পার্থ! এইরূপ সমস্ত প্রাণী জাগ্রত হয়ে, প্রকৃতির বশীভূত হয়ে অবিদ্যারূপী রাত্রির সমাগমে অচেতন হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের লক্ষ্য কি? দিনের সমাগমে তারা পুনরায় জাগ্রত। যতক্ষণ বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ এর অন্তরালে বিদ্যা ও অবিদ্যার ক্রমে চলতে থাকে। ততক্ষণ সেই সাধক, মহাপুরুষ নয়।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০।।

এক তো ব্রহ্মা অর্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং এর থেকেও পর সনাতন অব্যক্তভাব, যা সমস্ত ভূতের বিনাশ হলেও বিনাশ হয় না অর্থাৎ বিদ্যাতে সচেতন এবং অবিদ্যাতে অচেতন, দিনে উৎপন্ন এবং রাত্রিতে বিলীন ভাবযুক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মারও বিলীন হবার পরে সেই সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, যার বিনাশ হয় না। বুদ্ধিতে এই উঠা-পড়ার তরঙ্গ যখন শেষ হয়, তখন সনাতন অব্যক্ত প্রাপ্ত হয়, যা আমার পরমধাম। যখন সনাতন অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিও সেই ভাবে ভাবিত হয়, সেই ভাবকেই ধারণ করে। সেইজন্য বুদ্ধি বিলীন হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে সনাতন অব্যক্তভাব শুধু থাকে।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।। ২১।।

সেই সনাতন অব্যক্ত ভাবকে অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী বলা হয়। একেই পরমগতি বলে। ঐ আমার পরমধাম, যা প্রাপ্ত হয়ে মানুষ ফিরে আসে না, তাদের পুনর্জন্ম হয় না। এই সনাতন অব্যক্তভাবের প্রাপ্তির উপায় বলছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্।। ২২।।

পার্থ! যে পরমাত্মার অন্তর্গত সমস্ত ভূতগণ, যার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সনাতন অব্যক্ত ভাবযুক্ত সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়। অনন্য ভক্তির তাৎপর্য হল, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্মরণ না করে তাঁর সঙ্গে

যুক্ত হওয়া। অনন্যভাবে সংযুক্ত পুরুষ কতক্ষণ পুনর্জন্মের সীমার মধ্যে থাকেন এবং কখন তাঁরা পুনর্জন্মের অতিক্রমণ করেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।।২৩।।

হে অর্জুন! যে কালে দেহত্যাগ করলে যোগীগণ পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং যে কালে দেহত্যাগ করলে পুনর্জন্ম লাভ করেন, এখন আমি সেই কালের কথা বলব।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।। ২৪।।

দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করবার সময় যার সমক্ষে জ্যোতির্ময় অগ্নি প্রজ্বলিত, দিনের প্রকাশ বিদ্যমান, সূর্য উজ্জ্বলভাবে আকাশে বিরাজমান, শুক্লপক্ষের চন্দ্র ক্রমবর্দ্ধিত, উত্তরায়ণের নিরভ্র এবং সুন্দর আকাশ থাকে যখন, সেই কালে প্রয়াণ করলে ব্রহ্মবেত্তা যোগীগণ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

অগ্নি ব্রহ্মতেজের প্রতীক। দিন হল বিদ্যার প্রকাশ। শুক্লপক্ষ নির্মলতার দ্যোতক। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তেজ এবং প্রজ্ঞা এই সমস্ত ষড়ৈশ্বর্যকেই ষণ্মাস বলে। ঊর্দ্ধরেতা স্থিতিই হল উত্তরায়ণ। প্রকৃতি পারে এই অবস্থায় যাঁরা পৌঁছেছেন, তাঁরাই, ঐ ব্রহ্মবেত্তা যোগীগণ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু অনন্যচিত্ত যোগীগণ যদি এই জ্যোতিস্বরূপ লাভ না করতে পারেন, যাঁদের সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাঁদের কোন গতি হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।।২৫।।

যার প্রয়াণকালে ধূম আচ্ছন্ন হয়, যোগাগ্নি হয় (অগ্নি যজ্ঞ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অগ্নির স্বরূপ) কিন্তু ধূমদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, অবিদ্যার রাত্রি থাকে, অন্ধকার থাকে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমা ক্ষীণ হতে থাকে, কালিমার বাহুল্য থাকে, ষড়বিকার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর) যুক্ত দক্ষিণায়ন অর্থাৎ বহির্মুখী হয় (যে পরমাত্মা

থেকে এখনও দূরে) সেই যোগীকে পুনরায় জন্ম নিতে হয়, তাহলে কি দেহের সঙ্গে সেই যোগীর সাধনা নষ্ট হয়ে যায়? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ।।২৬।।

উপর্যুক্ত শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই দুই প্রকারের গতি জগতে শাশ্বত অর্থাৎ সাধনের কখনও বিনাশ হয় না। এক (শুক্ল) অবস্থাতে প্রয়াণ করেন যিনি, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন এবং অন্য অবস্থাতে, যার মধ্যে ক্ষীণ প্রকাশ এবং কালিমা বাকী থাকে, এইরূপ অবস্থাতে প্রয়াণ করেন যিনি, তাঁকে পুনরায় দেহধারণ করতে হয়। যতক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ লাভ না হয়, ততক্ষণ ভজন করবার প্রয়োজন হয়। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। এখন এর জন্য সাধনের উপর পুনরায় জোর দিলেন–

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্যোগী মুহ্যতি কশ্চন।

তস্মাৎসর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।। ২৭।।

হে পার্থ! এইরূপ উভয় মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কোন যোগী মোহগ্রস্ত হন না। তিনি জানেন যে পূর্ণ প্রকাশ লাভ হলে ব্রহ্মকে লাভ করবেন এবং ক্ষীণ প্রকাশ থাকলেও পুনর্জন্মে সাধনের নাশ হয় না। দুটি গতিই শাশ্বত। অতএব অর্জুন! তুমি সবকালে যোগেযুক্ত হও অর্থাৎ নিরন্তর সাধন কর।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।

অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।। ২৮।।

যোগী পুরুষ সাক্ষাৎকার করে এইরূপ অবগত হয়ে (স্বীকার করে নয়) বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের পুণ্যফলগুলিকে নিঃসন্দেহে অতিক্রমণ করেন এবং সনাতন পরমপদ লাভ করেন। অবিদিত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ জানার নাম বেদ। সেই অবিদিত তত্ত্ব অবগত হলে, কি জানা বাকী থাকে? অতএব সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার পরে বেদের প্রয়োজন থাকে না; কারণ যিনি অবগত, তিনি এখন ভিন্ন নন। যজ্ঞ অর্থাৎ আরাধনার

নিয়ত ক্রিয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু যখন এই তত্ত্ব সম্বন্ধে এখন অবগত, তখন কার জন্য ভজন করা হবে? মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে লক্ষ্যের অনুরূপ তৈয়ার করাই তপস্যা। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির পরে যোগী কার জন্য তপস্যা করবেন? মন, বচন ও কর্মদ্বারা সর্বতোভাবে সমর্পণের নাম দান। এই সমস্তের পুণ্যফল হল—পরমাত্মার প্রাপ্তি। ফল এখন পৃথক্ নেই, সেইজন্য এই সবের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। সেই যোগী যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদির ফলকেও অতিক্রম করেন। তিনি পরমপদ লাভ করেন।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ে পাঁচটি প্রমুখ বিষয়ের উপর বিবেচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে সর্বপ্রথম সপ্তম অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বীজারোপিত প্রশ্নগুলিকে স্পষ্টভাবে বোঝাবার আগ্রহে বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন সাতটি প্রশ্ন করেছেন যে— ভগবন্! আপনি যাঁর সম্বন্ধে বললেন সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? সম্পূর্ণ কর্ম কি? অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ কাকে বলে? এবং শেষ সময়ে আপনি কিরূপে স্মৃতিতে জেগে থাকেন যে, আর কখনও বিস্মৃত হন না? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যাঁর কখনও বিনাশ হয় না সেই পরব্রহ্ম। 'স্বয়ং'- এর উপলব্ধিযুক্ত পরমভাবই অধ্যাত্ম। যার ফলে জীব মায়ার আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার আধিপত্যে চলে আসে তাই অধ্যাত্ম এবং ভূতগণের সেই সমস্তভাব, যা শুভ অথবা অশুভ সংস্কার উৎপন্ন করে, সেই সমস্ত ভাব স্থির হওয়া '**বিসর্গঃ**'- লোপ পাওয়া কর্মের সম্পূর্ণতা। এর পরে কর্ম করবার প্রয়োজন হয় না। অতএব কর্ম শুভাশুভ সংস্কারের উদ্‌গমকেই বিনষ্ট করে দেয়।

এইরূপে ক্ষরভাব অধিভূত অর্থাৎ ভূতগণের উৎপত্তির মাধ্যম বিনাশশীল ভাব। সেগুলিই ভূতগণের অধিষ্ঠাতা। পরমপুরুষই অধিদৈব। সমস্ত দৈবী সম্পদ্ তাঁতে বিলীন হয়। এই দেহে অধিযজ্ঞ আমি অর্থাৎ যজ্ঞ যাতে বিলীন হয়, তা আমি, যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা আমি। যোগী আমার স্বরূপ লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। অধিযজ্ঞ যিনি, তিনি এই দেহেই বাস করেন, বাইরে নয়।

শেষ প্রশ্নটি ছিল যে, শেষ সময়ে কিরূপে আপনাকে জানা যায়? তিনি বললেন যে, যিনি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমার অতিরিক্ত অন্য কোন

বিষয়-বস্তুর চিন্তনকে মনে ঠাঁই দেন না এবং এইরূপ আচরণ করে দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তিনি সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, শেষ সময়েও তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। দেহত্যাগ করবার পরেই এই উপলব্ধি হবে এমন কথা নয়। যদি মৃত্যুর পরে এই স্থিতি লাভ হত, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ হতেন না। বহুজন্ম ধরে যে পথিক চলে আসছেন ও লাভ করছেন, সেই জ্ঞানী তাঁর স্বরূপ হতেন না। সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে মন নিরুদ্ধ এবং এই নিরুদ্ধ মনেরও বিলয়ই হ'ল অন্তকাল। তবেই এই দেহের উৎপত্তির মাধ্যম শান্ত হয়ে যায়। সেই সময় পরমভাব-এ প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়। যিনি এইরূপ স্থিতিলাভ করেছেন, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না।

এইরূপ প্রাপ্তির জন্য তিনি স্মরণের বিধান বললেন যে, অর্জুন! নিরন্তর আমার স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। এই দুটি কাজ একসঙ্গে করা কি করে সম্ভব? কদাচিৎ এরূপ হবে যে, 'জয় গোপাল, হে কৃষ্ণ' বলে বলে লাঠি চালনাও করা হবে। এখানে স্মরণের স্বরূপ স্পষ্ট করলেন যে, যোগধারণাতে স্থির থেকে, আমাকে ছাড়া অন্য কোন বস্তুর স্মরণ না করে, নিরন্তর স্মরণ কর। স্মরণ যখন এত গভীর, তখন যুদ্ধ কিভাবে সম্ভব? মনে করুন এই পুস্তকটি ভগবান, আপনি যখন তার ধ্যান করবেন তখন যেন এর আশে-পাশের বস্তু, সম্মুখে যেগুলি আছে সেগুলির, বা অন্য দেখা-শোনা কোন বস্তুর চিন্তণ যেন মনে না ওঠে, এই সমস্ত যেন আপনি দেখতে না পান। যদি দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে ঠিকভাবে স্মরণ হচ্ছে না, এইরূপ স্মরণে যুদ্ধ কি করে হবে? বস্তুতঃ যখন আপনি নিরন্তর স্মরণে প্রবৃত্ত হবেন, তখনই যুদ্ধের যথার্থ স্বরূপ প্রকট হবে। সেই সময় মায়াময় প্রবৃত্তি বাধারূপে উপস্থিত হবে। কাম, ক্রোধ, রাগ দ্বেষ এরা দুর্জয় শত্রু। এই শত্রুগুলি স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে। এদের পার করে যাওয়াই যুদ্ধ। এই শত্রুদের নাশ করলেই যোগীপরমগতি লাভ করেন।

এই পরমগতি লাভ করবার জন্য অর্জুন! তুমি 'ওঁ' জপ কর এবং ধ্যান আমার কর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। নাম ও রূপ আরাধনার চাবিকাঠি।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই জিজ্ঞাসার সমাধান করলেন যে পুনর্জন্ম কি? কারা এর অন্তর্গত? তিনি বললেন, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যাবন্মাত্র জগৎ পুনরাবর্তী নিয়মের অন্তর্ভুত এবং এদের সমাপ্তির পরেও আমার পরম অব্যক্ত ভাব এবং তাতে স্থিতি সমাপ্ত হয় না।

এই যোগে প্রবিষ্ট পুরুষের গতি দুটি। যিনি পূর্ণপ্রকাশ প্রাপ্ত ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং ঊর্ধ্বরেতা, যাঁর মধ্যে লেশমাত্রও ত্রুটি নেই, তিনি পরমগতি লাভ করেন। যদি ঐ যোগকর্তার মধ্যে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে, কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় কালিমার সঞ্চার দেখা যায়, এইরূপ অবস্থাতে যাঁর দেহের সময় পূর্ণ হয় সেই যোগীকে জন্ম নিতে হয়। তিনি সামান্য জীবের মত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়ান্ না, জন্ম নিয়ে বাকী সাধনা সম্পূর্ণ করেন।

এইরূপে পরের জন্মে সেই ক্রিয়ার আচরণ করে তিনিও সেখানেই পৌঁছান, যার নাম পরমধাম। এর পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এর যৎসামান্য সাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। "উভয় পথই শাশ্বত অর্থাৎ অচল।" এই যথার্থকে বুঝে পুরুষ যোগ থেকে ভ্রষ্ট হন না। অর্জুন! তুমি যোগী হও। যোগী বেদ, তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানের পুণ্য ফলকে লঙ্ঘন করে যান, পরমগতি প্রাপ্ত হন।

বর্তমান অধ্যায়ে পরমগতির উল্লেখ কয়েকবারই করা হয়েছে। যাকে অব্যক্ত, অক্ষয় এবং অক্ষর বলে সম্বোধিত করা হয়েছে, যা কখনও ক্ষয় অথবা বিনাশ হয় না। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'অক্ষরব্রহ্মযোগো' নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।৮।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের সংবাদে 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'অক্ষরব্রহ্মযোগো' নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।৮।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথ নবমোঽধ্যায়ঃ ।।

ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগের ক্রমিক বিশ্লেষণ করেছেন। যার শুদ্ধ অর্থ ছিল, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। যজ্ঞে সেই আরাধনার বিধি-বিশেষের বর্ণনা আছে, যাতে চরাচর জগৎ আহুতি-সামগ্রী রূপে বিদ্যমান। মনের নিরুদ্ধ অবস্থাতে এবং নিরুদ্ধ মনেরও বিলয়কালে সেই অমৃত তত্ত্বকে জানা যায়। সাধনের শেষে যজ্ঞের পরিণাম অমৃতপান করে জ্ঞানী সনাতন ব্রহ্মে স্থিত হয়ে যান। ব্রহ্মে স্থিত অর্থাৎ মিলনের নামই যোগ। সেই যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়াকেই কর্ম বলে। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, যিনি এই কর্ম করেন, তিনি ব্যাপ্ত ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ কর্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানেন। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, পরমগতি একেই বলে, এই হল পরমধাম।

প্রস্তুত অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যোগযুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য কিরূপ? সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত থেকেও তিনি কিভাবে নির্লিপ্ত? কর্ম করেও কিরূপে তিনি অকর্তা? সেই পুরুষের স্বভাব এবং প্রভাবের উপর আলোকপাত, যোগকে আচরণে পরিণত করবার পথে দেবতাদিক বাধা-বিঘ্ন থেকে সতর্ক করলেন এবং সেই পুরুষের শরণে যাবার জন্য জোর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।। ১।।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন! অসূয়া (ঈর্ষা, দ্বেষ) মুক্ত তোমার জন্য আমি এই অতি গোপনীয় জ্ঞানকে বিজ্ঞানসহিত বলব অর্থাৎ প্রাপ্তির পরে মহাপুরুষের অবস্থিতি সম্পর্কে বলব যে, কিরূপে সেই মহাপুরুষ সর্বত্র একসঙ্গে কর্ম করেন,

কিরূপে জাগৃতি প্রদান করেন, কিরূপে রথী হয়ে সর্বদা আত্মার সঙ্গে থাকেন? **'যৎ জ্ঞাত্বা'**- যা' সাক্ষাৎ জানার পর তুমি দুঃখরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সেই জ্ঞান কিরূপ? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।। ২।।

বিজ্ঞানসংযুক্ত এই জ্ঞান সর্ববিদ্যার রাজা। বিদ্যার অর্থ ভাষা-জ্ঞান অথবা শিক্ষা নয়। **'বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদায়া।', 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।'** বিদ্যা তাকে বলে যা লাভ করে পুরুষ ব্রহ্মপথে চলে মোক্ষলাভ করেন। যদি পথ মধ্যে সিদ্ধাই অথবা প্রকৃতিতে কোথাও আবদ্ধ হন, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অবিদ্যা সফল হয়ে গেছে। সেটা বিদ্যা নয়। এই রাজবিদ্যা নিশ্চিত কল্যাণ করে। এই রাজবিদ্যা সমস্ত গোপনীয়ের রাজা। অবিদ্যা এবং বিদ্যার অবগুন্ঠন অনাবরণ ও যোগযুক্ত হলেই এর সঙ্গে মিলন হয়। এই বিদ্যা অতি পবিত্র, উত্তম এবং প্রত্যক্ষ ফলযুক্ত। এদিকে করলেই, ওদিকে ফল লাভ হয়– এইরূপ প্রত্যক্ষ ফলযুক্ত। এটা অন্ধবিশ্বাস নয় যে, এই জন্মের সাধনার ফল অন্য জন্মে লাভ হবে। এটা পরমধর্ম পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। বিজ্ঞানসম্মত এই জ্ঞানলাভ করা সরল এবং অবিনাশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- অর্জুন! এই যোগপথে বীজের নাশ হয় না। এর অল্প সাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেতে উদ্ধার করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভগবন্! শিথিল প্রযত্নশীল সাধক নষ্ট-ভ্রষ্ট তো হয়ে যান না? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! প্রথমে তো কর্ম কি, তা বোঝা আবশ্যক এবং বুঝবার পরে যৎসামান্য সাধন করে থাকলেও তা কোন জন্মে, কখনও বিনাশ হয় না; বরং ঐ যৎসামান্য অভ্যাসের প্রভাবে প্রত্যেক জন্মে তারই আচরণ করেন এবং অনেক জন্মের সাধনার পরিণামস্বরূপ, সেখানেই পৌঁছে যান, যার নাম পরমগতি অর্থাৎ পরমাত্মা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই সাধনার সম্বন্ধেই এখানেও বলছেন যে, এই সাধন করা খুব সহজ এবং অবিনাশী, পরন্তু এর জন্য শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।। ৩।।

পরন্তপ অর্জুন! এই ধর্মে (যার যৎসামান্য সাধন করে থাকলেও তার বিনাশ হয় না) শ্রদ্ধারহিত পুরুষ (এক ইষ্টে মনকে কেন্দ্রিত করেন না যিনি) তিনি আমাকে লাভ না করে সংসারেই বিচরণ করেন। অতএব শ্রদ্ধা অনিবার্য। আপনি কি সংসার থেকে আলাদা? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।।৪।।

অব্যক্ত স্বরূপ আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ আমি যে স্বরূপে স্থিত, তা'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি তাদের মধ্যে স্থিত নই; কারণ আমি অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত। মহাপুরুষ যে অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত, সেই স্তর থেকেই (দেহ নই সেই অব্যক্ত স্তর থেকেই) বার্ত্তা করেন। এই ক্রমেই আরও বলছেন—

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৫।।

বস্তুতঃ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত নয়; কারণ তারা মরণধর্মা, প্রকৃতির আশ্রিত; কিন্তু আমার যোগমায়ার ঐশ্বর্য দর্শন কর যে, আমার আত্মা ভূতগণে অবস্থিত না হয়েও তাদের পোষক এবং উৎপাদক। আমি আত্মস্বরূপ সেইজন্য আমি ঐ ভূতগণে অবস্থিত নই। এই হ'ল যোগের প্রভাব। এটা স্পষ্ট করবার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিলেন—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।।৬।।

যেমন আকাশে উৎপন্ন মহাবায়ু যেরূপ আকাশে সদৈব অবস্থান করেও আকাশকে মলিন করতে পারে না, সেইরূপ ভূতসকল আমাতে স্থিত, এরূপ জানবে। আমি আকাশবৎ নির্লিপ্ত, তারা আমাকে মলিন করতে পারে না। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হ'ল। এইরূপ হয় যোগের প্রভাব। এখন প্রশ্ন— যোগী করেন কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।৭।।

অর্জুন! কল্পের বিলয়কালে সকলভূত আমার প্রকৃতি অর্থাৎ আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং কল্পাদিতে আমি তাদের পুনঃ পুনঃ '**বিসৃজামি**'- বিশেষরূপে সৃষ্টি করি। তারা আগে বিকৃত অবস্থাতে ছিল, তাদেরই রচনা করি, সুসজ্জিত করি। যারা অচেতন, তাদের চেতনা প্রদান করি, কল্পের জন্য প্রেরণ করি। কল্পের তাৎপর্য উত্থানোন্মুখ পরিবর্তন। আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করে পুরুষ যেমন যেমন দেবী সম্পদের অধিকারী হন, তেমন তেমন কল্পের আরম্ভ হয় এবং যখন ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন, তখনই কল্পের শেষ হয়। নিজের কর্ম সম্পূর্ণ করে কল্পও বিলীন হয়ে যায়। ভজনের আরম্ভ কল্পের আদি এবং যেখানে লক্ষ্য স্পষ্ট হয় সেটাই ভজনের পরাকাষ্ঠা, কল্পের শেষ সেখানেই। যখন প্রত্যগাত্মা যোনির কারণভূত রাগ-দ্বেষাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিজ শাশ্বত স্বরূপে স্থির হয়ে যায়, এই অবস্থা সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, তারা আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যে মহাপুরুষ প্রকৃতিকে বিলীন করে স্বরূপে স্থিত হন, তাঁর আবার প্রকৃতি কি? তাঁর মধ্যে কি প্রকৃতি এখনও বাকী? না, তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণী নিজ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। তাঁদের উপর প্রকৃতির গুণের যেরূপ প্রভাব থাকে, সেইরূপ তাঁরা কার্য করেন। এবং '**জ্ঞানবানপি**'- প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। তিনি অনুগামীদের কল্যাণের জন্য করেন। পূর্ণজ্ঞানী তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের অবস্থিতিই তাঁর প্রকৃতি। তিনি স্ব স্বভাব মতই প্রবৃত্ত থাকেন। কল্পের শেষে মানুষ মহাপুরুষের এই অবস্থিতি প্রাপ্ত হন। মহাপুরুষের এই কৃতিত্বের উপর পুনরায় আলোকপাত করছেন—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮।।

স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ মহাপুরুষের অবস্থিতি স্বীকার করে '**প্রকৃতের্বশাৎ**'- নিজ নিজ স্বভাবে স্থিত প্রকৃতির গুণগুলির বশীভূত এই সমস্ত ভূতসমুদায়কে আমি পুনঃ পুনঃ '**বিসৃজামি**'-বিশেষরূপে সৃষ্টি, সুসজ্জিত করি। স্বীয় স্বরূপের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তাদের প্রেরণা প্রদান করি। তাহলে তো আপনি এই কর্মদ্বারা আবদ্ধ?

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু।। ৯।।

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে– মহাপুরুষের কার্য-প্রণালী অলৌকিক হয়। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে-আমি অব্যক্তরূপে কর্ম করি। এখানেও বলছেন– ধনঞ্জয়! আমি যে সমস্ত কর্ম অব্যক্তরূপে করি, সেগুলিতে আমার আসক্তি নেই। উদাসীন পুরুষের ন্যায় অবস্থিত বলে পরমাত্ম-স্বরূপ আমাকে সেইসকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না; কারণ কর্মের পরিণামে যে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়, তাতে আমি অবস্থিত, সেইজন্য সেই সমস্ত কর্ম করার জন্য আমি বাধ্য নই।

এই প্রশ্ন ছিল স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতির কার্যগুলির, মহাপুরুষের অবস্থিতি ছিল, তাঁর রচনা ছিল। এখন আমার অধ্যক্ষতায় মায়া যা' সৃষ্টি করে, তা' কি? তা'ও একটা কল্প–

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।। ১০।।

অর্জুন! আমার অধ্যক্ষতা দ্বারা অর্থাৎ আমার উপস্থিতিতে সর্বত্র ব্যাপ্ত আমার অধ্যাসদ্বারা এই মায়া (ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, অষ্টধা মূল প্রকৃতি এবং চেতন উভয়ই) চরাচর সহিত জগৎকে রচনা করে, যা' ক্ষুদ্র কল্প, এবং এই কারণেই এই জগৎ আবাগমনের চক্রে ঘূরতে থাকে। প্রকৃতির এইটা ক্ষুদ্র কল্প যার মধ্যে কালের পরিবর্তন হতে থাকে, আমার অধ্যাসায় প্রকৃতিই করে, আমি করি না; কিন্তু সপ্তম শ্লোকের কল্প আরাধনার সঞ্চার এবং সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মার্গদর্শনযুক্ত কল্প মহাপুরুষ স্বয়ং করে থাকেন। এক স্থানে তিনি স্বয়ং কর্তা, যেখানে বিশেষরূপে সৃজন করেন। এখানে কর্ত্রী প্রকৃতি, যে কেবল আমার অধ্যাস পেয়েই এই ক্ষণিক পরিবর্তন করে, যার মধ্যে দেহ-পরিবর্তন, কাল-পরিবর্তন এবং যুগের পরিবর্তন ইত্যাদিগুলি আছে। এইরূপ ব্যাপ্ত প্রভাব হওয়া সত্ত্বেও মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জানতে পারে না। যেমন–

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।। ১১।।

সমস্ত ভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরমভাব সম্বন্ধে যারা জানে না সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে মনুষ্য দেহধারী এবং তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করে। সমস্ত প্রাণীগণের ঈশ্বরেরও যিনি মহান্ ঈশ্বর, সেই পরমভাব-এ আমি অবস্থিত; কিন্তু মনুষ্য দেহ আশ্রয় করে ব্যবহার করি বলে মূঢ়ব্যক্তিগণ জানে না। তারা আমাকে মানুষ বলে সম্বোধন করে। তাদেরই বা কি দোষ? দৃষ্টিপাত করে যখন, তখন মহাপুরুষের দেহটাই তো দেখতে পায়। আপনি মহান্ ঈশ্বরভাব-এ স্থিত, কিরূপে তারা বুঝবে? কেন তারা দর্শনে অসমর্থ হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।। ১২।।

তারা বৃথা আশা (যা' কখনও পূর্ণ হবে না এইরূপ আশা), বৃথা কর্ম (বন্ধনকারী কর্ম), বৃথা জ্ঞান (যা বস্তুতঃ অজ্ঞান), '**বিচেতসঃ**'- বিশেষরূপে অচেতন, রাক্ষস এবং অসুরের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ স্বভাব ধারণ করে থাকে অর্থাৎ আসুরী স্বভাবযুক্ত হয়, সেইজন্য মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। অসুর এবং রাক্ষসভাব মনেরই স্বভাব, জাতিপ্রসূত বা যোনিপ্রসূত নয়। যাদের আসুরী স্বভাব তারা আমাকে জানতে পারে না; কিন্তু মহাত্মাগণ আমাকে জানেন এবং ভজনা করেন–

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। ১৩।।

পরন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ আশ্রয় করে মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের আদিকারণ, অব্যক্ত এবং অক্ষর জেনে অনন্যমনে অর্থাৎ মনের অন্তরালে অন্য কাউকে স্থান না দিয়ে কেবল আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে নিরন্তর আমাকে ভজনা করেন। কিরূপে ভজনা করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। ১৪।।

তারা নিরন্তর চিন্তনের ব্রতে দৃঢ় থেকে আমার গুণের স্মরণ করেন, প্রাপ্তির জন্য যত্নশীল হন এবং পুনঃ পুনঃ আমাকে নমস্কার করে সদা সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করেন। অবিরল নিযুক্ত থাকেন। কি উপাসনা করেন?

এই কীর্তিগান কিরূপ? অন্য কোন উপাসনা নয় বরং সেই 'যজ্ঞ' যা' বিস্তারপূর্বক বলেছেন। সেই আরাধনা সম্বন্ধেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে সংক্ষেপে পুনরায় বলছেন–

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।। ১৫।।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বব্যাপ্ত বিরাট পরমাত্মারূপ আমাকে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যজন করেন অর্থাৎ নিজের লাভ-লোকসান এবং সামর্থ্য বুঝে এই নিয়ত কর্ম যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। কেউ কেউ একত্বভাবে আমার উপাসনা করেন যে, তাঁকে, সেই পরমাত্ম-তত্ত্বে একীভূত হতে হবে এবং কেউ সমস্ত কিছু আমাকে পৃথক রেখে, আমাকে সমর্পণ করে নিষ্কাম সেবা-ভাব দ্বারা আমার উপাসনা করেন এবং নানাভাবে উপাসনা করেন; কারণ এ সকলই একটা যজ্ঞের উঁচু-নীচু স্তর মাত্র। সেবা থেকেই যজ্ঞ আরম্ভ হয়; কিন্তু এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় কিরূপে? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- যজ্ঞ করি আমি। যদি মহাপুরুষ রথী না হন, তাহলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। তাঁর নির্দেশ পেয়েই সাধক বুঝতে সক্ষম হন যে, কোন স্তরে তিনি এখন, কতদূর এগিয়েছেন? বস্তুতঃ যজ্ঞকর্তা কে? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬।।

আমিই কর্তা। বস্তুতঃ কর্তাকে প্রেরকরূপে সঞ্চালন করেন ইষ্ট। কর্তার দ্বারা যেটুকু সম্ভব হয়, তা' আমার কৃপা। আমিই যজ্ঞ। যজ্ঞ আরাধনার বিধি-বিশেষ মাত্র। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার পর পরিণামস্বরূপ যে অমৃত প্রাপ্ত হয়, তা' পান করে পুরুষ সনাতন ব্রহ্মকে জানতে পারেন। আমিই স্বধা অর্থাৎ অতীতের অনন্ত সংস্কার বিলীন করা, তাদের তৃপ্ত করতে সক্ষম হওয়া, সেটা আমারই কৃপা। আমিই ভবরোগ দূর করবার ঔষধি। আমাকে লাভ করার পর মনুষ্যগণ এই রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমিই মন্ত্র। সাধক আমারই কৃপাতে মনকে শ্বাসের অন্তরালে নিরুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এই নিরোধ ক্রিয়াতে যে 'আজ্য' (হবি) বস্তু তীব্রতা আনে, তা' আমি। আমারই প্রকাশে মনের সমস্ত প্রবৃত্তি বিলীন হয় এবং আহুতি অর্থাৎ সমর্পণও আমি।

এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বার বার 'আমিই' এই কথা বলছেন। এর তাৎপর্য এই যে, আমিই প্রেরকরূপে আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে এবং নিরন্তর নির্ণয় করে যোগক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করি। একেই বিজ্ঞান বলে। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন যে– "যতক্ষণপর্যন্ত ইষ্টদেব রথী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের) গতি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু না করে দেন, ততক্ষণপর্যন্ত ভজন আরম্ভই হয় না।" কেউ হাজার চোখ বুজে ভজন করুক, দেহ কৃশ করুক কিন্তু যতক্ষণ সেই পরমাত্মা, যাঁকে লাভ করতে ইচ্ছুক আমরা, যে স্তরে আমরা দাঁড়িয়ে, সেই স্তর থেকে, আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে জাগ্রত না হন, ততক্ষণ ঠিকভাবে ভজনের স্বরূপ বোঝা যায় না। সেইজন্য মহারাজজী বলতেন– "আমার স্বরূপ ধারণ কর, আমি সব দেব।" শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– সবকিছু আমিই প্রদান করি।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুরেব চ।।১৭।।

অর্জুন! আমিই সম্পূর্ণ জগতের '**ধাতা**' অর্থাৎ ধারণকর্তা, '**পিতা**' অর্থাৎ পালনকর্তা, '**মাতা**' অর্থাৎ জন্মদাত্রী, '**পিতামহঃ**' অর্থাৎ মূল উদ্‌গম, যাতে সকলেই লীন হয়ে যায় এবং জানবার যোগ্য পবিত্র ওঁকার অর্থাৎ '**অহম্ আকার ইতি ওঁকারঃ**' সেই পরমাত্মা আমার স্বরূপে স্থিত। 'সোঽহং', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি একে অন্যের পর্যায়, এইরূপ জানবার যোগ্য স্বরূপ আমিই। '**ঋক্**' অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রার্থনা, '**সাম**' অর্থাৎ সমত্ব প্রদানকারী প্রক্রিয়া, '**যজুঃ**' অর্থাৎ যজ্ঞের বিধি-বিশেষও আমিই। যোগ অনুষ্ঠানের উপর্যুক্ত তিনটি আবশ্যক অঙ্গ আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। ১৮।।

হে অর্জুন! '**গতিঃ**' অর্থাৎ লাভের যোগ্য পরমগতি, '**ভর্ত্তা**'-ভরণ-পোষণকারী, সকলের স্বামী, '**সাক্ষী**' অর্থাৎ দ্রষ্টারূপে স্থিত সকলের জ্ঞাতা, সকলের বাসস্থান, শরণগ্রহণের যোগ্য, অকারণ সুহৃদ্, উৎপত্তি এবং প্রলয় অর্থাৎ শুভ-অশুভ সংস্কার সমূহের বিলয় এবং অবিনাশী কারণ আমি। অর্থাৎ শেষে যার মধ্যে বিলীন হয়, সেই সমস্ত বিভূতি আমিই।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।। ১৯।।

সূর্যরূপে আমি উত্তাপ বিকিরণ করি, বর্ষা আকর্ষণ করি। মৃত্যুর অতীত যে অমৃততত্ত্ব এবং মৃত্যু, সৎ ও অসৎ সব আমি। অর্থাৎ যে পরমপ্রকাশ প্রদান করে, সেই সূর্যও আমি। যাঁরা ভজনা করেন, কখন-কখনও তাঁরা আমাকে অসৎ বলে মনে করেন, তাঁদের মৃত্যু হয়। এইরূপ বলছেন–

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-

মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্।। ২০।।

আরাধনা বিদ্যার অঙ্গ তিনটি– ঋক্, সাম এবং যজু অর্থাৎ প্রার্থনা, সমত্বের প্রক্রিয়া এবং যজনের আচরণ করেন যাঁরা, সোম অর্থাৎ চন্দ্রমার ক্ষীণ প্রকাশ যাঁরা পেয়ে থাকেন, পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র পুরুষ সেই যজ্ঞের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার আচরণ করেন, আমাকে ইষ্টরূপে পূজা করেন, স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। একেই অসৎ কামনা বলে, এতে তাঁদের মৃত্যু ঘটে, তাঁদের পুনর্জন্ম হয়, যেরূপ এর আগের শ্লোকটিতে যোগেশ্বর বলেছেন। তাঁরা আমারই পূজা করেন, সেই নির্ধারিত বিধি দ্বারাই করেন, কিন্তু পরিবর্তে স্বর্গ-কামনা করেন। সেই পুরুষগণ পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করেন, স্বর্গে অসাধারণ দেবভোগ উপভোগ করেন; অর্থাৎ আমিই সেই ভোগ প্রদান করি।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে।। ২১।।

তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মৃত্যুলোক অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিবর্তিত হন। এইরূপ '**ত্রয়ীধর্মম্**'- প্রার্থনা, সমত্ব এবং যজনের

তিনটি বিধিদ্বারা একটা যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন যাঁরা, তাঁরা আমার শরণাগত হলেও সকাম হওয়ার জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের মূল কখনও নাশ হয় না, কারণ এই পথে বীজের নাশ হয় না। কিন্তু যাঁরা কোনরূপ কামনা করেন না, তাঁরা কি লাভ করেন?—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। ২২।।

অনন্যভাব-এ আমাতে স্থিত ভক্তগণ পরমাত্মস্বরূপ আমারই নিরন্তর চিন্তন করেন, **'পর্যুপাসতে'**-লেশমাত্রও ত্রুটি না রেখে আমার উপাসনা করেন, সেই নিত্য একীভাবে সংযুক্ত পুরুষগণের যোগক্ষেম স্বয়ং আমি বহন করি অর্থাৎ তাঁদের যোগের সুরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিই। এর পরেও লোকে অন্যান্য দেবতাগণের ভজনা করে—

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। ২৩।।

কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে ভক্তগণ অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরা আমারই পূজা করেন; কারণ সেস্থানে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তাঁদের এই পূজা বিধিসম্মত নয়, আমাকে লাভ করার বিধি থেকে এটা পৃথক্।

এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার দেবতাগণের প্রকরণ তুলেছেন। সর্বপ্রথম সপ্তম অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক থেকে ২৩শ শ্লোকপর্যন্ত তিনি বলেছেন যে, অর্জুন! কামনাদ্বারা যাদের জ্ঞান অভিভূত হয়েছে, এইরূপ মূঢ়ব্যক্তি অন্যান্য দেবতার পূজা করেন এবং যে দেবতাকে পূজা করেন, সেখানে দেবতা বলে কোন সক্ষম সত্তার অস্তিত্বই তো নেই। পরন্তু অশ্বত্থ, প্রস্তর, ভূত, ভবানী অথবা অন্যত্র যে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, সেখানে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই। সর্বত্র আমিই। সেই স্থানেও আমি দাঁড়িয়ে তাঁদের দেবশ্রদ্ধা সেই-সেই দেবতাতে স্থির করি। ফলেরও বিধান আমি করি, ফল প্রদান করি। ফললাভও হয়; কিন্তু সেই ফল নষ্ট হয়ে যায়। আজ আছে তা কাল ভোগ করে নষ্ট হয়ে যাবে; পরন্তু আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। অতএব সেই মূঢ়গণ, যাদের জ্ঞান অভিভূত হয়েছে, তারা অন্যান্য দেবতার ভজনা করে।

প্রস্তুত অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৫শে শ্লোকপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলছেন যে, অর্জুন! যাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরা আমারই পূজা করেন; কিন্তু তা' বিধিসম্মত নয়। সেখানে দেবতার সক্ষম সত্তা নেই। তাদের প্রাপ্তির বিধি দোষপূর্ণ। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, যখন তাঁরাও প্রকারান্তরে আপনারই পূজা করেন এবং ফললাভও করেন, তখন তা'তে ক্ষতি কি?

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাশ্চ্যবন্তি তে।। ২৪।।

সকল যজ্ঞের ভোক্তা অর্থাৎ যজ্ঞ যার মধ্যে বিলীন হয়, যজ্ঞের পরিণামে যা' লাভ হয় তা' আমি এবং আমিই প্রভু; পরন্তু তাঁরা আমাকে তত্ত্বতঃ উত্তমরূপে জানেন না, সেইজন্য '**চ্যবন্তি**'-স্খলিত হন। অর্থাৎ তাঁরা কখনও অন্যান্য দেবতাতে পতিত হন এবং তত্ত্বতঃ যতক্ষণ না জানেন ততক্ষণ কামনা দ্বারাও পতিত হন। তাঁদের গতি কি?—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্।। ২৫।।

অর্জুন! দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন। দেবগণ পরিবর্তিত সত্তা। তাঁরা নিজের সদ্কর্মানুসারে জীবন অতিবাহিত করেন। পিতৃগণের পূজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। ভূতোপাসকগণ ভূত হন অর্থাৎ দেহধারণ করেন এবং আমার ভক্ত আমাকেই লাভ করেন। তাঁরা সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ হন। তাঁদের পতন হয় না। এটুকুই নয়, আমার পূজার বিধিও সরল—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ২৬।।

এখান থেকেই ভক্তি আরম্ভ হয় যে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করেন, মন থেকে প্রযত্নশীল সেই ভক্তের ঐসব সামগ্রী আমি গ্রহণ করি। সেইজন্য-

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।। ২৭।।

অর্জুন! তুমি যে কর্মের (যথার্থ কর্মের) আচরণ কর, যা' আহার কর, যা' হোম কর, দান কর এবং মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে আমার অনুরূপ তৈয়ার কর, সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করবে অর্থাৎ আমার প্রতি সমর্পিত হয়ে এই সমস্ত কর। সমর্পণ করলে আমি যোগক্ষেত্রের দায়িত্ব বহন করব।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।। ২৮।।

এইরূপে সর্বস্বের ন্যাস সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে তুমি শুভাশুভ ফল বিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করবে।

উপর্যুক্ত তিনটি শ্লোকেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমবদ্ধভাবে সাধন এবং তার পরিণামের বর্ণনা করেছেন। প্রথমে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল পূর্ণশ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পণ, দ্বিতীয় সমর্পিত হয়ে কর্মের আচরণ এবং তৃতীয় পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে সর্বস্বের ত্যাগ। এ সকলদ্বারা কর্মবন্ধন থেকে বিমুক্ত (বিশেষরূপে মুক্ত) হয়ে যাবে। মুক্ত হলে লাভ কি? বলছেন আমাকে লাভ করবে। এখানে মুক্তি এবং প্রাপ্তি একে অন্যের পূরক। আপনার প্রাপ্তিই হ'ল মুক্তি, তাহলে তাতে লাভ? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। ২৯।।

সর্বভূতের প্রতি আমার একই ভাব। সৃষ্টিতে আমার প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কেউ নেই; কিন্তু যিনি অনন্য ভক্ত, তিনি আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁর হৃদয়ে বাস করি। এই আমার একমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমাতে ও তাতে কোন পার্থক্য থেকে যায় না। তাহলে তো বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই ভজন করেন? ভজনের অধিকার কাদের? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। ৩০।।

অতি দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে অর্থাৎ (অন্য + ন) আমাকে ছাড়া কোন অন্য বস্তু অথবা দেবতাকে ভজনা না করে কেবল আমারই নিরন্তর ভজনা করে, তাহলে তাকে সাধু বলে মনে করবে। যদিও এখন সে সাধন নয়, কিন্তু তার সাধু হওয়াতে কোন সন্দেহও নেই; কারণ সে এখন দৃঢ়ব্রত হয়েছে। অতএব ভজন আপনিও করতে পারেন, শর্ত কেবল এই যে, আপনি মানুষ হবেন। কারণ মানুষই দৃঢ়ব্রত হতে সক্ষম। গীতাশাস্ত্র পাপীদের উদ্ধার করে এবং সেই পথিক-

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। ৩১।।

ভজনের প্রভাবে সেই দুরাচারীও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হন, পরমধর্ম পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সদা শাশ্বত পরমশান্তি লাভ করেন। কৌন্তেয় ! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না, তুমি নিশ্চিত জানবে। একটা জন্মে মুক্তিলাভ না হলে, পরের জন্মগুলিতে সেই সাধন সম্পূর্ণ করে শীঘ্রই পরমশান্তি লাভ করেন। অতএব সদাচারী, দুরাচারী ভজনের অধিকার সকলেরই। এতটাই নয়, বরং–

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।। ৩২।।

পার্থ ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র বা পাপযোনি যে কেউ হোক না কেন, তারা সকলেই আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি লাভ করে। অতএব গীতাশাস্ত্র মানুষ মাত্রের জন্য, তা' সে যে কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হোক না কেন, বিশ্বের যে কোন স্থানে তার জন্ম হয়ে থাকুক না কেন, গীতা সকলের জন্য একসমান কল্যাণের উপদেশ দেয়। গীতাশাস্ত্র সার্বভৌম।

পাপযোনিঃ- অধ্যায় ১৬/৭-২১-এ আসুরীবৃত্তির লক্ষণগুলির অন্তর্গত ভগবান বলেছেন যে, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা সদম্ভে যজন করে, তারা নরগণের মধ্যে অধম। যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেও যজ্ঞের নাম দিয়ে

সদম্ভে যজন করে যারা, তারা ক্রুরকর্মা এবং পাপাচারী (পাপযোনি)। তারা পরমাত্মারূপ আমাকে দ্বেষ করে সেইজন্য পাপী। বৈশ্য এবং শূদ্র ভগবৎপথের স্তর-বিশেষ। স্ত্রীজাতির প্রতি কখনও সম্মান, কখনও হেয় দৃষ্টিতে দেখার মনোভাব সমাজে সদাই ছিল; কিন্তু যোগক্রিয়াতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সমান প্রবেশাধিকার।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।। ৩৩।।

তাহলে ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ভক্তগণের জন্য কি বলার থাকতে পারে? ব্রাহ্মণ হ'ল এক অবস্থা-বিশেষ, এই অবস্থা প্রাপ্ত সাধকের মধ্যে ব্রহ্মে স্থিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা পাওয়া যায়। শান্তি, আর্জব, অনুভবে উপলব্ধি, ধ্যান এবং ইষ্টের নির্দেশ অনুসারে চলবার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। রাজর্ষি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঋদ্ধি-সিদ্ধির সঞ্চার, শৌর্য, প্রভুভাব, পশ্চাৎপদ না হওয়ার মনোভাব থাকে। এই স্তরের যোগী মুক্ত হয়ে যান, তাঁদের জন্য কিছু বলবার থাকে না। অতএব অর্জুন! তুমি সুখবিহীন, ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য দেহ ধারণ করেছ যখন, তখন আমারই ভজনা কর। এই নশ্বর দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে সময় নষ্ট করো না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুর্থবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের চর্চা করলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আর কোন পথ নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়স্কর। সংক্ষেপে চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, চার বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। তাহলে কি মানুষের বিভাগ চার জাতিতে করেছেন? বললেন- না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**'-গুণের পরিমাপে কর্মকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে কর্ম হল একমাত্র যজ্ঞের প্রক্রিয়া। অতএব এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান যাঁরা করেন, তাঁরা চার প্রকারের হন। প্রবেশকালে এই যজ্ঞকর্তা শূদ্র, অল্পজ্ঞ হয়। এইপথে এগিয়ে কিছু ক্ষমতা লাভ হলে, আত্মিক সম্পত্তি কিছু-কিছু সংগ্রহ হয়, যখন, তখন এই যজ্ঞকর্তাই বৈশ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করে। এই স্তর থেকে আরও উন্নত হলে প্রকৃতির তিনটি গুণকে সংযত করার ক্ষমতা সম্পন্ন হলে সেই সাধকই ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন এবং যখন এই সাধকের স্বভাবে ব্রহ্মানুভূতির যোগ্যতা লাভ হয়, তখন

সাধক ব্রাহ্মণ হন। শূদ্র ও বৈশ্য শ্রেণীর সাধকের থেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সাধকগণ ঈশ্বর-প্রাপ্তির অধিক সমীপে অবস্থান করেন। শূদ্র ও বৈশ্যও ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হয়ে শান্ত হবে, তাহলে যাঁরা এর চেয়ে উঁচু অবস্থা লাভ করেছেন, তাঁদের জন্য কি বলা বাকী থাকে? তাঁরা তো লাভ করবেনই।

গীতা যে সমস্ত উপনিষদের সার-সর্বস্ব, সেগুলি ব্রহ্মবিদুষী মহিলাদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তথাকথিত ধর্মভীরু, গোঁড়া ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ণের অধিকার-অনাধিকারের ব্যবস্থা নিয়ে অনর্থক মস্তিষ্ক চালনায় ব্যস্ত থাকুক; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট বক্তব্য যে, যজ্ঞার্থ কর্মের নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতিতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার। অতএব তিনি ভজনা করবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন–

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৩৪।।

অর্জুন! মদগতচিত্ত হও। আমার অতিরিক্ত মনে যেন অন্য কোন ভাবের উদয় না হয়। আমার অনন্যভক্ত হও, অনবরত চিন্তনে প্রবৃত্ত থাক। শ্রদ্ধাপূর্বক নিরন্তর আমাকেই পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হয়ে, আত্মা আমাতে একীভাবে স্থিত করলে আমাকেই লাভ করবে অর্থাৎ আমার সঙ্গে একত্ববোধ করবে।

নিষ্কর্ষ -

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন– অর্জুন! তোমার মত দোষমুক্ত ভক্তের জন্য আমি এই জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বলব, যা' জানবার পর কিছু জানা বাকী থাকবে না। এই সম্বন্ধে জেনে তুমি সংসার-বন্ধন থেতে মুক্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ বিদ্যার রাজা। বিদ্যা তাকেই বলে যা' পরব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়গুলির রাজা অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফলযুক্ত, সাধন-সুগম ও অবিনাশী। আপনি যদি অৎযল্প সাধনও করে থাকেন, তবু তা'কোন কালে নাশ হবে না, বরং এই সাধনের প্রভাবে আপনি পরমশ্রেয়পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন; কিন্তু একটা শর্তে, শ্রদ্ধাহীন পুরুষ পরমগতি লাভ না করে এই সংসার-চক্রে বিবর্তিত হয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগের ঐশ্বর্যের উপর আলোকপাত করলেন। দুঃখের সংযোগের বিয়োগকেই যোগ বলে অর্থাৎ সংসারের সংযোগ-বিয়োগ থেকে যা' সর্বথা মুক্ত, তার নামই যোগ। পরমতত্ত্ব পরমাত্মার মিলনের নাম যোগ। পরমাত্মার প্রাপ্তিই যোগের পরাকাষ্ঠা। যিনি এতে স্থিতিলাভ করেছেন, সেই যোগীর প্রভাব লক্ষ্য কর যে, সম্পূর্ণ ভূতগণের প্রভু এবং জীবধারীগণের পোষক হওয়া সত্ত্বেও আমার আত্মা ঐ ভূতগণে স্থিত নয়। আমি আত্মস্বরূপে স্থিত সেই পরমাত্মা আকাশে উৎপন্ন সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিত হয়েও তাকে মলিন করতে পারে না, সেইরূপ সমস্তভূত আমাতে স্থিত কিন্তু আমি তাদের মধ্যে লিপ্ত নই।

অর্জুন! কল্পের আদিতে ভূতগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করি, সুসজ্জিত করি এবং কল্পের শেষে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতি অর্থাৎ যোগে আরূঢ় যে মহাপুরুষ, তাঁর অবস্থিতি, তাঁর অব্যক্তভাব লাভ করে। যদ্যপি মহাপুরুষ প্রকৃতির অতীত হন; কিন্তু প্রাপ্তির পরে স্বভাব অর্থাৎ স্বয়ং-এ স্থিত থেকে লোক-সংগ্রহের জন্য যে কাজ করেন, তাই হয় তাঁর স্থিতি। এই স্থিতির কার্যকলাপকে সেই মহাপুরুষের প্রকৃতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এক রচয়িতা আমি, যে সমস্ত ভূতকে কল্পের জন্য প্রেরণা প্রদান করি এবং আর এক রচয়িতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যে আমার ইঙ্গিত পেয়ে চরাচরসহিত ভূতগণকে সৃষ্টি করে। এও এক কল্প, যার মধ্যে দেহ-পরিবর্তন, স্বভাব-পরিবর্তন এবং কাল-পরিবর্তন নিহিত। গোস্বামী তুলসীদাসও তাই বলছেন—

এক দুষ্ট অতিসয় দুখ রূপা। যা বস জীব পরা ভবকূপা।।

(রামচরিতমানস, ৩/১৪/৫)

এই প্রকৃতির প্রভেদ দুটি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। এর মধ্যে অবিদ্যা অতিশয় দুষ্ট, দুঃখরূপ, যার দ্বারা বাধ্য হয়ে জীব ভবকূপে পড়ে আছে। যার প্রেরণাতে জীব কাল, কর্ম, স্বভাব এবং গুণের চক্রে জড়িয়ে যায়। অন্যটি-বিদ্যামায়া, যার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমি সৃষ্টি করি। গোস্বামীজীর অনুসারে প্রভু সৃষ্টি করেন—

এক রচই জগ গুণ বস জাকে। প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকে।।

(রামচরতিমানস, ৩/১৪/৬)

এটি জগতের রচনা করে, গুণ যার আশ্রিত। কল্যাণকর গুণ একমাত্র ঈশ্বরে বিদ্যমান। প্রকৃতির কোন গুণই নেই, তা' নশ্বর; কিন্তু বিদ্যাতে প্রভুই প্রেরকরূপে কর্ম করেন।

এইরূপ কল্প দুই প্রকার। বস্তু, দেহ এবং কালের পরিবর্তন এক প্রকারের কল্প; কিন্তু এই যে পরিবর্তন তা' প্রকৃতি আমার ইঙ্গিত পেয়ে করে; কিন্তু এর থেকে শ্রেষ্ঠ কল্প, যা' আত্মাকে নির্মলরূপ প্রদান করে, তার বিন্যাস মহাপুরুষ করেন। তাঁরা অচেতন ভূতগণকে সচেতন করেন। ভজনের আদিই এই কল্পের আরম্ভ এবং ভজনের পরাকাষ্ঠা হল কল্পের শেষ। যখন এই কল্প ভবরোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরোগ করে শাশ্বত ব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে, সেই স্থিতি অবস্থা লাভের সময় যোগী আমার অবস্থিতি এবং আমার স্বরূপ লাভ করেন। প্রাপ্তির পরে মহাপুরুষের অবস্থিতিকেই তাঁর প্রকৃতি বলে।

ধর্মগ্রন্থগুলি গল্পের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চারটি যুগ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই কল্প সম্পূর্ণ হয়, মহাপ্রলয় হয়। প্রায়ই লোকে এর যথার্থ সম্বন্ধে বুঝতে পারে না। যুগের তাৎপর্য হল দুই। যতক্ষণ আপনি পৃথক্, আরাধ্য পৃথক্, ততক্ষণ যুগধর্ম থাকবে। গোস্বামীজী রামচরিতমানসের উত্তরকাণ্ডে এই বিষয়ে চর্চা করেছেন। যখন তামসিক গুণ কাজ করে, রাজসিক গুণ অল্প মাত্রাতে থাকে, চারিদিকে শত্রুতা এবং বিরোধভাব দেখা দেয়, এইরূপ ব্যক্তি কলিযুগীয় হয়। সে ভজনে অক্ষম হয়; কিন্তু সাধনা আরম্ভ হলে যুগের পরিবর্তন হয়। রাজসিক গুণের বৃদ্ধি হয়, তামসিক গুণ ক্ষীণ হয়ে আসে, স্বভাবে সামান্য সাত্ত্বিক গুণও চলে আসে, হর্ষ এবং ভয়ের দ্বিধা অন্তর্মনে চলতে থাকে তখন সেই সাধক দ্বাপর যুগের অবস্থা লাভ করে। ক্রমশঃ সাত্ত্বিক গুণের বাহুল্য হলে, রজোগুণ স্বল্পমাত্রায় থাকে, আরাধনা কর্মে আসক্তি হয়, ত্যাগের ক্ষমতা লাভ করে ত্রেতা যুগে এইরূপ সাধক বহু যজ্ঞ করেন। **'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'**- যে জপ যজ্ঞের শ্রেণীতে পড়ে সেই জপ, যার ওঠা-মানা শ্বাস-প্রশ্বাসে (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে), তার অনুষ্ঠান করবার ক্ষমতা লাভ হয়। যখন শুধু সত্ত্বগুণ বাকী থাকে, বৈষম্যের ভাব বিলুপ্ত হয়, সমতা লাভ হয়, এটাই কৃতযুগ অর্থাৎ কৃতার্থ যুগ অথবা সত্যযুগের প্রভাব। সেই সময় প্রত্যেক যোগী বিজ্ঞানী হন, ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে জানার যোগ্য হন, স্বাভাবিকভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়ার ক্ষমতা তাঁরা লাভ করেন।

বিবেকীগণ মনের মধ্যে যে যুগধর্মের উত্থান-পতন হয় তা বুঝতে পারেন। মনকে নিরুদ্ধ করবার জন্য অধর্মকে পরিত্যাগ করে ধর্মে প্রবৃত্ত হন। যখন নিরুদ্ধ মনের বিলয় হয় তখন যুগের সঙ্গে কল্পও শেষ হয়ে যায়। পূর্ণত্বে স্থিতি প্রদান করে কল্পও শান্ত হয়ে যায়। একেই প্রলয় বলে, যখন প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়। এর পর মহাপুরুষের যা অবস্থিতি, তাই তাঁর প্রকৃতি তাঁর স্বভাব।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- অর্জুন! মূঢ় ব্যক্তি আমাকে জানে না, ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আমাকে তুচ্ছ বলে মনে করে, সাধারণ মানুষ ভাবে। প্রত্যেক মহাপুরুষের সঙ্গে এই বিড়ম্বনা হয়, তৎকালীন সমাজ তাঁদের উপেক্ষা করে। তীব্রভাবে তাঁদের বিরোধ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও এর অপবাদ ছিলেন না। তিনি বলছেন যে, আমি পরমভাব-এ স্থিত; কিন্তু শরীর আমার মানুষেরই, সেইজন্য মূঢ়গণ আমাকে তুচ্ছ বলে, মানুষ বলে সম্বোধন করে। এইরূপ ব্যক্তিগণের আশা, কর্ম, জ্ঞান সব ব্যর্থ। এইরূপ ব্যক্তিগণ যা খুশি তাই বলে, যে কোন কাজ করে বলে আমরা কামনা করি না, এইরূপ বললেই যেন নিষ্কাম কর্মযোগী হওয়া যায়। সেই আসুরিক স্বভাব ব্যক্তিগণ আমাকে পরখ করতে পারে না; কিন্তু দৈবী সম্পদ্ যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা অনন্যভাবে আমার ধ্যান করেন। নিরন্তর আমার গুণের চিন্তন করেন।

অনন্য উপাসনা অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্মের মার্গ দুটি। প্রথমটি জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ নিজের উপর নির্ভর করে, নিজের সামর্থ্য বুঝে সেই নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যটি প্রভু-সেবক ভাবের, যার মধ্যে সদ্‌গুরুর প্রতি সমর্পিত হয়ে সেই কর্মই করা হয়। এই দুটি দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে লোকে আমার উপাসনা করে; কিন্তু তাদের দ্বারা যতটুকু কর্ম সম্ভব হয় সেই যজ্ঞ, আহুতি, কর্তা, শ্রদ্ধা এবং ঔষধি-যেগুলির দ্বারা ভবরোগের চিকিৎসা হয়, তা আমি। শেষে যে গতিলাভ হয়, সেই গতিও আমি।

এই যজ্ঞকেই লোকে '**ত্রৈবিদ্যাঃ**'- প্রার্থনা, যজন অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সমত্ব প্রদানকারী বিধিগুলির মাধ্যমে সম্পাদন করেন; কিন্তু পরিবর্তে স্বর্গের কামনা করেন, আমি তা' প্রদানও করি। তার প্রভাবে তাঁরা ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত করেন, দীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করেন; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হলে তাঁদের পুনর্জন্ম হয়। সেইজন্য ভোগের কামনা করা উচিত নয়। যিনি অনন্যভাবে অর্থাৎ 'আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই', এরূপভাব নিয়ে নিরন্তর আমার চিন্তন করেন, লেশমাত্রও ত্রুটি না রেখে ভজনা করেন, তাঁর যোগের সুরক্ষার দায়িত্ব আমি নিজ হাতে তুলে নিই।

এর পরেও কিছু লোক অন্যান্য দেবতার পূজা করে। তারা আমারই পূজা করে; কিন্তু আমার প্রাপ্তির বিধি তা নয়। সম্পূর্ণ যজ্ঞের ভোক্তা যে আমি এটা তারা জানে না অর্থাৎ তারা পূজার পরিণামে আমাকে লাভ করে না, সেইজন্য তাদের পতন হয়। তারা দেবতা, ভূত অথবা পিতৃগণের কল্পিতরূপে নিবাস করে; কিন্তু আমার ভক্ত আমার মধ্যে নিবাস করে, আমার স্বরূপলাভ করে।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞার্থ কর্মকে অতি সহজ বলছেন, তিনি বলছেন, ফল, ফুল অথবা যা' কিছু শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে অর্পণ করা হয়, তা আমি গ্রহণ করি। অতএব অর্জুন! তুমি সমস্ত আরাধনা আমাকে সমর্পণ কর। যখন সর্বস্বের ন্যাস হবে, তখন তুমি যোগযুক্ত হয়ে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সেই মুক্তি ও আমার স্বরূপ এক।

বিশ্বের সমস্ত প্রাণী আমার, কোন প্রাণীর প্রতি আমার প্রীতি বা দ্বেষভাব নেই। আমি তটস্থ থাকি; কিন্তু যিনি আমার অনন্য ভক্ত, আমি তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি আমার মধ্যে স্থিত। অত্যন্ত দুরাচারী, জঘন্যতম পাপীও যদি অনন্যভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে ভজনা করে, তাহলে সে সাধু মান্য করার যোগ্য। যদি সে দৃঢ়নিশ্চয় হয়, তাহলে সে শীঘ্রই পরম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং সদা শাশ্বত পরমশান্তি লাভ করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করলেন যে, ধার্মিক কে? এই সৃষ্টির অন্তর্ভূত যে কোন প্রাণী যদি অনন্যভাবে এক পরমাত্মার ভজনা করে, তাঁর চিন্তন করে, তাহলে সে শীঘ্রই ধার্মিক হয়ে যায়। অতএব সেই ব্যক্তি ধার্মিক, যে একমাত্র পরমাত্মার স্মরণ করে। অবশেষে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, অর্জুন! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। শূদ্র, নীচ, আদিবাসী, অনাদিবাসী যে কোন নামধারী, পুরুষ অথবা স্ত্রী, পাপযোনি, তির্যক্‌যোনি সকলেই আমার শরণাগত হয়ে পরমশ্রেয় লাভ করে। সেইজন্য অর্জুন! সুখরহিত, ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু দুর্লভ মনুষ্য দেহ ধারণ করেছ যখন, তখন আমার ভজনা কর। তাহলে ব্রহ্মে স্থিতি প্রদানকারী যোগ্যতাগুলির সঙ্গে যিনি যুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ এবং যিনি রাজর্ষিত্বের স্তর থেকে ভজনা করেন, এইরূপ যোগীর জন্য কি বলার থাকতে পারে? তাঁরা তো প্রকৃতির দ্বন্দ্বের অতীত। অতএব অর্জুন! নিরন্তর আমাতেই মনকে যুক্ত কর, নিরন্তর নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হয়ে তুমি আমাকেই লাভ করবে। যেখান থেকে ফিরে আসতে হয় না।

প্রস্তুত অধ্যায়ে সেই বিদ্যার উপর আলোকপাত করেছেন যা' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জাগ্রত করেন। এটি রাজবিদ্যা একবার জাগ্রত হলে নিশ্চিতরূপে কল্যাণ করে। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বাদে 'রাজবিদ্যাজাগৃতি' নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'রাজবিদ্যা জাগৃতি' নাম নবম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'রাজবিদ্যাজাগৃতি' নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'রাজবিদ্যা জাগৃতি' নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ দশমোঽধ্যায়ঃ ।।

পূর্ব অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত রাজবিদ্যার বর্ণনা করেছেন, যা' অবশ্যই কল্যাণকর। বর্তমান অধ্যায়ে তিনি বলছেন যে, মহাবাহু অর্জুন! আমার পরম রহস্যপূর্ণ বাণী পুনরায় শোন। এখানে দ্বিতীয়বার সেই বিষয়েই বলার কি প্রয়োজন? বস্তুতঃ সাধকের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন যেমন সাধক স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান, তেমন তেমন প্রকৃতির আবরণ সূক্ষ্ম হয়ে আসে, নতুন-নতুন দৃশ্য দেখা যায়। সেই সব সম্বন্ধে মহাপুরুষ জানিয়ে দেন। সাধক জানেন না। যদি মহাপুরুষ মার্গদর্শন করা বন্ধ করে দেন, তাহলে সাধক স্বরূপের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হবেন। যতক্ষণ সাধক স্বরূপ থেকে দূরে অবস্থান করেন, ততক্ষণ একথা প্রমাণিত যে, প্রকৃতির কোন না কোন আবরণ এখনও বিদ্যমান, সেইজন্য স্খলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্জুন শরণাগত শিষ্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন- '**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্**।'- ভগবন্! আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। অতএব তাঁর হিতকামনায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।

যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।। ১।।

মহাবাহু অর্জুন! আমার পরম প্রভাবপূর্ণ বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর, যা' আমি অতিশয় অনুরাগী তোমার হিতকামনায় বলব।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ।। ২।।

অর্জুন! আমার উৎপত্তি সম্বন্ধে দেবতা অথবা মহর্ষিগণ কেউই অবগত নন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, **'জন্মকর্ম চ মে দিব্যং'**- আমার সেই জন্ম এবং কর্ম অলৌকিক অর্থাৎ এই চর্মচক্ষুর দ্বারা তা' দেখা অসম্ভব। সেইজন্য আমার আবির্ভাব সম্বন্ধে দেবতা ও মহর্ষি স্তরের পুরুষগণ অবগত নন। আমি সর্বপ্রকার দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ।

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩।।

যিনি অজন্মা, অনাদি আমাকে, সমস্ত লোকের মহান্ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে জানতে পারেন, মরণধর্মা মনুষ্যমধ্যে সেই পুরুষ জ্ঞানবান্– অর্থাৎ অজ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বরকে উত্তমরূপে জানা জ্ঞান এবং এইরূপ যিনি জানেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই যে উপলব্ধি তা'ও আমারই কৃপা।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ।।৪।।

অর্জুন! নিশ্চযাত্মিকা বুদ্ধি, সাক্ষাৎকারসহিত জ্ঞান, লক্ষ্যের প্রতি বিবেকপূর্বক প্রবৃত্তি, ক্ষমা, শাশ্বত সত্য, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, মনের শমন, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা, চিন্তন-পথের কষ্ট, পরমাত্মার জাগৃতি, স্বরূপের প্রাপ্তিকালে সর্বস্বের লয়, ইষ্টের প্রতি অনুশাসনাত্মক ভয এবং প্রকৃতি থেকে নির্ভয়তা এবং–

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।।৫।।

অহিংসা অর্থাৎ নিজ আত্মাকে অধোগতিতে যেতে না দেওয়ার আচরণ, সমতা অর্থাৎ যাঁর মধ্যে বৈষম্যভাব থাকে না, সন্তোষ, তপ অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে লক্ষ্যের অনুরূপ তৈরী করা, দান অর্থাৎ সর্বস্বের সমর্পণ, ভগবৎপথে মান-অপমান সহ্য করা– এইরূপ প্রাণীগণের উপর্যুক্ত ভাব আমার থেকেই সম্পাদিত হয়। এইসকল ভাব দৈবী চিন্তন-পদ্ধতির লক্ষণ। এই সকলের অভাবকেই 'আসুরী সম্পদ্' বলে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।। ৬।।

সপ্তর্ষি অর্থাৎ যোগের সাতটি ক্রমিক ভূমিকা (শুভেচ্ছা, সুবিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনা ও তুর্যগা) এবং এদের অনুরূপ অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার), তার অনুরূপ মন যা' আমার ভাব-এ ভাবিত এই সকল আমার সঙ্কল্পদ্বারা (আমার প্রাপ্তির সংকল্প থেকে এবং যা' আমার প্রেরণা থেকেই উৎপন্ন হয়, উভয়েই একে অন্যের পূরক) উৎপন্ন হয়। এই সংসারে এই সমস্ত (সম্পূর্ণ দৈবী সম্পদ্) এদেরই প্রজা; কারণ সপ্ত ভূমিকার সঞ্চারে 'দৈবী সম্পদ্' ভিন্ন অন্য কিছু নেই।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৭।।

যে পুরুষ যোগকে ও আমার উপর্যুক্ত বিভূতি সকলকে সাছাৎকারসহিত জানেন, সে স্থির ধ্যানযোগের মাধ্যমে আমাতে একীভাবে স্থিত হন। এতে কোন সন্দেহ নেই। বায়ুশূণ্য স্থানে যেরূপ প্রদীপের শিখা অকম্পিত হয়, যোগীর বিজিত চিত্তেও এই পরিভাষা। প্রস্তুত শ্লোকে 'অবিকম্পেন' শব্দটির অভিপ্রায় এই।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।। ৮।।

সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ আমি। আমার দ্বারাই জগৎ গতিমান। এইরূপ জেনে বিবেকীজণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক নিরন্তর আমারই ভজনা করেন। তাৎপর্য এই যে, যোগীদ্বারা আমার অনুরূপ যে প্রবৃত্তি হয, তাকে আমি করি। তা' আমারই কৃপা। (কিরূপে? এই সম্বন্ধে পূর্বে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে) কিরূপে তাঁরা নিরন্তর ভজন করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। ৯।।

অন্য কাউকে স্থান না দিয়ে নিরন্তর আমাতেই চিত্ত সংযোগ করেন, আমাকে প্রাণ অর্পণ করেছেন যাঁরা, তাঁরা সর্বদা পরস্পরের মধ্যে আমার প্রক্রিয়াগুলি বোধ করেন। আমার গুণগান করেই সন্তুষ্ট হন এবং নিরন্তর আমাতেই রমণ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ১০।।

নিরন্তর আমার ধ্যানে মগ্ন এবং প্রেমপূর্বক ভজনা করেন যাঁরা, আমি তাঁদের সেই বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ যোগে প্রবেশ করতে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় সেই বুদ্ধি প্রদান করি, যে বুদ্ধিদ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করেন। অর্থাৎ যোগের জাগৃতি ঈশ্বরের কৃপা। সেই অব্যক্ত পুরুষ, 'মহাপুরুষ' কিরূপে যোগে প্রবেশের বুদ্ধি প্রদান করেন?—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। ১১।।

তাঁদের উপর পূর্ণ অনুগ্রহ করবার জন্য আমি তাঁদের আত্মাতে একীভাবে স্থিত হয়ে, রথী হয়ে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন অন্ধকার জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা প্রকাশিত করে নষ্ট করি। বস্তুতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীদ্বারা যতক্ষণ সেই পরমাত্মা আপনার আত্মাতে জাগ্রত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চালন না করেন, আদেশ-নির্দেশ না দেন, এই প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে স্বয়ং এগিয়ে না দেন, ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে যথার্থ ভজনের আরম্ভই হয় না। সকলদিক্ থেকে ভগবান কথা বলেন; কিন্তু আরম্ভে তিনি স্বরূপস্থ মহাপুরুষের মাধ্যমেই কথা বলেন। যদি এইরূপ মহাপুরুষের সান্নিধ্য আপনার না হযে থাকে, তবে তার কথা স্পষ্ট হবে না।

ইষ্ট, সদ্গুরু অথবা পরমাত্মার রথী হওয়া একই কথা। সাধকের আত্মায় জাগ্রত হলে তাঁর নির্দেশ চারভাবে পাওয়া যায়। প্রথমে স্থূলসুরা-সম্বন্ধী অনুভব হয়। আপনি যখন আরাধনায় বসবেন, তখন আপনার মন কতটা তাতে নিযুক্ত? কখন আরাধনায় মগ্ন হয়? কখন মন আরাধনা করতে চায় না?— প্রতি সেকেণ্ডে-মিনিটে ইষ্ট এর সঙ্কেত দেন অঙ্গ-স্পন্দনের মাধ্যমে। অঙ্গ-স্পন্দনকে স্থূলসুরা-সম্বন্ধী অনুভব বলে, যা' প্রতি সেকেণ্ডে দু-চার স্থানে একসঙ্গে অনুভব হয় এবং সাধনাতে ব্যবধান উৎপন্ন হলে প্রতি মিনিটে তার অনুভব হয়। এই সঙ্কেত তখনই পাওয়া

যাবে যখন ইষ্টের স্বরূপ আপনি অনন্যভাবে হৃদয়ে ধারণ করবেন অন্যথা সাধারণ জীবের মধ্যে সংস্কারের সংঘর্ষের ফলস্বরূপ অঙ্গ-স্পন্দন হয়েই থাকে, সেসবের ইষ্ট নির্দেশে সঙ্গ কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় হল স্বপ্নসুরা-সম্বন্ধী অনুভব। সাধারণ মানুষ যা'স্বপ্ন দেখে তা বাসনাজনিত; কিন্তু যদি আপনি ইষ্টকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহলে এই স্বপ্নও নির্দেশে পরিবর্তিত হবে। যোগী স্বপ্ন দেখেন না, ভবিষ্যৎ দেখেন।

উপর্যুক্ত দুটি অনুভবই প্রারম্ভিক, যে কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে, মনে শুধু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকলে, তাঁর একটু-আধটু সেবা করে থাকলেও এই অনুভব জাগ্রত হয়; কিন্তু এই দুটি অনুভবের থেকেও সূক্ষ্ম শেষ দুটি অনুভব ক্রিয়াত্মক, যা' ক্রিযার পথে চলেই গোচরীভূত হয়।

তৃতীয় অনুভব সুষুপ্তি সুরা-সম্বন্ধী। সংসারে প্রত্যেক জীব অচৈতন্য অবস্থাতে পড়ে আছে। মোহনিশায় সকলেই অচৈতন্য। রাত-দিন যা' করে সমস্তটাই স্বপ্ন। এখানে সুষুপ্তির শুদ্ধ অর্থ এই যে, যখন পরমাত্মার চিন্তনের এইরূপ শৃঙ্খলা উপস্থিত হয় যে মন একদম স্থির হয়ে যায়, দেহটা জেগে থাকে, কিন্তু মন সুপ্ত অবস্থাতে থাকে। এইরূপ অবস্থাতে ইষ্টদেব আবার সঙ্কেত দেন। যোগের অবস্থার অনুরূপ একটা রূপক (দৃশ্য) দেখা দেয়, যা সঠিক দিক্ প্রদান করে, ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেয়। পূজ্য মহারাজজী বলতেন, "যেরূপ ডাক্তার অচৈতন্য অবস্থার ওষুধ দিয়ে, উচিত চিকিৎসা করে চেতনা ফিরিয়ে আনে, সেইরূপ ভগবানও বলে দেন।"

চতুর্থ অনুভব হল সমসুরা-সম্বন্ধী। যার মধ্যে আপনি ধ্যান কেন্দ্রিত করেছিলেন, সেই পরমাত্মাতে সমতা লাভ হলে। তারপর ওঠা-বসা, চলাফেরা করা, সবসময় সর্বত্র থেকে অনুভূতি হতে থাকে। এইরূপ যোগী ত্রিকালজ্ঞ হন। এই অনুভব ত্রিকালাতীত অব্যক্ত স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ আত্মাতে জাগ্রত হয়ে অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা নষ্ট করেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।। ১২।।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।। ১৩।।

ভগবন্! আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরম পবিত্র; কারণ আপনাকে সমস্ত ঋষিগণ সনাতন, দিব্যপুরুষ, দেবতাদেরও আদিদেব, অজন্মা এবং সর্বব্যাপী বলেন। পরমপুরুষ, পরমধামেরই পর্যায় দিব্যপুরুষ, অজন্মা ইত্যাদি শব্দ। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস এবং স্বয়ং আপনি আমাকে তাই বলেছেন। অর্থাৎ পূর্বে পূর্বকালীন মহর্ষিগণ বলেছেন, এখন বর্তমানে যাঁদের সঙ্গ উপলব্ধ– নারদ, দেবল, অসিত এবং ব্যাসদেবের নাম উল্লেখ করলেন, যাঁরা অর্জুনের সমকালীন ছিলেন (অর্জুন সৎপুরুষদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন) আপনিও তাই বলছেন। অতএব–

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ।। ১৪।।

হে কেশব! আপনি আমাকে যা বলছেন, তা আমি সত্য বলে মনে করি। আপনার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে না দেবতাগণ না দানবগণই জানেন।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।। ১৫।।

হে ভূতগণের সৃষ্টিকর্তা! হে ভূতগণের ঈশ্বর! হে দেবদেব! হে জগৎস্বামিন্! হে পুরুষমধ্যে উত্তম! আপনি স্বয়ং নিজেকে জানেন অথবা যাঁর আত্মায় জাগ্রত হয়ে আপনি জানিয়ে দেন, তিনিই জানেন। সেটাও নিজেকে নিজেই জানা হল। সেইজন্য–

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।। ১৬।।

আপনিই আপনার ঐ দিব্য বিভূতিগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে, যৎসামান্যও বাকী না রেখে বলতে সক্ষম, যে যে বিভূতিদ্বারা আপনি এই লোকসমূহ ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।। ১৭।।

হে যোগিন্! (শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন) কিরূপে সতত আপনার চিন্তন করলে আমি আপনাকে জানতে পারব? হে ভগবন্! কোন কোন ভাবদ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব?

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।। ১৮।।

হে জনার্দন! আপনার যোগশক্তি এবং যোগের বিভূতি সম্বন্ধে পুনরায় বিস্তৃতভাবে বলুন। সংক্ষেপে বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভেই বলেছেন, পুনরায় বলুন; কারণ অমৃত তত্ত্ব প্রদানকারী এই বচন শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না।

রাম চরিত জে সুনত অঘাহীঁ। রস বিশেষ জানা তিন্হ নাহীঁ।।

(রামচরিতমানস, ৭/৫২/১)

যতক্ষণ প্রবেশলাভ না হয়, ততক্ষণ অমৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জানার ব্যাকুলতা থেকেই যায়। প্রবেশের পূর্বেই যদি পথিক চিন্তা করেন যে, বহু জানা হয়েছে, তাহলে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি। এতে প্রমাণ হয় যে, সেই ব্যক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। সেইজন্য সাধককে সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইষ্টের নির্দেশ পালন করা উচিত এবং তা আচরণে পরিণত করা উচিত। অর্জুনের উক্ত জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।। ১৯।।

কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! এখন আমি নিজের দিব্য বিভূতিসকল, তারমধ্যেও প্রধান-প্রধান বিভূতিসমূহ সম্বন্ধে তোমাকে বলব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই।

অহমাত্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ।। ২০।।

অর্জুন ! আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত সকলের আত্মা এবং সমস্ত ভূতের আদি, মধ্য এবং অন্ত আমিই অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু এবং জীবনও আমি।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌।

মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।। ২১।।

অদিতির দ্বাদশ পুত্রমধ্যে আমি বিষ্ণু এবং জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি প্রকাশমান সূর্য। বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি নামক বায়ু এবং আমি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র।

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।। ২২।।

বেদের মধ্যে আমি সামবেদ অর্থাৎ পূর্ণ সমত্ব প্রদানকারী গায়ন। দেবগণের মধ্যে আমি তাদের অধিপতি ইন্দ্র এবং ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে আমি মন; কারণ মন-নিগ্রহ হবার পরেই আমাকে জানা সম্ভব এবং প্রাণীদের মধ্যে আমি তাদের চেতনা।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌।। ২৩।।

আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর। শঙ্ক অরঃ স শঙ্করঃ অর্থাৎ সমস্ত শঙ্কা থেকে আমি মুক্ত। যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি ধনের স্বামী কুবের। অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং শৃঙ্গযুক্ত পর্বতসকলের মধ্যে আমি সুমেরু অর্থাৎ সমস্ত শুভের মিলন আমি। সেটাই সর্বোপরি শৃঙ্গ, কোন পর্বত শৃঙ্গ নয়। বস্তুতঃ এই সমস্তই যোগ-সাধনার প্রতীক, যৌগিক শব্দ।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।। ২৪।।

যাঁরা পুর রক্ষা করেন সেই পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, যার থেকে দৈবী সম্পদের সঞ্চার হয় এবং হে পার্থ! সেনাপতিগণের মধ্যে আমি স্বামী কার্তিকেয়। কর্মত্যাগকে কার্তিক বলে, যার আচরণ করলে চরাচরের সংহার, প্রলয় এবং ইষ্ট লাভ হয়। জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।। ২৫।।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু এবং বাণীমধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যা সেই ব্রহ্মের পরিচায়ক। যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ। যজ্ঞ পরম-এ স্থিতি প্রদানকারী আরাধনার বিধি-বিশেষের চিত্রণকে বলে। তার সারাংশ হল— স্বরূপের স্মরণ এবং নামজপ। দুটি বাণী পার করে নাম যখন যজ্ঞের শ্রেণীতে এসে পৌঁছায়, তখন বাণীদ্বারা জপ করা হয় না, চিন্তন অথবা কণ্ঠ থেকেও জপ করা হয় না, বরং তখন শ্বাসে জাগ্রত হয়ে যায়। স্মৃতিকে শ্বাসের সঙ্গ নিযোজন করে মন থেকে অবিরল চলতে হয় মাত্র। যজ্ঞের শ্রেণীভুক্ত নামের ওঠা-নামা শ্বাসের উপর নির্ভর করে। এটা ক্রিয়াত্মক। স্থাবর পদার্থসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। শীতল, সম এবং অচল একমাত্র পরমাত্মা। যখন প্রলয় হয়েছিল, তখন মনু সেই শৃঙ্গেই বাঁধা পড়েছিলেন। অচল, সম এবং শান্ত ব্রহ্মের প্রলয় হয় না। আমি সেই ব্রহ্মের স্থিতি।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।। ২৬।।

সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। অশ্বঃ— আগামীকালপর্যন্তও যার থাকা সম্বন্ধে স্থির করে বলা যায় না, এইরূপ '**উর্ধ্বমূলমধঃ শাখম্ অশ্বত্থ**'(১৫/১)- উর্ধ্বে পরমাত্মা যার মূল, নিম্নে প্রকৃতি যার শাখা, এইরূপ সংসারই বৃক্ষস্বরূপ, যাকে অশ্বত্থ বলা হয়েছে— সামান্য অশ্বত্থ বৃক্ষ নয় যে পূজা আরম্ভ করবেন। এই প্রসঙ্গেই বলছেন যে—তা' আমি এবং আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ। 'নাদস্য রন্ধ্রঃ স নারদঃ'। দৈবী সম্পদ এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে স্বরে যে ধ্বনি (নাদ) ওঠে তা' আয়ত্তে চলে আসে, এইরূপ জাগৃতি আমি। গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ অর্থাৎ গায়ন (চিন্তন) করার প্রবৃত্তিসমূহতে যখন স্বরূপ চিত্রিত হতে থাকে, সেই অবস্থা-বিশেষ আমি।

সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি। 'কায়া'কেই কপিল বলে। এতে যখন একাগ্র হওয়া সম্ভব হয়, সেই ঈশ্বরীয় সঞ্চারের অবস্থা আমি।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্।।২৭।।

আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃত থেকে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব। সংসারের প্রত্যেকটি বস্তু বিনাশশীল। আত্মাই অজর-অমর, অমৃতস্বরূপ। এই অমৃতস্বরূপ থেকে যার সঞ্চার হয়, সেই অশ্ব আমি। অশ্বকে গতির প্রতীক বলা হয়। আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করবার জন্য যখন মন সেই দিকে সচেষ্ট হয়, তখন একেই অশ্ব বলে। এইরূপ গতি আমি। হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত নামক হস্তি। আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলে জানবে। বস্তুতঃ মহাপুরুষই রাজা, যার অভাববোধ নেই।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।। ২৮।।

আমি শস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র। গাভীদের মধ্যে কামধেনু। কামধেনু এমন কোন গাভী নয়, যে দুধের পরিবর্তে মনের মত ব্যঞ্জন পরিবেশন করে। ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠের কাছে কামধেনু ছিল। বস্তুতঃ 'গো' ইন্দ্রিয়সমূহকে বলে। যে পুরুষগণ ইষ্টকে অনুকূল করতে সমর্থ হন, তাঁরাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করতে পারেন। যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ ইষ্টের অনুরূপ স্থির হয়ে যায়, তাঁর জন্য তাঁরই ইন্দ্রিয়সমূহ 'কামধেনু' হয়ে যায়। তখন–

জো ইচ্ছা করিহউ মন মাহীঁ। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।

(রামচরিতমানস, ৭/১১৩/৪)

তাঁর জন্য কিছু দুর্লভ হয় না। প্রজননকারীদের মধ্যে আমি নতুন স্থিতি প্রকট করি। 'প্রজনন' অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন, চরাচর বিশ্বে রাত-দিন জন্ম হয়েই চলেছে, ইঁদুর-পিপীলিকা রাত-দিন জন্ম দিতে ব্যস্ত তা' নয়; বরং একধরণের পরিস্থিতি থেকে আর এক ধরণের পরিস্থিতি, এইরূপ বৃত্তিগুলির পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তনের স্বরূপ আমি। সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।

পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।। ২৯।।

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত অর্থাৎ শেষনাগ। বস্তুতঃ এটা কোন সর্প নয়। গীতাশাস্ত্রের সমকালীন পুস্তক শ্রীমদ্‌ভাগবতে এর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে ত্রিশ হাজার যোজন দূরে পরমাত্মার বৈষ্ণবী শক্তি বিদ্যমান, যার মাথার উপরে এই পৃথিবী সরষের দানার মত ভারশূণ্য অবস্থাতে স্থিত। সে যুগে যোজনের মানদণ্ড যাই ছিল, তবুও এই দূরত্ব পর্যাপ্ত। বস্তুতঃ এটা আকর্ষণ-শক্তির চিত্রণ। বৈজ্ঞানিকগণ যাকে ইথর বলে স্বীকার করেছেন। গ্রহ-উপগ্রহ যাবতীয় জ্যোতিষ্ক এই শক্তির আধারেই টিকে আছে। সেই শূণ্যে গ্রহগুলি ভারশূণ্য অবস্থাতে স্থিত। সেই শক্তি সাপের কুণ্ডলীর মত সমস্ত গ্রহগুলিকে জড়িয়ে আছে। এই হল সেই অনন্ত, যার দ্বারা এই পৃথিবী ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–এইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তি আমি। জলচরগণের মধ্যে তাদের অধিপতি 'বরুণ' এবং পিতৃগণের মধ্যে 'অর্যমা' আমি। যম পাঁচ প্রকারের যেমন–অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এসমস্ত পালন করে চলার পথে যে বিকারগুলি বাধা দেয়, সেগুলি ছেদন করাই 'অরঃ'। বিকারগুলি শান্ত হলে পিতৃ অর্থাৎ ভূত-সংস্কার তৃপ্ত হয়, নিবৃত্তি প্রদান করে। শাসকগণের মধ্যে আমি যমরাজ অর্থাৎ উপর্যুক্ত পঞ্চযমের নিয়ামক।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।

মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।। ৩০।।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ। (পর + আহ্লাদ– পরের জন্য আহ্লাদ) প্রেমই প্রহ্লাদ। আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তির মধ্যেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য আকুলি-বিকুলি আরম্ভ হয়, এর পরেই পরম প্রভুর দিগ্দর্শন হয়, এইরূপ প্রেমোল্লাস আমি। গণনাকারীদের মধ্যে আমি সময়। এক, দুই, তিন, চার এইরূপ গণনা অথবা ক্ষণ-দিন-পক্ষ-মাস ইত্যাদি নয় বরং ঈশ্বরের চিন্তনে যে সময়টুকু ব্যতীত হয়, সেই সময়টুকু আমি। এমনকি '**জাগত মে সুমিরণ করে, সোবত মে লব লায়।**' অনবরত চিন্তনে যে সময় সেই সময় আমি। পশুগণের মধ্যে মৃগরাজ (যোগী ও মৃ + গ অর্থাৎ যোগরূপী জঙ্গলে গমন করেন) এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। জ্ঞানই গরুড়। যখন ঈশ্বরীয় অনুভূতি হয়, তখন এই মনই নিজ আরাধ্যদেবের বাহন হয়ে যায় এবং

যখন এই মনই সংশয়েযুক্ত থাকে, তখন 'সর্প' হয়ে দংশন করে, যোনির কারণ হয়। গরুড় বিষ্ণুর বাহন। যে সত্তা বিশ্বে অনুরূপে সঞ্চারিত, জ্ঞানসংযুক্ত মন তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে, তার বাহক হয়ে যাক। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমি সেই মন, যে মন ইষ্টকে ধারণ করে।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।। ৩১।।

যারা পবিত্র করে, তাদের মধ্যে আমি বায়ু। শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম। **'রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন্ স রামঃ'**। যোগী কার মধ্যে রমণ করেন? অনুভবে। ঈশ্বর ইষ্টরূপে যা' নির্দেশ দেন, যোগী তার মধ্যে রমণ করেন। সেই জাগৃতির নাম রাম এবং সেই জাগৃতি আমি। মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগুলির মধ্যে আমি গঙ্গা।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।। ৩২।।

হে অর্জুন! সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমি। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। যা' আত্মার আধিপত্য প্রদান করে, সেই বিদ্যা আমি। সংসারে অধিকাংশ প্রাণী মায়ার আধিপত্যেই বাস করে। রাগ, দ্বেষ, কাল, কর্ম, স্বভাব এবং গুণসমূহদ্বারা প্রেরিত। এদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করে আত্মার আধিপত্য নিয়ে যায় যে বিদ্যা, তা আমি, যাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা বলে। ব্রহ্মচর্চায় যে পরস্পর বাদ-বিবাদ হয়, তাতে যেটি নির্ণায়ক, এইরূপ বার্তা আমি। বাকী নির্ণয়গুলি তো অনির্ণীত থাকে।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।। ৩৩।।

আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অ'কার অর্থাৎ ওঁকার এবং সমাসসকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব নামক সমাস। সাধনার উন্নত অবস্থাতে মন যখন নিশ্চল হয়ে আসে তখন সাধক ইষ্টের সম্মুখীন হন। কোন ইচ্ছা বাকী থাকে না। এখানে স্বামী-সেবকের সংঘর্ষ রয়েছে; কিন্তু দ্বন্দ্বের এই অবস্থা ভগবানের কৃপা। আমি অক্ষয়কাল। কাল

সদা পরিবর্তনশীল; কিন্তু সেই সময়, যা' অক্ষয়, অজর, অমর পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে, সেই অবস্থা আমি। বিরাট স্বরূপ অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত আমি সকলকে ধারণ-পোষণ করি।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।। ৩৪।।

আমি সকলের নাশক মৃত্যু এবং আমি ভাবী উৎপত্তির কারণ। নারীগণের মধ্যে আমি যশ, শক্তি, বাকপটুতা, স্মৃতি, মেধা অর্থাৎ বুদ্ধি, ধৈর্য এবং ক্ষমা।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে—**"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।" (অধ্যায় ১৫, শ্লোক ১৬)**। পুরুষ দুই প্রকারের হয়, ক্ষয় এবং অক্ষর। সম্পূর্ণ ভূতাদিকের উৎপত্তি এবং বিনাশশীল এই দেহ ক্ষর পুরুষ। তাঁরা নর, নারী; পুরুষ অথবা স্ত্রী যা কিছু হোন, শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে তাঁরা সকলেই পুরুষ। দ্বিতীয় হল—অক্ষর পুরুষ যা' কুটস্থ চিত্তের স্থির অবস্থায় দৃষ্ট হয়। এই কারণেই এই যোগপথে নারী-পুরুষ সকলেই সমান স্থিতির মহাপুরুষ হয়েছেন। কিন্তু এখানে স্মৃতি, শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি গুণ নারীদের বলা হয়েছে। এই সমস্ত সদ্‌গুণের প্রয়োজন কি পুরুষদের নেই? কোন পুরুষ শ্রীমান্, কীর্তিমান্, বক্তা, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, মেধাবী, ধৈর্যবান্ এবং ক্ষমাবান্ হতে চান না? বৌদ্ধিক স্তরে দুর্বল ছেলেদের মধ্যে এই সকল গুণের বিকাশ করার জন্য মাতা-পিতা পড়াশোনার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। এখানে বলছেন এই গুণগুলি কেবল স্ত্রীজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব আপনি বিচার করে দেখুন যে স্ত্রী কে? বস্তুতঃ আপনার হৃদয়ের প্রবৃত্তিই হল 'নারী'। তার মধ্যে এই সমস্ত গুণের সঞ্চার হওয়া দরকার। এই সমস্ত সদ্‌গুণ ধারণ করা স্ত্রীলিঙ্গ-পুলিঙ্গ সকলের জন্যেই উপযোগী। এই সমস্ত সদ্‌গুণ আমিই প্রদান করি।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।। ৩৫।।

গায়নের যোগ্য শ্রুতিসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম অর্থাৎ বৃহৎ-এর সঙ্গে সংযুক্ত, সমত্ব প্রদানকারী গায়ন অর্থাৎ এইরূপ জাগৃতি আমি। ছন্দ সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দ। গায়ত্রী কোন মন্ত্র নয়, যা পাঠ করলে মুক্তিলাভ হয়, বরং এটা

একটা সমর্পণাত্মক ছন্দ। তিনবার বিচলিত হবার পর ঋষি বিশ্বমিত্র নিজেকে ইষ্টের প্রতি সমর্পিত করে বলেছিলেন—"**ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।**" অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ তিনলোকে তত্ত্বরূপে ব্যাপ্ত দেব! আপনিই বরেণ্য। এইরূপ বুদ্ধি দিন আমাকে, এইরূপ প্রেরণা প্রদান করুন, যাতে আমি লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারি। এটা একটা প্রার্থনা। সাধক নিজ বুদ্ধিদ্বারা যথার্থ নির্ণয় নিতে পারেন না যে, কখন তিনি ঠিক এবং কখন ভুল? তাঁর এইরূপ যে সমর্পিত প্রার্থনা, তা' আমি, যা' নিশ্চয় কল্যাণকর; কারণ তিনি আমার আশ্রিত। মাসগুলির মধ্যে শীর্ষস্থ মার্গ আমি এবং যার মধ্যে সদা প্রফুল্লতা বিদ্যমান, এইরূপ ঋতু, হৃদয়ের এইরূপ অবস্থাও আমি।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩৬।।

তেজস্বী পুরুষগণের তেজ আমি। আমি অক্ষক্রীড়া মধ্যে ছলনাকারিগণের ছল। তাহলে তো ভাল, অক্ষক্রীড়াতে কল-বল-ছল করে গেলেই হয়, তাই যখন ভগবান্। না, এরূপ নয়। এই প্রকৃতিই একরকম জুয়া। এই প্রকৃতি ছলনাময়ী। এই প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রদর্শন ত্যাগ করে গুপ্তভাবে ভজন করে যাওয়াই ছল। এটা ছল না হওয়া সত্ত্বেও, আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক। জড়ভরতের ন্যায় উন্মত্ত, অন্ধ-বধির এবং বোবার মত এমনভাবে থাকা উচিত যে, জেনেও যেন কিছুই জানেন না, শুনেও না শোনার ভান করবেন, দেখেও দেখবেন না। গুপ্তভাবেই ভজন করার বিধান, তবেই সাধক প্রকৃতি পুরুষের জুয়াতে বিজয়ী হন। আমি বিজয়ীগণের বিজয় এবং ব্যবসায়িগণের নিশ্চয (যা' দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ শ্লোকে বলেছেন। এই যোগে নিশ্চযাত্মক ক্রিয়া, বুদ্ধি ও দিক্ একটাই, এইরূপ) ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি আমি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের ওজঃ এবং তেজ আমি।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।।৩৭।।

আমি বৃষ্ণীবংশে বাসুদেব অর্থাৎ সর্বত্র যিনি বাস করেন সেই দেব আমি। পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। পুণ্যই পাণ্ডু এবং আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি।

পুণ্যদ্বারা প্রেরিত হয়ে আত্মিক সম্পত্তি যিনি সংগ্রহ করেন আমি সেই ধনঞ্জয়। মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। পরমতত্ত্বকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে বিদ্যমান, সেই মুনি আমি। কবিদের মধ্যে 'উশনা' অর্থাৎ তাতে প্রবেশ প্রদান করেন যিনি, সেই কাব্যকার আমি।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।। ৩৮।।

দমনকারীগণ মধ্যে দমন করার শক্তি আমি। জিগীষুগণের নীতি আমি। গোপনীয় ভাবসমূহের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানিগণ সাক্ষাৎ করে যে জ্ঞান লাভ করেন সেই জ্ঞান আমি।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।

ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।। ৩৯।।

অর্জুন! সর্বভূতের উৎপত্তির কারণও আমি; কারণ স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই, যা' আমা ব্যতীত সত্তাবান্ হতে পারে। আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত। সকলেই আমারই সকাশ থেকে।

নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।। ৪০।।

পরন্তপ অর্জুন! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই। আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম, বস্তুতঃ সে সকল অনন্ত।

বর্তমান অধ্যায়ে সামান্য বিভূতির স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে, কারণ এর পরের অধ্যায়েই অর্জুন সে সমস্ত দেখতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ দর্শনের পরই বিভূতিগুলির সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানা যায়। বিচারধারা অবগত করানোর জন্য এর থেকেই সামান্য অর্থ দেওয়া হয়েছে।

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহশসম্ভবম্।। ৪১।।

যা' যা' ঐশ্বর্যযুক্ত, কান্তিযুক্ত এবং শক্তিযুক্ত বস্তু বিদ্যমান, তাদেব তাদেবকে তুমি আমার তেজের এক অংশমাত্র থেকে উৎপন্ন জান।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২।।

অথবা অর্জুন! এত অধিক জানবার তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সম্পূর্ণ জগৎ এক অংশমাত্র দ্বারা ধারণ করে রয়েছি।

উপর্যুক্ত বিভূতিসমূহের বর্ণনার তাৎপর্য এই নয় যে, আপনি অথবা অর্জুন এই সমস্ত বস্তুর পূজা করবেন; বরং শ্রীকৃষ্ণের বলবার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত দিক্ থেকে শ্রদ্ধা কুড়িয়ে কেবল সেই অবিনাশী পরমাত্মায় স্থির করুন। এইটুকুতেই তাঁর কর্তব্য পূর্ণ হবে।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ দান করব; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে বলেছেন, তবুও আবার বলছেন; কারণ সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করার প্রয়োজন থাকে। আমার উৎপত্তি সম্বন্ধে দেবতা অথবা মহর্ষিগণ কেউই জানেন না; কারণ তাঁদেরও আদিকারণ আমি। অব্যক্ত স্থিতির পরের সার্বভৌম অবস্থা সম্বন্ধে তিনিই জানেন, যিনি সেই স্থিতি লাভ করেছেন। যিনি আমাকে অজন্মা, অনাদি এবং সমস্তলোকের মহান্ ঈশ্বরকে যথার্থ জানেন, তিনিই জ্ঞানী।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমূঢ়তা, ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন, মনের শমন, সন্তোষ, তপস্যা, দান এবং কীর্তির ভাব অর্থাৎ দৈবী সম্পদের উক্ত লক্ষণ আমারই কৃপা। সাতজন মহর্ষি অর্থাৎ যোগের সাতটি ভূমিকা এরও পূর্বেকার তদনুরূপ অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এবং এর অনুকূল মন, যা' স্বয়ম্ভু, স্বয়ং রচয়িতা-এই সমস্ত আমাতে ভাবযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত এবং শ্রদ্ধাযুক্ত, সংসারের সমস্ত প্রজা যাঁদের, এরা সকলেই আমা থেকেই উৎপন্ন অর্থাৎ সাধনাময়ী প্রবৃত্তিগুলিই আমার প্রজা। এদের উৎপত্তি স্বতঃ না, গুরুর মাধ্যমে হয়। যিনি উপর্যুক্ত আমার বিভূতিসমূহকে সাক্ষাৎ জেনে নেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাতে একীভূত হন।

অর্জুন! 'আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ'-এইরূপ যাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক অবগত হন, তাঁরা অনন্যভাবে আমার চিন্তন করেন, নিরন্তর আমাতে মন, বুদ্ধি এবং প্রাণপণে নিযুক্ত হন, পরস্পর আমার গুণচিন্তন এবং আমাতে রমণ করেন। নিরন্তর আমাতে সংযুক্ত সেই পুরুষগণকে আমি যোগে প্রবেশের বুদ্ধি প্রদান করি। সেটাও আমারই কৃপা। বুদ্ধিযোগ কিরূপে প্রদান করেন? তো অর্জুন! **'আত্মভাবস্থ'**-তাঁদের আত্মাতে জাগ্রত হয়ে, তাঁদের হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা নষ্ট করি।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! আপনি পরম পবিত্র, সনাতন, দিব্য, অনাদি এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত—এইরূপ মহর্ষিগণ বলে থাকেন এবং বর্তমানে দেবর্ষি নারদ, দেবল, ব্যাস এবং আপনিও সেই এক কথাই বলছেন। এ কথা সত্য যে, আপনাকে দেবতাগণ বা দানবগণ কেউই জানে না। স্বয়ং আপনি যাঁকে জানিয়ে দেন, তিনিই জানতে পারেন। আপনার অনন্ত বিভূতির কথা আপনিই বলতে সমর্থ। অতএব জনার্দন! আপনি আপনার বিভূতিসমূহের সম্বন্ধে সবিস্তারে বলুন। সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইষ্টের নিকট থেকে শ্রবণ করার উৎকণ্ঠা থাকা উচিত। ইষ্টের অন্তরালে কি আছে, তা' সাধক কি করে জানবে।

এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এক-এক করে নিজের একাশিটি প্রমুখ বিভূতির লক্ষণ সংক্ষেপে বললেন—যোগসাধনে প্রবৃত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত কিছু অন্তরঙ্গ বিভূতির বর্ণনা তারমধ্যে করা হয়েছে এবং বাকী ঋদ্ধি-সিদ্ধির সঙ্গে যে-যে বিভূতি লাভ হয়, সেই-সেই বিভূতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং শেষে তিনি জোর দিয়ে বললেন— অর্জুন! এত অধিক জানবার তোমার কি প্রয়োজন? এই সংসারে যা কিছু তেজ এবং ঐশ্বর্যযুক্ত বস্তু আছে, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশমাত্রে স্থিত। বস্তুতঃ আমার বিভূতি অনন্ত। এইরূপ বলে যোগেশ্বর বর্তমান অধ্যায় এখানেই সম্পূর্ণ করলেন।

বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিভূতিগুলির সম্বন্ধে বৌদ্ধিক জ্ঞানমাত্র দিয়েছেন, যাতে অর্জুনের শ্রদ্ধা সমস্তদিক্ থেকে সরে এক ইষ্টে স্থির হয়; কিন্তু বন্ধুগণ! সবটা শোনার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার পরেও সেই পথে চলে সে সম্বন্ধে জানা বাকী থাকে। এইপথ ক্রিয়াত্মক।

সম্পূর্ণ অধ্যায়ে যোগেশ্বরের বিভূতিসকলেরই বর্ণনা আছে। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'বিভূতিবর্ণনম্' নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।।১০।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যাতথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'বিভূতি বর্ণন' নামক দশম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'বিভূতিবর্ণনম্' নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।।১০।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'বিভূতি বর্ণন' নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ।।

পূর্ব অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখ্য মুখ্য বিভূতিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রস্তুত করেছেন; কিন্তু অর্জুন ভাবলেন যে, তাঁর এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে শোনা হয়ে গেছে, তাই তিনি বললেন যে, আপনার বাণী শ্রবণ করে আমার সকল মোহনাশ হয়েছে; কিন্তু আপনি যা' বললেন, তা' প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শ্রবণের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতালের। সেই পথে চলে দেখবার পর বস্তুস্থিতি অন্যরকম হয়। অর্জুন ঐ রূপদর্শন করে কাঁপতে লাগলেন, ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন। জ্ঞানী কি কখনও ভয়ভীত হন? তাঁর কোন জিজ্ঞাসা কি বাকী থাকে? না, বৌদ্ধিক স্তরের অনুভব সর্বদা অস্পষ্ট হয়। হ্যাঁ, তা' সম্পূর্ণ জানার প্রেরণা অবশ্য প্রদান করে। সেইজন্য অর্জুন নিবেদন করলেন—

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম।।১।।

ভগবন্! আমার প্রতি অনুগ্রহ করে গোপনীয় অধ্যাত্মে প্রবেশপ্রদানকারী যে উপদেশ আপনি দান করলেন, তার দ্বারা আমার অজ্ঞান দূর হয়েছে। আমি এখন জ্ঞানী।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।

ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২।।

কারণ, হে কমলনেত্র! আমি ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় এবং আপনার অবিনাশী প্রভাব বিস্তৃতভাবেই আপনার কাছে শুনলাম।

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩।।

হে পরমেশ্বর! আপনি নিজেকে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা'তদ্রূপ, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু একথা আমি কেবল শুনেছি। অতএব হে পুরুষোত্তম! সেই ঐশ্বর্যযুক্ত স্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।৪।।

হে প্রভো! আমার দ্বারা আপনার সেই রূপ দেখা সম্ভব, যদি এইরূপ আপনি বিবেচনা করেন, তাহলে যোগেশ্বর! আপনি আমাকে আপনার অবিনাশী স্বরূপের দর্শন করান। এতে যোগেশ্বর কোন প্রতিবাদ করলেন না; কারণ পূর্বেও তিনি বহুবার বলেছেন যে, তুমি আমার অনন্যভক্ত এবং প্রিয়সখা। অতএব বড় প্রসন্ন হয়ে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকট করলেন–

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫।।

পার্থ! শত শত এবং সহস্র সহস্র নানা প্রকার, নানা বর্ণ এবং নানা আকৃতি বিশিষ্ট আমার দিব্যস্বরূপ দর্শন কর।

পশ্যাদিত্যান্বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত।।৬।।

হে ভারত! অদিতির দ্বাদশপুত্র, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশ মরুৎ দর্শন কর এবং আরও বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্যময়রূপ দর্শন কর।

ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।

মম দেহে গুডাকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭।।

অর্জুন! এখন আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা' কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা' দর্শন কর।

এই প্রকার তিনটি শ্লোকে ভগবান্ একনাগাড়ে দর্শন করিয়ে গেছেন কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পেলেন না, অতএব এইরূপ দেখাতে দেখাতে ভগবান্ হঠাৎ থেমে গেলেন ও বললেন–

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮।।

অর্জুন! তুমি তোমার নিজের চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ বৌদ্ধিক দৃষ্টিদ্বারা আমাকে দর্শন করতে সমর্থ হবে না সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক দৃষ্টি প্রদান করছি, যার সাহায্যে আমার প্রভাব এবং যোগশক্তি দর্শন কর।

এদিকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-প্রসাদে অর্জুন সেই দৃষ্টিলাভ করলেন এবং দর্শন করলেন, উদিকে সেই দৃষ্টিই যোগেশ্বর ব্যাসের কৃপা-প্রসাদে সঞ্জয় লাভ করেছিলেন। যা' কিছু অর্জুন দর্শন করেছিলেন, সঞ্জয়ও তাই দর্শন করেছিলেন এবং তার প্রভাবে নিজেকে কল্যাণের অংশীদার করেছিলেন। স্পষ্ট হল যে শ্রীকৃষ্ণ যোগীর সমকক্ষ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯।।

সঞ্জয় বললেন– হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলে পার্থকে নিজের পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যস্বরূপ দেখালেন। যিনি স্বয়ং যোগী এবং অন্যকেও যোগপ্রদান করার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে রয়েছে, যিনি যোগের স্বামী, তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। এইরূপ হরি সর্বস্বের হরণ করেন। যদি সুখ বাদ দিয়ে কেবল দুঃখ হরণ করেন তাহলে পরে দুঃখ আসবে। অতএব সমস্ত পাপনাশ করে, সর্বস্ব হরণ করে, নিজের স্বরূপ প্রদান করতে যিনি সক্ষম, তিনিই হরি। তিনি পার্থকে নিজের দিব্যস্বরূপ দেখালেন। সম্মুখে তো দাঁড়িয়ে ছিলেনই।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০।।

অনেক মুখ এবং অনেক নেত্রযুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট, অনেক দিব্য ভূষণযুক্ত এবং অনেক উদ্যত দিব্য আয়ুধে সজ্জিত এবং–

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১।।

দিব্যমাল্য এবং বস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত, সর্বপ্রকার আশ্চর্যেযুক্ত অসীম বিরাট স্বরূপ পরমদেবকে দৃষ্টিলাভ করার পর অর্জুন দেখলেন।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

(অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র, সংযমরূপ সঞ্জয়–যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সঞ্জয় বললেন– হে রাজন্! আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের উদয় হলে যত প্রকাশ হয়, সেই প্রকাশও ঐ মহাত্মার প্রকাশের সদৃশ কদাচিৎ হতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা, যোগেশ্বর ছিলেন।

তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যেদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩।।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন (পুণ্যই পাণ্ডু, পুণ্য অনুরাগ উৎপন্ন করে) তখন সেই পরমদেবের দেহে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র স্থিত দেখলেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪।।

তদনন্তর আশ্চর্যান্বিত, রোমাঞ্চিত অর্জুন পরমাত্মাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে (পূর্বেও প্রণাম করতেন; কিন্তু প্রভাব দর্শন করে সাদরে প্রণাম করে) করজোড়ে বললেন। এখানে অর্জুন আন্তরিকভাবে অন্তঃকরণ থেকে প্রণাম করলেন এবং বললেন–

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫।।

হে দেব! আপনার দেহে আমি সমস্ত দেবতা এবং বহুভূতের সমুদায়, পদ্মের আসনে অবস্থিত ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ এবং দিব্য সর্পসমূহ দেখছি। এটা প্রত্যক্ষ দর্শন ছিল, নিছক কল্পনা নয়; কিন্তু তখনই এরূপ সম্ভব হয় যখন যোগেশ্বর, পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মহাপুরুষ আন্তরিক দৃষ্টি প্রদান করেন। এটা সাধনগম্য।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬।।

বিশ্বের স্বামী! সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট আপনার অনন্তরূপ আমি দেখছি। হে বিশ্বরূপ! আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখছি না অর্থাৎ আপনার আদি, মধ্য ও অন্তের নির্ণয় করতে অক্ষম।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭।।

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অর্থাৎ যাঁর দর্শন দুর্লভ এবং বুদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রহণ করা অসম্ভব অপ্রমেয় স্বরূপ আপনাকে আমি সর্বত্র দেখছি। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে দর্শন করে অর্জুন তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা

সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।

ভগবন্! আপনি পরম অক্ষয় অর্থাৎ অক্ষয পরমাত্মা এবং জানবার যোগ্য। আপনি জগতের পরম আশ্রয়, আপনি শাশ্বত ধর্মের রক্ষক এবং আপনি অবিনাশী সনাতন পুরুষ– এই আমার অভিমত। আত্মার স্বরূপ কি? শাশ্বত, সনাতন, অব্যক্ত, অবিনাশী। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি? সেই শাশ্বত, সনাতন, অব্যক্ত, অবিনাশী অর্থাৎ প্রাপ্তির পর মহাপুরুষও সেই আত্মভাবে স্থিত হন। তাই ভগবান এবং আত্মা একই লক্ষণযুক্ত।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-

মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯।।

হে পরমাত্মন্! আমি দেখছি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই, অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট (পূর্বে সহস্র সহস্র ছিল, এখন অনন্ত হয়েছে), চন্দ্র ও সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট (তাহলে তো ভগবান্ অন্ধ হলেন। একটা চোখ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ প্রকাশযুক্ত এবং অন্যটা সূর্যের ন্যায় সতেজ, না। সূর্যের মত প্রকাশ এবং চন্দ্রের মত শীতলতা প্রদান করার গুণ একমাত্র ভগবানে রয়েছে। শশি এবং সূর্য প্রতীক মাত্র। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের দৃষ্টিযুক্ত), আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছেন।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০।।

হে মহাত্মন্! অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ আকাশ এবং সমস্ত দিক্ একমাত্র আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আপনার এই অলৌকিক, উগ্ররূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ব্যথিত।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১।।

ঐ দেবতাগণের সমূহ আপনাতেই প্রবেশ করছেন এবং কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্তুতিবাক্য অর্থাৎ কল্যাণ হোক, এইরূপ বলে সমস্ত স্তোত্রদ্বারা আপনার স্তব করছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে।।২২।।

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার, বায়ুদেব ও **'উষ্মপাঃ'**- ঈশ্বরীয় উষ্মা গ্রহীতা এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনার দর্শন করছেন। দর্শন করেও তাঁরা বুঝতে অসমর্থ, কারণ তাঁদের কাছে সেই দৃষ্টি নেই। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলেছিলেন; যাদের আসুরী স্বভাব সেই ব্যক্তিগণ আমাকে তুচ্ছ বলে সম্বোধন করে, সামান্য ব্যক্তি মনে করে, যদিও আমি পরমভাব, পরমেশ্বররূপে স্থিত। যদিও এখন মনুষ্যদেহ ধারণ করেছি। সেই সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে যে তাঁরা বিস্মিত হয়ে দর্শন করছেন, যাথার্থ্য বুঝতে তাঁরা অক্ষম।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্।
বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩।।

মহাবাহো! (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়েই মহাবাহু। প্রকৃতির অতীত মহান্ সত্তার মধ্যে যাঁর কার্যক্ষেত্র, তিনি মহাবাহু। শ্রীকৃষ্ণ মহানতার ক্ষেত্রে পূর্ণ, অধিকতম সীমাতে স্থিত। অর্জুন তারই প্রবেশিকাতে, এখনও পথিক। গন্তব্যস্থল মার্গের আরেকটি প্রান্তকেই বলে।) মহাবাহু যোগেশ্বর! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বাহু-ঊরু-চরণ ও বহু উদর বিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্তদ্বারা ভীসণীকৃত বিরাটরূপ দেখে সকলেই ব্যাকুল হচ্ছেন এবং আমিও ব্যাকুল হয়েছি। এখন অর্জুনের ভয় হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এত মহান্।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।।২৪।।

বিশ্বে সর্বত্র অণুরূপে ব্যাপ্ত হে বিষ্ণু! আকাশস্পর্শী, তেজোময়, নানারূপযুক্ত, বিস্তারিত মুখ এবং প্রকাশমান বিশাল চক্ষুযুক্ত আপনাকে দেখে বিশেষরূপে ভযভীত অন্তঃকরণযুক্ত আমি ধৈর্য ও মনের সমাধানরূপ শান্তি পাচ্ছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫।।

আপনার ভযংকর দাঢ়াযুক্ত (দংষ্ট্রাকরাল) এবং কালাগ্নি (কালের জন্যও অগ্নিস্বরূপ পরমাত্মা) তুল্য প্রজ্বলিত মুখসকল দেখে আমি দিগ্ভ্রম হচ্ছে। চারিদিকে প্রকাশ দেখে দিগ্ভ্রম হয়েছি। আপনার এইরূপ দেখে আমাকে সুখও মিলছে না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হোন।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬।।

সেই সব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ রাজন্যবর্গসহ আপনাতে মধ্যে প্রবেশ করছেন। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ (যা'র থেকে অর্জুন ভযভীত ছিলেন, সেই কর্ণ) এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধাদের সহিত সকলেই—

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭।।

দ্রুতবেগে আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখে প্রবেশ করছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ চূর্ণিতমস্তক হয়ে আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হয়েছেন দেখছি। তাঁরা কি বেগে প্রবেশ করছেন? এবার তাঁদের বেগের বর্ণনা করলেন—

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা তবামী নরলোকবীরা

বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।২৮।।

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ (ভীষণ হওয়া সত্ত্বেও) সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে, সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই বীরপুরুষগণ আপনার প্রজ্বলিত মুখে প্রবেশ করছেন। অর্থাৎ তাঁরা নিশ্চয়ই বীরপুরুষ; কিন্তু আপনি সমুদ্রবৎ। আপনার কাছে তাঁদের বল তুচ্ছ। তাঁরা কেন এবং কিভাবে প্রবেশ করছেন? এরজন্য উদাহরণ প্রস্তুত করলেন—

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯।।

যেমন পতঙ্গ নষ্ট হবার জন্যই প্রজ্বলিত অগ্নিতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সমস্ত প্রাণীও নিজের বিনাশের জন্য আপনার মুখসমূহে প্রবলবেগে প্রবেশ করছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

তেজোভিরাপূর্য জগৎসমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০।।

আপনি আপনার প্রজ্বলিত মুখসমূহদ্বারা সেই সকল লোককে গ্রাস করে লেহন করছেন, তাদের আস্বাদন করছেন। হে ব্যাপ্ত পরমাত্মা! আপনার উগ্র প্রকাশ সমগ্র জগৎকে তেজোরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত করে সন্তপ্ত করছে। এর তাৎপর্য এই যে, আগে আসুরী সম্পদ্ পরমতত্ত্বে বিলীন হয়, তারপর দৈবী সম্পদের প্রয়োজন থাকে না সেইজন্য দৈবী সম্পদ্‌ও সেই স্বরূপে বিলীন হয়ে যায়। অর্জুন দেখলেন যে, কৌরব পক্ষ, তদনন্তর তাঁর পক্ষের যোদ্ধাগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১।।

আমাকে বলুন যে এই উগ্রমূর্তি আপনি কে? হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন। আদিস্বরূপ! আমি আপনাকে উত্তমরূপে জানতে ইচ্ছা করি (যেমন, আপনি কে? আপনি কি করতে চান?); কারণ আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রচেষ্টাগুলি বুঝতে পারছি না। এর পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎপ্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২।।

অর্জুন! আমি লোকবিনাশকারী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল এবং বর্তমানে লোক সকল সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। প্রতিপক্ষের সেনাতে যে যোদ্ধাগণ আছেন, তাঁরা তোমা বিনাও থাকবেন না, তাঁরা জীবিত থাকবেন না সেইজন্য আমি প্রবৃত্ত হয়েছি।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভূঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩।।

অতএব অর্জুন! তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, যশলাভ কর। শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্যভোগ কর। এই সমস্ত বীর আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে। সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

প্রায় সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সেই পরমাত্মা স্বয়ং কিছু করেন না, কারও দ্বারা করানও না, যোগাযোগ করিয়েও দেন না। মোহাবৃত্ত বুদ্ধির জন্যই লোকে বলে যে, পরমাত্মা করান; কিন্তু এখানে তিনি স্বয়ং তালঠুকে দৃঢ়স্বরে বললেন– অর্জুন! কর্তা-ধর্তা আমি। আমার দ্বারা এই সমস্ত বীর পূর্বেই নিহত হয়েছেন। তুমি দাঁড়িয়ে থেকে কেবল যশলাভ কর। এইরূপ এইজন্যে- **'সো কেবল ভগতহ্ন হিত লাগী।'** অর্জুন সেই অবস্থা লাভ করেছিলেন যখন ভগবান স্বয়ং সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। অনুরাগই অর্জুন। অনুরাগীর জন্য ভগবান সর্বদা সহায়করূপে এগিয়ে যান, তাঁদের কর্তা, রথী হয়ে যান।

এখানে গীতায় তৃতীয়বার সাম্রাজ্যের প্রকরণ এসেছে। পূর্বে অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর ধন-ধান্যসম্পন্ন নিষ্কন্টক সাম্রাজ্য এবং দেবতাগণের স্বামীত্ব অথবা ত্রৈলোক্যের রাজ্যেও আমি সেই উপায়

দেখছি না, যা' আমার ইন্দ্রিয়সমূহের বিষন্নতা দূর করতে পারে। যখন ব্যাকুলতা দূর হবে না, তখন তাতে আমার প্রয়োজন নেই। যোগেশ্বর বললেন– এই যুদ্ধে পরাজিত হলে দেবত্ব এবং জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি লাভ করবে এবং এখানে একাদশ অধ্যায়ে বলছেন যে এই শত্রুগণ আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, যশলাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। পুনরায় সেই একই কথা বলছেন, যে বিষয়ে অর্জুন শঙ্কিত, স্থিতিই যা' লাভ করে তিনি নিজের শোক নিবারণের কোন উপায় দেখছেন না, অন্তরে সক্রিয় তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ কি সেই রাজ্যই প্রদান করবেন ? না, বস্তুতঃ সমস্ত বিকার শান্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমাত্মস্বরূপে বাস্তবিক সমৃদ্ধি, যা' স্থির সম্পত্তি। যা' কখনও বিনাশ হয় না, এই হ'ল রাজযোগের পরিণাম।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪।।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য বহু যোদ্ধাকে আমি পূর্বেই নিহত করেছি, সেই বীর যোদ্ধাগণকে তুমি বধ কর। ভীত হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করবে অতএব যুদ্ধ কর। এখানেও যোগেশ্বর বললেন যে আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, সেই মৃতদেরই তুমি বধ কর। স্পষ্ট করলেন যে, আমি কর্তা, যদিও পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩-১৪ এবং ১৫শে শ্লোকে তিনি বলেছিলেন যে ভগবান অকর্তা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে শুভ অথবা অশুভ প্রত্যেক কার্য সম্পন্ন হওয়ার পিছনে পাঁচটি মাধ্যম কাজ করে–অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব। যাঁরা বলেন কৈবল্য স্বরূপ পরমাত্মা প্রদান করেন, তাঁরা অবিবেকী, যথার্থ জানেন না অর্থাৎ পরমাত্মা করেন না, এইরূপ বিরোধাভাস কেন ?

বস্তুতঃ প্রকৃতি এবং সেই পরমাত্ম-পুরুসের মাঝে একটা সীমারেখা আছে। যতক্ষণপর্যন্ত প্রকৃতির পরমাণুগুলির প্রভাব বেশী থাকে ততক্ষণ মায়া প্রেরণা প্রদান করে এবং যখন সাধক তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, ঈশ্বর, ইষ্ট অথবা সদ্‌গুরুর কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন থেকে সদ্‌গুরু ইষ্ট (একথা স্মরণীয় যে, প্রেরকের জায়গায় সদ্‌গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, ইষ্ট, ভগবান পর্যায়ভুক্ত। যা' কিছু বলুন, ভগবানই

বলেন।) হৃদয়ে রথী হয়ে যান, অন্তরে সক্রিয় হয়ে সেই অনুরাগী সাধকের পথ-সঞ্চালন করেন।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন– "হো, যে পরমাত্মার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে আছে, আমরা যে স্তরে দাঁড়িয়ে, যতক্ষণ সেই স্তরে নেমে এসে আত্মা থেকে জাগ্রত না হয়ে যান ততক্ষণ সঠিক সাধনের আরম্ভই হয় না। তারপর সাধকদ্বারা যা' কিছু সম্ভব হয়, সব তাঁরই কৃপা। সাধক নিমিত্ত মাত্র হয়ে তাঁর সঙ্কেত ও আদেশ অনুযায়ী চলতে থাকেন শুধু। সাধক যে জয়লাভ করেন তা'ও তাঁর কৃপা। এইরূপ অনুরাগীর জন্য ইষ্ট নিজের দৃষ্টিতে দেখেন, দেখিয়ে দেন এবং নিজের স্বরূপপর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান।" একথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমার দ্বারা নিহত এই শত্রুদের বধ কর। নিঃসন্দেহে তুমি জয়লাভ করবে, আমি যে দাঁড়িয়ে।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫।।

সঞ্জয় বললেন– (যা' কিছু অর্জুন দর্শন করেছেন, সেইরূপ সঞ্জয়ও দর্শন করেছেন। অজ্ঞানাবৃত মনই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র; কিন্তু এইরূপ মনও সংযমের মাধ্যমে উত্তমরূপে দেখে, শোনে ও বোঝে।) কেশবের উপর্যুক্ত এই কথা শুনে কিরীটধারী অর্জুন ভীত হয়ে কম্পিত দেহে করজোড়ে প্রণামপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার গদ্‌গদ ভাবে বললেন–

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬।।

হে অন্তর্যামী হৃষীকেশ! এটা যুক্তিযুক্ত যে আপনার কীর্তিতে সংসার আনন্দিত হয় এবং অনুরাগী হয়। আপনার মহিমাতে ভীত হয়ে রাক্ষসগণ নানাদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ আপনার মহিমা দেখে আপনাকে নমস্কার করেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ।।৩৭।।

হে মহাত্মন্! ব্রহ্মারও আদিকর্তা সকলের শ্রেষ্ঠ আপনাকে সকলে কেন নমস্কার করবেন না; কারণ হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! সৎ, অসৎ এবং উভয়ের অতীত যে অক্ষর অর্থাৎ অক্ষয় স্বরূপ তা আপনি। অর্জুন এই অক্ষয় স্বরূপের দর্শন করেছিলেন। কেবল বৌদ্ধিক স্তরে কল্পনা করলে অথবা স্বীকার করে নিলেই এইরূপ অক্ষয়স্থিতি লাভ হয় না। অর্জুনের প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁর আন্তরিক অনুভূতি। তিনি সবিনয়ে বললেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮।।

আপনি আদিদেব এবং সনাতন পুরুষ। আপনি এই জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা, জানবার যোগ্য এবং পরমধাম। হে অনন্তস্বরূপ! আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনি সর্বত্র বিরাজমান।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯।।

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও পিতা। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্য নমস্কার করে অর্জুনের তৃপ্তি হচ্ছে না। তিনি বলছেন–

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।৪০।।

হে অত্যন্ত সামর্থ্যবান্! আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করছি, আপনাকে পশ্চাতে নমস্কার করছি। হে সর্বাত্মন্! আপনাকে সকলদিক্ থেকেই নমস্কার করছি; কারণ হে অসীম পরাক্রমশালী! আপনি সকলদিক্ থেকে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে স্থিত, সেইজন্য আপনিই সর্বরূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান। এইরূপ বারংবার নমস্কার করে ভীত অর্জুন নিজের সমস্তভুলের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন–

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎপ্রণয়েন বাপি।।৪১।।

আপনার এই প্রভাব না জেনে আপনাকে সখা, মিত্র ভেবে প্রেম অথবা প্রমাদহেতু হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! এইরূপ সবিনয়ে সম্বোধন করে যা' বলেছি। এবং–

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪২।।

হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন এবং ভোজনাদিতে একাকী অথবা বন্ধুজন সমক্ষে আপনাকে যে অসম্মান করেছি, সেই সমস্ত অপরাধ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত আপনার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি। কিভাবে ক্ষমা করবেন?–

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩।।

আপনি এই চরাচর জগতের পিতা, গুরুর থেকেও শ্রেষ্ঠ গুরু এবং পূজ্য। যাঁর কোন প্রতিমা নেই, এইরূপ অপ্রতিম প্রভাবশালিন্! আপনার সমান ত্রিলোকে আর কেউ নেই, তাহলে বেশী কি করে হবে? আপনি সখাও নন, সমকক্ষ যে জন, সেই সখা হয়।

তস্মাৎপ্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।।৪৪।।

আপনি চরাচরের পিতা, সেইজন্য আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, স্তুতির যোগ্য ঈশ্বর আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন প্রিয়া স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কি অপরাধ করে ছিলেন? কখনও হে যাদব! হে সখা! হে কৃষ্ণ! বলেছিলেন। সকলের সামনে বলেছিলেন অথবা একাকী বলেছিলেন। ভোজনের সময় অথবা শয়নকালে বলেছিলেন। কৃষ্ণ বলা কি অপরাধ? কালো ছিলেনই, গৌর কিরূপে কেউ বলতেন? যাদব বলাও অপরাধ হয়নি; কারণ তাঁর জন্ম তো যদুবংশে হয়েছিল। সখা বলাও অপরাধের কিছু নয়; কারণ শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে অর্জুনের সখা বলে মনে করতেন। কৃষ্ণ বলা যখন অপরাধ, একবার কৃষ্ণ বলেছিলেন সেইজন্য অর্জুন অনন্তবার ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন, তাহলে কোন নাম জপ করা হবে? কোন নাম নেবেন?

বস্তুতঃ চিন্তনের যে বিধান যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন, আপনি সেই ভাবেই করুন। পূর্বে তিনি বলেছেন '**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।**'- অর্জুন! 'ওঁ' এই হল অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, তুমি এর জপ এবং ধ্যান আমার কর; কারণ সেই পরমভাব-এ স্থিতি লাভ করার পর সেই মহাপুরুষের নামও তাই, যা' সেই অব্যক্তের পরিচায়ক। প্রভাব দর্শনের পরে অর্জুন অনুভব করলেন যে–ইনি কালোও নন, গৌরও নন, সখাও নন, যাদবও নন, ইনি অক্ষয় ব্রহ্মের স্থিতিপ্রাপ্ত মহাত্মা।

সম্পূর্ণ গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাতবার 'ওঁ' জপ করবার উপর জোর দিয়েছেন। আপনি যদি জপ করতে চান, তাহলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ না বলে 'ওঁ' জপ করুন। প্রায়ই ভাবুকেরা কোন না কোন পথ খুঁজে নেন। কেউ কেউ 'ওঁ' জপ করার অধিকার-অনাধিকারের চর্চায় ভীত, কেউ মহাত্মাদের দোহাই দেন, অনেকে কেবল কৃষ্ণই নয়, তাঁর নামের আগে রাধা, গোপীদের নামও তাঁর শীঘ্র প্রসন্নতার লোভে জপ করেন। পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, সেইজন্য তাদের এইরূপ জপ ভাবুকতা মাত্র। যদি আপনি সত্য সত্যই ভক্ত, তাহলে তাঁর আদেশ-পালন করুন। তিনি অব্যক্তে স্থিত হলেও আজ তাঁকে তো আপনি কাছে পাচ্ছেন না কিন্তু তাঁর বাণী তো আপনার কাছে আছে। তাঁর আজ্ঞা-পালন করুন, অন্যথা ভেবে দেখুন গীতাশাস্ত্রে আপনার স্থান কি? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই যে "**অধ্যেষ্যতে চ য ইমং শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।**" যিনি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, তিনি জ্ঞান এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত হন, শুভ লোক লাভ করেন। অতএব অধ্যয়ন নিশ্চয় করুন।

প্রাণ-অপান-এর চিন্তনে 'কৃষ্ণ' নামের ক্রম ধরা পড়ে না। অনেকে ভাবপ্রবণ হওয়ার জন্য 'রাধে-রাধে' বলা আরম্ভ করেছেন। আজকাল অধিকারীদের দিয়ে কার্যসিদ্ধি না হলে পরে অধিকারী মহাশয়ের আত্মীয় স্বজনদ্বারা, প্রেমিকা অথবা পত্নী সম্পর্কের সূত্রধরে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। তাই লোকে চিন্তা করে যে বোধ হয় ভগবানের ঘরের ব্যবস্থাও এইরূপ, অতএব তাঁরা 'কৃষ্ণ' বলা বন্ধ করে 'রাধে-রাধে' বলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'রাধে রাধে! শ্যাম মিলা দে'। যে রাধার শ্যামের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর, দ্বিতীয়বার শ্যামের সঙ্গে মিলন হয়নি, সেই রাধা আপনার সঙ্গে শ্যামের মিলন কি করে করিয়ে দেবে? অতএব অন্য কারও কথা না শুনে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ আপনি পালন করুন, জপ করুন ওঁ।

এটা ঠিক যে রাধা আমাদের আদর্শ, ততটাই শ্রদ্ধা ও সমর্পণের সঙ্গে আমাদেরও প্রবৃত্ত হতে হবে। যদি আপনি ঈশ্বর লাভের ইচ্ছুক, তাহলে রাধার মত বিরহী হতে হবে।

পরেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করেছেন। 'কৃষ্ণ' তাঁর প্রচলিত নাম ছিল। এইরূপ কয়েকটাই নাম ছিল, যেমন 'গোপাল'। অনেক সাধক গুরু-গুরু অথবা গুরুর প্রচলিত নাম ভাবুকতাবশতঃ জপ করতে চান; কিন্তু প্রাপ্তির পর প্রত্যেক মহাপুরুষের সেই এক নাম, যে অব্যক্তে তিনি স্থিত। অনেক শিষ্য জিজ্ঞাসা করে- "গুরুদেব! ধ্যান যখন আপনার করব, তখন পুরোনো নাম 'ওঁ' ইত্যাদি কেন জপ করব, 'গুরু-গুরু' অথবা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কেন জপ করব না।" কিন্তু এখানে যোগেশ্বর স্পষ্ট করলেন যে, অব্যক্ত স্বরূপে বিলয়ের পর মহাপুরুষেরও সেই একই নাম হয়, যাতে তিনি স্থিত হন। 'কৃষ্ণ' সম্বোধন ছিল, জপ করার নাম ছিল না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন, তাঁকে স্বাভাবিকরূপ ধারণ করবার জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজী হলেন, সহজরূপ ধারণ অর্থাৎ তাঁকে ক্ষমা করলেন। অর্জুন নিবেদন করলেন—

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫।।

এখনও পর্যন্ত অর্জুনের সমক্ষে যোগেশ্বর বিশ্বরূপে দাঁড়িয়ে। সেইজন্য অর্জুন বলছেন যে, যা' পূর্বে আমি দেখিনি, আপনার সেই আশ্চর্যময় রূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং আমার মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলও হয়েছে। আগে সখা বলে মনে করতেন, ধনুর্বিদ্যায় নিজেকে শ্রেষ্ঠই মনে করতেন; কিন্তু এখন প্রভাব দেখে ভয় হয়েছে। পূর্ব অধ্যায়ে প্রভাব শুনে তিনি নিজেকে জ্ঞানী বলেই ভেবেছিলেন। জ্ঞানী কোথাও ভয় পান না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব বিলক্ষণ হয়। সবকিছু শোনা ও স্বীকার করার পরও সেই পথে চলে সমস্ত জানা বাকী থাকে। তিনি বলছেন—যা' পূর্বে দেখিনি, আপনার সেইরূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার

মন ভয়ে ব্যাকুল হয়েছে। অতএব হে দেব! আপনি প্রসন্ন হোন। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি আপনার সেইরূপই আমাকে দেখান। কোন রূপ?—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভূজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।।৪৬।।

আমি আপনাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারীরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। সেইজন্য হে বিশ্বরূপে! হে সহস্রবাহু! আপনি আপনার সেই চতুর্ভুজ স্বরূপ ধারণ করুন। কিরূপে দেখতে চাইলেন? চতুর্ভুজরূপে। এখন দেখতে হয় যে চতুর্ভুজ রূপটি কি?

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।।৪৭।।

অর্জুনের এইরূপ প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন— অর্জুন! আমি অনুগ্রহপূর্বক স্বীয় যোগশক্তির প্রভাবে আমার পরম তেজোময়, সকলের আদি এবং অন্তশূণ্য বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ পূর্বে এই রূপ দর্শন করে নি।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮।।

অর্জুন! এই মনুষ্যলোকে বেদদ্বারা, যজ্ঞদ্বারা, অধ্যয়নদ্বারা, ক্রিয়াদ্বারা বা কঠোর তপস্যাদ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ তোমা ভিন্ন কেউ দর্শন করতে পারে নি

অর্থাৎ তোমা ভিন্ন অন্য কেউ এইরূপ দর্শন করতে পারবে না। তাহলে গীতাশাস্ত্র আপনার জন্য নয়। ভগবদ্‌দর্শনের যোগ্যতাও অর্জুন পর্যন্তই সীমিত থেকে গেল, কিন্তু পূর্বে বলেছেন যে, অর্জুন! রাগ, ভয় এবং ক্রোধরহিত হয়ে অনন্যভাবে আমার শরণাগত বহুলোক জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ লাভ করেছেন। এখানে বলছেন–তুমি ভিন্ন অন্য কেউ দর্শন করেনি এবং ভবিষ্যতেও অন্য কেউ দর্শন করতে সমর্থ হবে না। অতএব অর্জুন কে? কোন পিণ্ডধারী কি? কোন দেহধারী? না; বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। অনুরাগরহিত পুরুষ কখনও দর্শন পাননি এবং ভবিষ্যতেও দর্শন পাবেন না। সর্বদিক্ থেকে চিত্তকে সংযত করে একমাত্র ইষ্টের অনুরূপ রাগই অনুরাগ। অনুরাগের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তির বিধান।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯।।

এই প্রকার আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তুমি ব্যাকুল ও বিমূঢ় হয়ো না, অন্যথা ভীত হয়ে পৃথক হয়ে যাবে। এখন তুমি ভয়ত্যাগ করে প্রসন্নচিত্তে আমার এইরূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপ পুনরায় দর্শন কর।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।৫০।।

সঞ্জয় বললেন– সর্বত্র বাস করেন যিনি, সেই বাসুদেব অর্জুনকে এইরূপ বলে পুনরায় নিজের সেইরূপ তাঁকে দেখালেন। পুনরায় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ 'সৌম্যবপুঃ' অর্থাৎ প্রসন্ন হয়ে ভীত অর্জুনকে ধৈর্য প্রদান করলেন। অর্জুন বললেন–

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১।।

জনার্দন! আপনার এই অত্যন্ত শান্ত মানুষরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম। অর্জুন বলেছিলেন– ভগবন্! এখন আপনি আমাকে সেই চতুর্ভুজ স্বরূপের দর্শন করান। যোগেশ্বর দর্শন করিয়েছিলেন; কিন্তু অর্জুন কি দেখতে পেয়েছিলেন? **'মানুষং রূপং'**- মানুষরূপে দেখেছিলেন। বস্তুতঃ প্রাপ্তির পর মহাপুরুষকেই চতুর্ভুজ ও অনন্তভুজ বলা হয়। দুই বাহুবিশিষ্ট মহাপুরুষ তো অনুরাগীর সম্মুখে আছেনই; কিন্তু অন্য কোন স্থান থেকে যদি কেউ স্মরণ করেন তখন সেই স্মরণকর্তার অন্তরে সক্রিয় হয়ে (রথী হয়ে) তাঁরও মার্গদর্শন করেন। 'বাহু' কার্যের প্রতীক। তিনি অন্তরেও কার্য করেন এবং বাহিরেও, এই হ'ল চতুর্ভুজ স্বরূপ। তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ক্রমশঃ বাস্তবিক লক্ষ্যঘোষ, সাধন-চক্র-এর প্রবর্তন, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন এবং নির্মল-নির্লিপ্ত কার্য-ক্ষমতার প্রতীক মাত্র। এই কারণেই চতুর্ভুজরূপে তাঁকে দর্শন করেও অর্জুন তাঁকে মানুষ রূপেই দেখতে পেলেন। মহাপুরুষের দেহ এবং স্বরূপের মাধ্যমে কার্য করার বিধি-বিশেষের নাম চতুর্ভুজ। কোন চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন না।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২।।

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! আমার এই রূপদর্শন করা অতিদুর্লভ, যেইরূপ তুমি দেখলে; কারণ দেবতাগণও সদা এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। বস্তুতঃ সকলেই মহাপুরুষ চিনতে পারে না। 'পূজ্য সৎসঙ্গী মহারাজ' অন্তঃপ্রেরণাযুক্ত পূর্ণ মহাপুরুষ ছিলেন; কিন্তু লোকে তাঁকে পাগল বলে মনে করত। কোন কোন পুণ্যাত্মার প্রতি আকাশবাণী হয়েছিল যে, ইনি সদ্‌গুরু; কেবল সেই পুণ্যাত্মাগণ তাঁর স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং স্বরূপ লাভ করে পরমগতি লাভ করেছিলেন। সেই

কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যাঁদের হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ জাগ্রত, সেই দেবতাগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। তাহলে যজ্ঞ, দান অথবা বেদাধ্যয়ন দ্বারা আপনার দর্শন কি সম্ভব? সেই মহাত্মা বলছেন–

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।৫৩।।

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করলে সেইরূপ বেদ, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞদ্বারা দর্শন করা যায় না। তাহলে আপনার দর্শনের কি কোন উপায় নেই? সেই মহাত্মা বলছেন, এক উপায়ে সম্ভব–

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।৫৪।।

হে শ্রেষ্ঠ তপস্বী অর্জুন! অনন্য ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ আমা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্মরণ না করে, অনন্য শ্রদ্ধাদ্বারা আমি এইরূপ প্রত্যক্ষ করতে, তত্ত্বতঃ জানার জন্য এবং প্রবেশের জন্যও সুলভ অর্থাৎ তাঁকে লাভ করার একমাত্র সুগম মাধ্যম অনন্য ভক্তি। শেষে জ্ঞানও অনন্যভক্তিতে পরিণত হয়। (যা' সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।) পূর্বে তিনি বলেছেন যে, তুমি ভিন্ন কেউ দর্শন করেনি এবং দর্শন করবে না; কিন্তু এখানে বলছেন, অনন্যভক্তি শুধু কেবল প্রত্যক্ষ করা নয়, বরং সাক্ষাৎ জানা এবং আমাতে বিলীন হওয়াও সম্ভব, অর্থাৎ অর্জুন অনন্যভক্তের নাম, অবস্থা-বিশেষের নাম। অনুরাগই অর্জুন। শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫।।

হে অর্জুন! যে পুরুষ আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ নিয়ত কর্ম যজ্ঞার্থ কর্ম করেন, '**মৎপরমঃ**'- মৎপরায়ণ কর্মকারী, যিনি আমার অনন্যভক্ত, কিন্তু '**সঙ্গবর্জিতঃ**'- সঙ্গদোষ থাকলে সেই কর্ম হয় না। অতএব সঙ্গদোস মুক্ত '**নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু**'- সর্বভূতের প্রতি বৈরভাববিহীন যিনি, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

তাহলে কি অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন? প্রতিজ্ঞা করে তিনি কি জয়দ্রথাদিকে বধ করেছিলেন? যদি তাদের বধ করে থাকতেন তাহলে ভগবানের দর্শন পেতেন না; পরন্তু অর্জুন দর্শন করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য যুদ্ধের সমর্থন করে না। যিনি নির্দিষ্ট কর্ম যজ্ঞের প্রক্রিয়ার আচরণ করেন, অনন্যভাবে তাঁকে ভিন্ন অন্যের স্মরণপর্যন্ত করেন না, সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ বাস করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি যুদ্ধ কিরূপে করবেন? যখন আপনার সঙ্গে কেউ নেই, তখন আপনি যুদ্ধ কার সঙ্গে করবেন? সর্বভূতের প্রতি বৈরভাববিহীন যিনি, কাউকে কষ্ট দেওয়ার কল্পনাপর্যন্ত করেন না, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন- তাহলে কি অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন? না।

বস্তুতঃ সঙ্গদোষ থেকে পৃথক বাস করে আপনি যখন অনন্য চিন্তনে প্রবৃত্ত হবেন, নির্ধারিত যজ্ঞের ক্রিয়ায় নিযুক্ত হবেন, সেই সময় পরিপন্থী রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দুর্জয় শত্রু বাধারূপে আক্রমণ করবে। তাদের অতিক্রম করে যাওয়াই যুদ্ধ।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন বলেছিলেন– ভগবন্! আপনার বিভূতি সকল আমি বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করলাম, যার দ্বারা আমার মোহনাশ হয়েছে, অজ্ঞান দূর হয়েছে; কিন্তু যেরূপ আপনি বললেন যে, সর্বত্র আমি, তা' আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। যদি আমি সেইরূপ দেখার যোগ্য, তাহলে কৃপা করে আমাকে সেই স্বরূপ দেখান। অর্জুন প্রিয়সখা, অনন্য সেবক ছিলেন, সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রতিবাদ না করে সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে আরম্ভ করলেন, বললেন– এখন আমাতে স্থিত সপ্তর্ষি এবং তাঁদেরও পূর্বকালীন ঋষিগণকে দেখ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে দেখ। সর্বত্র বিস্তারিত আমার তেজ দেখ। আমার দেহমধ্যে অবস্থিত তুমি বিশ্ব চরাচর দেখ; কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পেলেন না। এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দু-তিনটি শ্লোকপর্যন্ত অনবচ্ছিন্ন দেখিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পাননি। সমস্ত বিভূতি যোগেশ্বরের মধ্যে সেই সময়ও ছিল; কিন্তু অর্জুন তাঁকে সামান্য ব্যক্তির মতই দেখতে পাচ্ছিলেন, এইরূপ দেখাতে দেখাতে সহসা

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ থেমে গিয়ে, বলেছিলেন– অর্জুন! এই চোখে তুমি আমাকে দর্শন করতে সমর্থ হবে না। নিজবুদ্ধিদ্বারা আমাকে পরখ করতে পারবে না। এখন আমি তোমাকে সেই দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি আমার দর্শন করতে সমর্থ হবে। ভগবান তো সম্মুখে ছিলেনই। অর্জুন দর্শন করলেন, বাস্তবে দর্শন করলেন। দর্শন করে ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করতে লাগলেন, যা' বাস্তবে ত্রুটি ছিল না। উদাহরণস্বরূপ– ভগবন্! আমি কখনও আপনাকেও কৃষ্ণ, যাদব এবং কখনও সখা বলে সম্বোধন করেছি, এই সমস্ত ত্রুটির জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি ক্ষমাও করলেন; কারণ অর্জুনের প্রার্থনা স্বীকার করে তিনি সৌম্যস্বরূপ ধারণ করলেন, ধৈর্য প্রদান করলেন।

বস্তুতঃ কৃষ্ণ বলা অপরাধ ছিল না। তিনি শ্যামবর্ণের ছিলেনই, গৌর কি করে কেউ বলত? যদুবংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে অর্জুনের সখা বলে মনে করতেন। বাস্তবে প্রত্যেক সাধক 'মহাপুরুষ'কে শুরুতে এই রূপই মনে করেন। কিছু লোক তাঁদের রূপ ও আকার অনুসারে, কিছু লোক তাঁদের বৃত্তি অনুসারে সম্বোধন করেন এবং কিছু তাঁদেরকে নিজের সমকক্ষ বলে মনে করেন, তাঁদের যথার্থস্বরূপ বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য স্বরূপ যখন অর্জুন দেখলেন তখন অনুভব করলেন যে, ইনি কালোও নন, গৌরও নন, কোন কুলেরও নন এবং কারও সঙ্গী, সাথীও নন। এঁর সমান কেউ নয়, তাহলে সখা বা সমান কি করে হবেন? এই স্বরূপ অচিন্ত্য। যাঁকে ইনি দেখিয়ে দেন, তিনিই দেখতে সমর্থ হন। সেইজন্য অর্জুন নিজের প্রারম্ভিক সমস্তভুলের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন।

এখন প্রশ্ন যে, কৃষ্ণ বলা যদি অপরাধ, তবে তাঁর কোন্ নাম জপ করা হবে? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যা' জপ করার জন্য জোর দিয়েছেন, জপের যে বিধি বলেছেন, সেই বিধি অনুসারেই আপনি চিন্তন-স্মরণ করুন। তা' হল– '**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।**'– 'ওঁ' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক। '**ও অহম্ স ওম্**'– যা' ব্যাপ্ত চতুর্দিকে, সেই সত্তা আমাতেও বিদ্যমান, এই হ'ল 'ওঁ'-এর অর্থ। আপনি এর জপ এবং ধ্যান আমার করুন। রূপ নিজের এবং নাম 'ওঁ' বললেন।

অর্জুন চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করতে প্রার্থনা করলেন। সেই সৌম্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করলেন। অর্জুন বললেন– ভগবন্! আপনার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখে

আমি এখন প্রকৃতিস্থ হলাম। দেখতে চেয়েছিলেন চতুর্ভুজরূপ, দেখালেন 'মানুষং রূপং'। বাস্তবে যিনি শাশ্বতে স্থিত সেই যোগীর দেহটা দেখা যায় বহু লোকের মাঝে বসে; কিন্তু যেখান থেকেই কোন ভক্ত অন্তর থেকে তাঁকে স্মরণ করেন, সেখানেই তাঁদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে একসঙ্গে সর্বত্র প্রেরকরূপে কাজ করেন। তাঁদের কার্যের প্রতীক বাহু, এই হল চতুর্ভুজের তাৎপর্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন— অর্জুন! তুমি ভিন্ন কেউ এই রূপদর্শন করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ দর্শন করতে সমর্থ হবে না। তাহলে কি গীতাশাস্ত্র আমাদের জন্য নয়? তা নয়, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন— একটা উপায় আছে। যিনি আমার অনন্য ভক্ত, অন্য কারও স্মরণ না করে যিনি নিরন্তর আমারই চিন্তন করেন, তাঁর অনন্য ভক্তির বলে আমি প্রত্যক্ষ করার (যে রূপ তুমি দেখলে), তত্ত্বতঃ জানার এবং স্থিত হবার জন্য সুলভ। অর্থাৎ অর্জুন অনন্য ভক্ত ছিলেন। ভক্তির পরিমার্জিত রূপ অনুরাগ, ইষ্টের অনুরূপ নিষ্ঠা। **'মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা।'**— অনুরাগরহিত পুরুষ কখনও লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। অনুরাগী না হলে, কেউ লক্ষ যোগ করুক, জপ, তপস্যা অথবা দান করুক 'তাঁকে' লাভ করে না। অতএব ইষ্টের অনুরূপ রাগ অথবা অনন্য ভক্তি নিতান্ত আবশ্যক।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম কর, আমার অনন্যভক্ত, আমার শরণাগত হয়ে কর, কিন্তু সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করবে। সঙ্গদোষ থাকলে এই কর্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব এই কর্ম সম্পাদনের পথে সঙ্গদোষ বাধকের কাজ করে। যিনি বৈরভাবরহিত, তিনি আমাকে লাভ করেন। যেখানে সঙ্গদোষ নেই, যেখানে আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই, বৈরভাবের সঙ্কল্প নেই, সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ কি রূপে সম্ভব? সংসারে লড়াই-ঝগড়া হতেই থাকে; কিন্তু যাঁরা এই সাংসারিক যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাঁরাও বাস্তবিক বিজয়লাভ করেন না। দুর্জয় সংসাররূপ শত্রুকে অসঙ্গতরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করে 'পরম-এ' স্থিতিলাভ করাই বাস্তবিক বিজয়, এর পর পরাজয় নেই।

বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দৃষ্টি প্রদান করলেন, তারপর নিজের বিশ্বরূপের দর্শন করিয়েছিলেন। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎষু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগো' নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।।১১।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ' নামক একাদশ অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগো' নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।।১১।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ' নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।।

একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বার বার জোর দিয়েছেন যে, অর্জুন! আমার এই স্বরূপ, যা' তুমি দর্শন করলে, তুমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ দেখতে সমর্থ হবে না। তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানদ্বারা আমার দর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু অনন্য ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত অন্যত্র কেথাও যেন শ্রদ্ধা না যায়, নিরন্তর তৈলধারার ন্যায় চিন্তনদ্বারা ঠিক এইরূপ যে রূপ তুমি দর্শন করলে, আমি প্রত্যক্ষ করার জন্য, তত্ত্বতঃ জানার জন্য এবং স্থিতিলাভ করার জন্যও সুলভ। অতএব অর্জুন! নিরন্তর আমার চিন্তন কর, ভক্ত হও। অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছিলেন, অর্জুন! তুমি আমার দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর! **'মৎপরমঃ'**- মৎপরায়ণ হয়ে কর। তাঁর প্রাপ্তির মাধ্যম অনন্য ভক্তি। অর্জুনের এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ছিল যে, যিনি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন এবং যিনি সগুণ আপনার উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

অর্জুন তৃতীয়বার এই প্রশ্নটি করলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন, ভগবন্! যদি নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা সাংখ্যযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন– অর্জুন! নিষ্কাম কর্মমার্গ ভাল লাগুক অথবা জ্ঞানমার্গ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে। এরপরও যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্বক রোধ করে মনে মনে বিষয়-চিন্তন করে, যে অহঙ্কারী, জ্ঞানী নয়। অতএব অর্জুন! তুমি কর্ম কর। কি কর্ম? সেই কর্ম **'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং'**- আমার দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কি? তখন বললেন--যজ্ঞের প্রক্রিয়া হ'ল একমাত্র কর্ম। যজ্ঞের বিধি বললেন, যা' আরাধনা-চিন্তন-এর বিধি-বিশেষ, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা পরম-এ স্থিতি লাভ হয়। যখন নিষ্কাম কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে, যজ্ঞার্থ কর্ম করতে হবে, ক্রিয়া একটাই, তখন পার্থক্য কোথায়? যিনি ভক্ত তিনি ইষ্টকে সমস্ত কর্ম

সমর্পণ করে, ইষ্টের আশ্রিত হয়ে যজ্ঞার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং সাংখ্যযোগী যাঁরা, তাঁরা নিজের শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন। (আত্মনির্ভর হয়ে) যতটা পরিশ্রমের প্রয়োজন ততটা করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন– ভগবন্! কখনও আপনি সাংখ্য মাধ্যমে যে কর্ম করা হয়, তার প্রশংসা করছেন, কখনও সমর্পণ করে যে নিষ্কাম কর্ম করা হয়, তার প্রশংসা করছেন–উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোনটি? অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, কর্ম উভয়মার্গেই করতে হবে, তবুও তিনি শ্রেষ্ঠ মার্গটি বেছে নিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–অর্জুন! উভয় মার্গেই কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি আমাকেই লাভ করেন; কিন্তু সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মমার্গ শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করে কেউ যোগী বা জ্ঞানী হতে পারেন না। সাংখ্যযোগ দুষ্কর এবং তাতে বাধাও অনেক।

এখানে অর্জুন তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! আপনার প্রতি অনন্য ভক্তির সঙ্গে যুক্ত এবং অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনাতে (সাংখ্যমার্গদ্বারা) যাঁরা নিযুক্ত উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১।।

'এবং' অর্থাৎ এই যে বিধি, এখন আপনি বললেন, সেই বিধি অনুসারে যাঁরা অনন্য ভক্তির সঙ্গে আপনার শরণাগত হয়ে, নিরন্তর আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উত্তমরূপে আপনার উপাসনা করেন এবং অন্যান্য যাঁরা আপনাকে আশ্রয় না করে স্বতন্ত্ররূপে নিজের উপর নির্ভর করে সেই অক্ষয় এবং অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করেন, যাঁর মধ্যে আপনিও স্থিত, এই দুই প্রকার ভক্তমধ্যে অধিক উত্তম যোগবেত্তা কারা? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২।।

অর্জুন! আমাতে মনকে একাগ্র করে, নিরন্তর আমাতে সংযুক্ত ভক্তগণ পরম-এর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই আমার মতে অতি উত্তম যোগী।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।

সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩।।

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।৪।।

যে পুরুষগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে উত্তমরূপে সংযত করে, মন-বুদ্ধির চিন্তন থেকে অত্যন্ত ঊর্ধ্বে সর্বব্যাপী, অনির্বচনীয় স্বরূপ, সদা একরস, নিত্য, অচল, অব্যক্ত আকারশূণ্য এবং অবিনাশী ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত এবং যাঁরা সকলকেই সমান বলে মনে করেন, সেই যোগীগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের উপর্যুক্ত বিশেষণ আমার থেকে আলাদা নয়; কিন্তু–

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।৫।।

যাঁদের চিত্ত সেই অব্যক্ত পরমাত্মাতে আসক্ত, যেই পুরুষগণকে সাধন পথে অধিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়; কারণ অব্যক্ত বিষয়ক গতিলাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। যতক্ষণ দেহবোধ বিদ্যমান, ততক্ষণ অব্যক্তের প্রাপ্তি দুষ্কর।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদ্‌গুরু ছিলেন। অব্যক্ত পরমাত্মা তাঁর মধ্যে ব্যক্ত ছিলেন। তিনি বলছেন যে, মহাপুরুষের শরণাগত না হয়ে, যে সাধক আত্মনির্ভর হয়ে এগিয়ে যান যে, এখন আমি এই স্তরে, পরে এই স্তরে পৌঁছোব, আমি নিজের অব্যক্ত দেহলাভ করব, তা' আমারই স্বরূপ হবে এবং তাই আমার বাস্তবিকরূপ।– এইরূপ চিন্তন করে, প্রাপ্তির অপেক্ষা না করে নিজের দেহকেই 'সোঽহম্' বলেন। এই সাধনাপথের সবথেকে বড় বাধা এটাই। সেই সাধক **'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্'**- এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে থাকেন। কিন্তু যিনি আমার শরণাগত, তিনি–

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬।।

যাঁরা মৎপরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম অর্থাৎ আরাধনা আমাতে সমর্পণ করে অনন্যভাবে যোগ অর্থাৎ আরাধনা প্রক্রিয়ার দ্বারা নিরন্তর চিন্তন করে ভজনা করেন–

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি নচিরাৎপার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।৭।।

কেবল মদ্গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে আমি শীঘ্র উদ্ধার করি। এইরূপ চিত্ত নিযুক্ত করার প্রেরণা এবং বিধির উপর যোগেশ্বর আলোকপাত করলেন–

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।।৮।।

অতএব অর্জুন! আমাতে তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ করলে তুমি আমাতেই স্থিতিলাভ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মন সমাহিত এবং বুদ্ধি নিবিষ্ট করতে না পারলে, (অর্জুন পূর্বে বলেছিলেন যে, মনের গতিরোধ করা বায়ুর মত দুষ্কর বলে আমি মনে করি) এই প্রসঙ্গে যোগশ্বের শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯।।

যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে হে অর্জুন! যোগাভ্যাসের দ্বারা আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা কর। (বিক্ষিপ্ত চিত্তকে আকর্ষণ করে আরাধনা, চিন্তন-ক্রিয়াতে নিযুক্ত করার যত্নকে অভ্যাস বলে) যদি এরূপ করতে অক্ষম হও তাহলে–

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০।।

যদি তুমি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তাহলে কেবল আমার জন্য কর্ম কর অর্থাৎ আরাধনাতে যত্নবান হও। এইরূপ আমার প্রাপ্তির জন্য কর্ম করতে-করতেই তুমি আমাকে প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করবে অর্থাৎ অভ্যাস করতেও অসমর্থ হলে, সাধনায় প্রবৃত্ত থাক শুধু।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১।।

এও করতে যদি অসমর্থ হও, তাহলে সকল কর্মের ফলত্যাগ করে অর্থাৎ লাভ-লোকসানের চিন্তা ত্যাগ করে মদ্‌যোগের আশ্রয় করে অর্থাৎ সমর্পণের সঙ্গে আত্মবান্ মহাপুরুষের শরণাগত হও। তাঁর প্রেরণায় স্বতঃ কর্ম হতে থাকবে। সমর্পণের সঙ্গে কর্মফল ত্যাগের মহত্ব বর্ণনা করার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্‌ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎকর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২।।

কেবল চিত্তরোধ করার অভ্যাস থেকে জ্ঞানমার্গ দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানমার্গ দ্বারা কর্ম করা অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; কারণ ধ্যানে ইষ্ট থাকেন। ধ্যান থেকেও সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ ইষ্টের প্রতি সমর্পণের সঙ্গে যোগের উপর দৃষ্টি রেখে কর্মফলের ত্যাগ করলে তার যোগক্ষেমের দায়িত্ব ইষ্টের, সেইজন্য এই ত্যাগের পরেই পরমশান্তি লাভ হয়।

এখন পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, অব্যক্তের উপাসক জ্ঞানমার্গী অপেক্ষা সমর্পণের সঙ্গে কর্ম করেন যিনি, সেই নিষ্কাম কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। উভয়েই এক কর্ম করেন; কিন্তু জ্ঞানমার্গীর পথে ব্যবধান বেশী। তাঁর লাভ-লোকসানের দায়িত্ব তাঁর নিজের উপরই থাকে; কিন্তু যাঁরা সমর্পিত ভক্ত তাঁদের দায়িত্ব মহাপুরুষের উপর থাকে। সেইজন্য তাঁরা কর্মফল-ত্যাগ দ্বারা শীঘ্রই শান্তিলাভ করেন। ঐরূপ শান্তিপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩।।

ঐ শান্তিলাভ করেছেন যিনি, তিনি সকলভূতের প্রতি দ্বেষহীন, সকলের সুহৃদ্ এবং অহৈতুক দয়ালু, মমত্বশূণ্য, নিরহংকার, সুখ-দুঃখে সম এবং ক্ষমাশীল,

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪।।

যিনি নিরন্তর যোগের পরাকাষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত, লাভ এবং লোকসানে সন্তুষ্ট, যাঁর মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দেহ সংযত, দৃঢ়নিশ্চয়, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫।।

যাঁর দ্বারা কেউ উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি নিজেও কোন জীবের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় এবং সমস্ত বিক্ষোভ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

সাধকদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত উপযোগী। তাঁদের এমন ভাবে থাকা উচিত, যাতে তাঁদের দ্বারা কারও মনে আঘাত না লাগে। এটুকু সাধক নিশ্চয় করতে পারেন; কিন্তু অন্য ব্যক্তি এই আচরণ করবে না। তাঁরা সংসারী, তাই কটু কথা বলবেনই, ইচ্ছামত বলবেন; কিন্তু সাধকের হৃদয়ে যেন তাদের কটুবাক্য দ্বারা (তাঁদের আঘাত দ্বারা) বিক্ষোভ উৎপন্ন না হয়। ইষ্টচিন্তনে মগ্ন থাকবেন, যাতে কোন ব্যবধান উৎপন্ন না হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি রাস্তায় বাঁদিক দিয়ে হেঁটে চলেছেন, যদি কোন মাতাল তখন সামনে থেকে আষে, তাহলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াও আপনার কর্তব্য।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬।।

যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, ‘দক্ষঃ’ অর্থাৎ আরাধনার বিশেষজ্ঞ (এমন নয় যে চুরিতে দক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে কর্ম একটাই, নিয়ত কর্ম—আরাধনা-চিন্তন, যিনি তাতে দক্ষ), পক্ষ-বিপক্ষের অতীত, দুঃখমুক্ত, সমস্ত

আরম্ভের ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। করণীয় কোন কর্ম তাঁর দ্বারা আরম্ভ হবার জন্য বাকী থাকে না।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭।।

যিনি কখনও হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল কর্মফল পরিত্যাগ করেছেন, যেখানে শুভ পৃথক্ নেই, অশুভ বাকী নেই, ভক্তির পরাকাষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সেই পুরুষ আমার প্রিয়ভক্ত।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।১৮।।

যিনি শত্রুতে ও মিত্রে, মান ও অপমানে সম, যাঁর অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে শান্ত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে ও দুঃখে নির্বিকার এবং আসক্তিশূণ্য এবং–

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ।।১৯।।

যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় সম, মননশীলতার চরমসীমায় পৌঁছে যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত, যে কোন প্রকার দেহ-নির্বাহ যিনি সন্তুষ্ট, যিনি নিজ বাস-স্থানের প্রতি মমতাশূন্য, ভক্তির পরাকাষ্ঠাতে স্থিত সেই স্থিরবুদ্ধি পুরুষ আমার প্রিয়ভক্ত।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।।২০।।

যে সকল মৎপরায়ণ আন্তরিক শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ উপর্যুক্ত ধর্মময় অমৃতের উত্তমরূপে সেবন করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

নিষ্কর্ষ –

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন! তুমি ভিন্ন কেউ দর্শন করে নি এবং কেউ দর্শন পাবেও না-যেরূপ তুমি দেখলে; কিন্তু অনন্যভক্তি অথবা অনুরাগের সঙ্গে যিনি ভজনা করেন, তিনি আমার এই রূপ-দর্শন করতে

সক্ষম, তত্ত্বতঃ আমাকে জানতে পারেন এবং আমাতে স্থিতিলাভ করতে পারেন। অর্থাৎ পরমাত্মা এরূপ সত্তা, যাঁকে লাভ করা যায়। অতএব অর্জুন! তুমি ভক্ত হও।

বর্তমান অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! অনন্যভাবে যাঁরা আপনার চিন্তন করেন এবং অন্যান্য যাঁরা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে কারা উত্তম যোগবেত্তা? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, উভয়েই আমাকেই লাভ করেন, কারণ আমি অব্যক্ত স্বরূপ; কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করে অব্যক্ত পরমাত্মাতে আসক্ত, তাঁদের পথে কষ্ট বেশী হয়। যতক্ষণ দেহবোধ বিদ্যমান, ততক্ষণ অব্যক্তের প্রাপ্তি কষ্টকর; কারণ চিত্তের নিরোধ এবং বিলয়কালে অব্যক্ত স্বরূপ লাভ হয়। এই স্থিতির আগে সাধকের দেহই বাধকস্বরূপ। 'আমি', 'আমি', 'আমাকে লাভ করতে হবে'– বলতে বলতে নিজের দেহের দিকেই মনটা চলে যায়। তার বিচলিত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। অতএব অর্জুন! তুমি সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর, অনন্য ভক্তি সহকারে আমার চিন্তন কর। মৎপরায়ণ ভক্তগণ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, মানবদেহধারী সগুণ যোগীররূপ আমার ধ্যান করেন, তৈলধারাবৎ নিরন্তর চিন্তন করেন, আমি তাঁদের শীঘ্রই সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি। অতএব ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ।

অর্জুন! আমাতে মন সমাহিত কর। তা' যদি না পার তাহলে সমাহিত করার অভ্যাস কর। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলেই পুনরায় আকর্ষণ করে তাকে নিরুদ্ধ কর। তাতেও অক্ষম হলে তুমি কর্ম কর। কর্ম একটাই, যজ্ঞার্থ কর্ম। তুমি 'কার্যম কর্ম্' করে যাও মাত্র, অন্য কিছু নয়। তাতে উদ্ধার হও অথবা না হও। যদি তা'ও করতে অক্ষম, তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মবান্, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শরণাগত হয়ে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ কর। এইরূপ ত্যাগ করলে তুমি পরমশান্তি লাভ করবে।

তদনন্তর পরমশান্তিপ্রাপ্ত ভক্তের লক্ষণ বলার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন– যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, করুণাময় এবং দয়ালু, মমত্বশূণ্য এবং নিরহংকার, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যিনি ধ্যান-যোগ-এ নিরন্তর তৎপর, আত্মবান্ এবং আত্মস্থিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যাঁরদ্বারা কোন ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি স্বয়ং কোন ব্যক্তির দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যিনি পবিত্র, দক্ষ, যিনি সুখে ও দুঃখে নির্বিকার, যিনি সকল আরম্ভের ত্যাগী, মুক্ত, তিনি আমার

প্রিয়ভক্ত। সকল কামনা যিনি ত্যাগ করেছেন এবং যিনি শুভ-অশুভের ঊর্ধ্বে স্থিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যিনি প্রশংসা ও নিন্দায় সম এবং মৌন, যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত এবং মৌন, যিনি যে কোন প্রকার দেহ-নির্বাহ সন্তুষ্ট এবং বাসস্থানের প্রতি মমত্বশূণ্য, দেহরক্ষাতেও যাঁর আসক্তি নেই, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তিমান্ পুরুষ আমার প্রিয়ভক্ত।

এইভাবে ১১শ শ্লোক থেকে ১৯শ শ্লোকপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শান্তিপ্রাপ্ত যোগযুক্ত ভক্তের অবস্থিতির উপর আলোকপাত করলেন যা' সাধকদের জন্য বিশেষ উপযোগী। অবশেষে নির্ণয় করে তিনি বললেন—অর্জুন! যিনি মৎপরায়ণ, অনন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে উক্ত ধর্মময় অমৃতকে নিষ্কামভাবে উত্তমরূপে আচরণে পরিণত করেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত। অতএব সমর্পণের সঙ্গে এই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়স্কর; কারণ তাঁর লাভ-লোকসানের দায়িত্ব সেই ইষ্ট, সদ্গুরু নিয়ে নেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ মহাপুরুষের লক্ষণ বললেন, তাঁদের আশ্রয়ে যেতে বললেন এবং অবশেষে নিজের শরণাগত হওয়ার প্রেরণা প্রদান করে সেই মহাপুরুষগণের সমকক্ষ নিজেকে ঘোষিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগী, মহাত্মা ছিলেন।

বর্তমান অধ্যায়ে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, সেইজন্য অধ্যায়টির নামকরণ 'ভক্তিযোগ' যুক্তিসঙ্গত।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎষু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'ভক্তিযোগো' নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।।১২।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'ভক্তিযোগ' নামক দ্বাদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'ভক্তিযোগো' নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।।১২।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'ভক্তিযোগ' নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।।

গীতার আরম্ভেই ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধের ইচ্ছুক আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করল? কিন্তু এখনও বলা হয়নি যে, সেই ক্ষেত্র কোথায়? পরন্তু যে মহাপুরুষ যে ক্ষেত্রে যুদ্ধ বলেছেন, প্রস্তুত অধ্যায়ে সেই মহাপুরুষ স্বয়ং নির্ণয় করলেন যে, যে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়েছিল, সেই ক্ষেত্র বস্তুতঃ কোথায়?

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।১।।

কৌন্তেয়! এই দেহটাই একটা ক্ষেত্র এবং যিনি একে উত্তমরূপে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি এর মধ্যে আবদ্ধ নন বরং এর সঞ্চালক। সেই তত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষগণ এইরূপ বলেন।

দেহ তো একটাই, তবে এতে ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্র এইদুটি ক্ষেত্র একত্রে কিরূপে থাকতে পারে? বস্তুতঃ এই একটা দেহেরই অন্তরালে অন্তঃকরণের দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান। প্রথমটি পুণ্যময় প্রবৃত্তি দৈবী সম্পদ্, যা' পরমধর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে এবং দ্বিতীয়টি আসুরী সম্পদ্—দোষযুক্ত দৃষ্টিকোণে যার গঠন হয়, যা' এই নশ্বর সংসারে বিশ্বাস এনে দেয়। যখন আসুরী প্রবৃত্তির বাহুল্য ঘটে, তখন এই দেহই 'কুরুক্ষেত্র' এবং যখন এই দেহেরই অন্তরালে দৈবী সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন এই দেহকে 'ধর্মক্ষেত্র' বলা হয়। এই ওঠা-নামা নিরন্তর চলতে থাকে; কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে যখন কোন সাধক অনন্যভক্তি সহকারে আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন দুটি প্রবৃত্তির মধ্যে নির্ণায়ক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দৈবী সম্পদের ক্রমশঃ উত্থান এবং আসুরী সম্পদের পতন হয়। আসুরী সম্পদ্ সম্পূর্ণরূপে

শান্ত হবার পর পরম-এর দিগ্‌দর্শনের অবস্থাতে সাধক এসে পৌঁছান। দর্শনের পরে দৈবী সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। অতএব দৈবী সম্পদও তখন পরমাত্মাতে বিলীন হয়। ভজনকর্তা পুরুষ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন দেখলেন যে, কৌরব-পক্ষের পর পাণ্ডব-পক্ষেরও যোদ্ধা যোগেশ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। এই বিলীনের পর পুরুষের যে স্বরূপ, সেই স্বরূপকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এর পর দেখুন—

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।।২।।

হে অর্জুন! তুমি সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানবে অর্থাৎ আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই ক্ষেত্র-সম্বন্ধে অবগত, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ—এইরূপ তাঁকে সাক্ষাৎ যে মহাপুরুষগণ জানেন, তাঁরা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও যোগেশ্বর ছিলেন। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষকে তত্ত্বতঃ জানাই জ্ঞান, এইরূপ আমার অভিমত অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে তাদের জানাকেই জ্ঞান বলে। মিথ্যা তর্ক-বিতর্ককে জ্ঞান বলে না।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু।।৩।।

সেই ক্ষেত্র যেরূপ, যে যে বিকারযুক্ত, যে কারণে উৎপন্ন হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি ও যে যে প্রভাবযুক্ত, সে সমস্ত সংক্ষেপে শোন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্র বিকারযুক্ত, কোনো কারণে হয়েছে, পরন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ কেবল প্রভাবসম্পন্ন হয়। আমিই বলছি—তা নয়, ঋষিগণও বলেন—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্‌।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।৪।।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ঋষিগণ বহু প্রকারে বর্ণনা করেছেন। নানাপ্রকার বেদমন্ত্র দ্বারা বিভাজিত করে বলা হয়েছে এবং উত্তমরূপে নিশ্চিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহদ্বারাও এই তত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে। অর্থাৎ বেদ, মহর্ষি, ব্রহ্মসূত্র এবং আমি

একই কথা বলছি। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বলছেন, যা' এঁরা সকলেই বলেছেন। দেহ (ক্ষেত্র) কি এতটাই, যতটা দেখতে পাওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৫।।

অর্জুন! পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, জল, পাবক, গগন ও সমীর), অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত (চিত্তকে অব্যক্ত পরা প্রকৃতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ মূল প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যার মধ্যে পরা প্রকৃতিও সম্মিলিত, উপর্যুক্ত আটটিই অষ্টধা মূল প্রকৃতি) এবং দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু), মন ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) এবং–

ইচ্ছাঃ দ্বেষ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৬।।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিসংযুক্ত এই স্থূল দেহ পিণ্ড, চেতনা এবং ধৈর্য, এইরূপ এই সকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল। সংক্ষেপে ক্ষেত্রের স্বরূপ এটাই, যার মধ্যে ভাল-মন্দ যে বীজই বপন করা হয়, তা' পরে সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। দেহটাই ক্ষেত্র। কোন্-কোন্ উপাদানে মাল-মশলা দিয়ে এই দেহের গঠন হয়েছে? পাঁচতত্ত্ব, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন ইত্যাদি, যেরূপ লক্ষণ উপরে গোনা হয়েছে। এই সকলের সামূহিক সংঘাত এই পিণ্ডদেহ। যতক্ষণ এই বিকারগুলি থাকবে, ততক্ষণ এই পিণ্ডও থাকবে, কারণ এই দেহ বিকারগুলি দিয়ে তৈরী। এখন সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ দেখুন, যিনি এই ক্ষেত্রে লিপ্ত নন বরং তার থেকে নিবৃত্ত–

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৭।।

হে অর্জুন! মান-অপমানের অভাব, দম্ভশূণ্যতা, অহিংসা (নিজের এবং অন্যের আত্মাকে কষ্ট না দেওয়া অহিংসা। অহিংসার অর্থ কেবল এই নয় যে পিঁপড়া মেরো না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, নিজের আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যাওয়া হিংসা ও তার উত্থান শুদ্ধ অহিংসা। এইরূপ পুরুষ অন্যান্য আত্মার উত্থান হেতু উন্মুখ থাকেন।

হ্যাঁ, এর আরম্ভ হয় কাউকে কষ্ট না দেওয়া থেকে। এটা তারই একটা অঙ্গ।), ক্ষমা, মন-বাণীর সরলতা, আচার্যোপাসনা অর্থাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক সদ্‌গুরুর সেবা এবং তাঁর উপাসনা, পবিত্রতা, অন্তঃকরণের স্থিরতা, মন এবং ইন্দ্রিয়সহ দেহের নিগ্রহ এবং–

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্।।৮।।

ইহলোক এবং পরলোকের দেখা-শোনা সমস্ত ভোগের প্রতি আসক্তির অভাব, অভিমানশূণ্যতা, জন্ম-মৃত্যু, বৃদ্ধাবস্থা, রোগ ও ভোগাদিতে দুঃখদোষের পুনঃপুনঃ চিন্তন,

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।

নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।৯।।

পুত্র, স্ত্রী, ধন ও গৃহাদিতে আসক্তির অভাব, প্রিয় এবং অপ্রিয়ের প্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সমভাব (গৃহস্থের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ক্ষেত্রজ্ঞের সাধনা শুরু হয়।) যা'–

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জন সংসদি।।১০।।

আমাতে (শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন অর্থাৎ এইরূপ কোন মহাপুরুষে) অনন্য যোগে অর্থাৎ যোগের অতিরিক্ত অন্য কিছু স্মরণ না করে, অব্যভিচারিণী ভক্তি (ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কোন চিন্তন না আসা), নির্জনে বাস, মানুষের সমূহে বাস করার আসক্তি না হওয়া এবং–

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।১১।।

আত্মার আধিপত্যের জ্ঞানে একরস স্থিতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের অর্থস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার–এই সকলকে জ্ঞান বলে এবং এর বিপরীত যা' কিছু সমস্তই অজ্ঞান–এইরূপ বলা হয়েছে। সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে সম্যক্‌ভাবে জানা জ্ঞান,

(চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার পর পরিণামে যে জ্ঞানামৃত লাভ হয়, সেই জ্ঞানামৃত যিনি পান করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন। অতএব ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করে যা' জানা যায়, তাকেই জ্ঞান বলে। এখানেও তাই বলছেন যে, তত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের নাম জ্ঞান।) এর বিপরীত সমস্ত কিছু অজ্ঞান। অমানিত্ব ইত্যাদি উপর্যুক্ত লক্ষণ এই জ্ঞানের পূরক। এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ হল।

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।।১২।।

অর্জুন! যা জানার যোগ্য এবং যা' জেনে মরণধর্মা মানুষ অমৃত তত্ত্ব লাভ করে, তা' উত্তমরূপে বলব। সেই আদিহীন পরমব্রহ্মকে না সৎ বলা হয়, না অসৎ বলা হয়; কারণ যতক্ষণ তিনি পৃথক্, ততক্ষণ তিনি সৎ এবং যখন মানুষ তাঁরমধ্যে সমাহিত হয়, তখন কে কাকে বলবে। এক বোধ থেকে যায়, দ্বিতীয় বোধ থাকে না। এইরূপ স্থিতিতে সেই ব্রহ্ম সৎও নন, আবার অসৎও নন, বরং যা' স্বয়ংসহজ, তিনি তা'ই।

সর্বতঃপাণিপাদং তৎসর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৩।।

সেই ব্রহ্ম সর্বদিক্ থেকে হস্ত-পদযুক্ত, সর্বদিক্ থেকে চক্ষু-মস্তক-মুখযুক্ত এবং সর্বদিক্ থেকে শ্রোত্রযুক্ত, কর্ণযুক্ত; কারণ তিনি সংসারে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে স্থিত।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৪।।

তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে অবগত, তা'সত্ত্বেও তিনি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত নন। তিনি আসক্তিশূণ্য, গুণাতীত হয়েও সকলকে ধারণ-পোষণ করেন এবং সকল গুণের ভোক্তা অর্থাৎ এক-এক করে সকল গুণ নিজের মধ্যে লয় করে নেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা আমি। শেষে সমস্ত গুণ আমাতে বিলীন হয়।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৫।।

সেই ব্রহ্ম সকল জীবধারীর ভিতরে-বাইরে পরিপূর্ণ। চর ও অচররূপও তিনি। সূক্ষ্ম বলে তাঁকে দেখা যায় না, অবিজ্ঞেয়, মন-ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অতি কাছে ও দূরে তিনিই স্থিত।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৬।।

সেই ব্রহ্ম অবিভাজ্য হয়েও সম্পূর্ণ চরাচর ভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মা সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা, ভরণ ও পোষণকর্তা এবং শেষে সংহারকর্তা। এখানে বাহ্য এবং আন্তরিক দুইভাবের দিকেই সঙ্কেত করা হয়েছে। যেমন—বাইরে জন্ম এবং ভিতরে জাগৃতি, বাইরে পালন এবং ভিতরে যোগক্ষেমের নির্বাহ, বাইরে দেহের পরিবর্তন এবং অন্তরে সর্বস্বের বিলয় অর্থাৎ ভূতগণের উৎপত্তির কারণগুলির লয় এবং সেই লয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই স্বীয় স্বরূপলাভ হয়। এ সকল সেই ব্রহ্মের লক্ষণ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্।।১৭।।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি, তম থেকে বহু উর্ধ্বে বলা হয়েছে। তিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণজ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানদ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। সাক্ষাৎকারের পর যা' কিছু জানা যায়, তাকে জ্ঞান বলা হয়। এইরূপ জ্ঞানদ্বারাই সেই ব্রহ্মকে লাভ করা যেতে পারে। তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিত। তাঁর নিবাসস্থান হৃদয়। অন্যত্র খুঁজলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। অতএব হৃদয়ে ধ্যান এবং যোগাচরণের দ্বারাই সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তির বিধান।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৮।।

হে অর্জুন! এইরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হল। যা' জানার পরে আমার ভক্ত আমার সাক্ষাৎ স্বরূপলাভ করেন।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যাকে ক্ষেত্র বলেছিলেন, তাকেই প্রকৃতি এবং যাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেছিলেন, তাঁকেই এখন পুরুষ বলে ইঙ্গিত করলেন–

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।১৯।।

এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে এবং বিকারসকল ত্রিগুণ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২০।।

কার্য এবং করণের (যার দ্বারা শুভ কার্য করা হয়– বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি এবং অশুভ কার্য হওয়াতে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি করণ) উৎপত্তির প্রধান কারণ প্রকৃতি বলা হয় এবং পুরুষ সুখ ও দুঃখের উপলব্ধির কারণ বলা হয়।

প্রশ্ন ওঠে যে, পুরুষ কি ভোগ করতেই থাকবে অথবা এর হাত থেকে কখনও মুক্তিও পাবে? যখন প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, তখন এদের হাত থেকে নিস্তার কিরূপে পাওয়া সম্ভব? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।।২১।।

পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে প্রকৃতিজাত গুণসমূহের কার্যরূপ পদার্থ সকল ভোগ করেন এবং এই গুণসমূহের সংযোগই এই জীবাত্মার উত্তম ও অধম যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রধান কারণ। এই কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গে সংযোগ সমাপ্ত হলেই জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এখন সেই পুরুষের উপর আলোকপাত করলেন যে, তিনি কিরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত?–

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্পুরুষঃ পরঃ।।২২।।

সেই পুরুষ উপদ্রষ্টা অর্থাৎ হৃদয়-দেশে অতি সমীপে, হাত-পা-মন যত সমীপে তার চেয়েও অধিক সমীপে দ্রষ্টারূপে স্থিত। তার প্রকাশে আপনি ভাল করুন, মন্দ করুন, তাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সাক্ষীরূপে স্থিত। সাধনা-পথে সাধক যখন সঠিকভাবে সাধনা করে নিজের স্তর কিছুটা উন্নত করেন, তাঁর দিকে এগিয়ে যান তখন দ্রষ্টা পুরুষের ক্রম-পরিবর্তন হয়, তিনি '**অনুমন্তা**'—অনুমতি প্রদান করতে শুরু করেন, অনুভব জাগিয়ে তোলেন। সাধনাদ্বারা আরও নিকটে এগিয়ে ঘনিষ্ঠ হলে সেই পুরুষ '**ভর্তা**'রূপে ভরণ-পোষণ করেন, সাধকের যোগক্ষেমেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধনা আরও সূক্ষ্ম হলে তিনিই '**ভোক্তা**' হন। '**ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্**'—যজ্ঞ, তপস্যা যা' কিছু সম্ভব হয়, সমস্তই সেই পুরুষ গ্রহণ করেন, এবং যখন গ্রহণ করে নেন, তখন তার পরের অবস্থাতে '**মহেশ্বরঃ**'— মহান্ ঈশ্বররূপে পরিণত হন। তিনি প্রকৃতির প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এখনও প্রকৃতি জীবিত, তবেই তার প্রভু তিনি। এর থেকেও উন্নত অবস্থাতে সেই পুরুষ '**পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো**'—যখন পরম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হন, তখন তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। এইরূপে এই দেহে স্থিত হয়েও পুরুষ আত্মা 'পরঃ', প্রকৃতির অতীত। পার্থক্য এই যে শুরুতে দ্রষ্টারূপে ছিলেন, ক্রমশঃ উত্থান হতে-হতে পরম-এর স্পর্শ করে সাধকও পরমাত্মারূপে পরিণত হন।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।।২৩।।

এইরূপ যিনি পুরুষকে এবং গুণসমূহের সঙ্গে প্রকৃতিকে সাক্ষাৎকার করার পর জানেন, তিনি সমস্ত কর্ম করেও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না। একেই মুক্তি বলে। এখন পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করে জানার পর যে পরমগতি লাভ হয় অর্থাৎ তাঁর পুনর্জন্ম থেকে নিবৃত্তির উপর আলোকপাত করলেন। এবং এখন তিনি সেই যোগের উপর জোর দিলেন যার প্রক্রিয়া আরাধনা; কারণ এই কর্ম না করে কেউ পান না।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।

অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্মযোগে ন চাপরে।।২৪।।

হে অর্জুন ! সেই '**আত্মানম্**'—পরমাত্মাকে কতকগুলি মানুষ '**আত্মনা**'— নিজের অন্তর্চিন্তনের সাহায্যে ধ্যানের দ্বারা '**আত্মনি**'—হৃদয়-দেশ-এ দর্শন করেন। কেউ কেউ সাংখ্যযোগদ্বারা (অর্থাৎ নিজের শক্তি বুঝে ঐ একই কর্মে প্রবৃত্ত হন।) এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি তাঁকে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা দর্শন করেন। সমর্পণ করে সেই নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত হন। প্রস্তুত শ্লোকে মুখ্য সাধন, ধ্যান। সেই ধ্যানে প্রবৃত্ত হবার ধারা দুটি সাংখ্যযোগ ও নিষ্কাম কর্মযোগ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৫।।

পরন্তু অপর কেউ কেউ, যাঁদের সাধনার জ্ঞান নেই, তাঁরা এইরূপে জানতে না পেরে '**অন্যেভ্যঃ**'—অন্য যাঁরা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, তাঁদের কাছে শুনে উপাসনা করেন এবং তাঁরাও শুনে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগরকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন। অতএব কোনরূপ কর্ম করতে না পারলে সৎসঙ্গ করুন।

যাবৎসঞ্জায়তে কিঞ্চিৎসত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।২৬।।

হে অর্জুন ! যা' কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয় জানবে। প্রাপ্তি কখন হয় ? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৭।।

যো পুরুষ বিনাশশীল চরাচর সর্বভূতে নির্বিশেষভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। অর্থাৎ সেই প্রকৃতির নাশ হবার পরেই তিনি পরমাত্মস্বরূপ, এর পূর্বে নয়। এই সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে বলেছিলেন, '**ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।**'—ভূতগণের সেই সমস্তভাব, যা' (ভাল অথবা মন্দ) কিছু (সংস্কার) সংরচনা করে, সেই সমস্ত লোপ হওয়াই কর্মের পরাকাষ্ঠা। সেই সময় কর্ম সম্পূর্ণ হয়। সেই কথাই এখানেও বলেছেন, যিনি চরাচর ভূতকে ধ্বংস হতে দেখেন এবং পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৮।।

কারণ সেই সমদর্শী পুরুষ সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে (তিনি যেরূপ, সেইরূপ) দর্শন করেন, সেইজন্য নিজে নিজেকে ধ্বংস করেন না। কারণ যা' ছিল, তাই তিনি দেখেছিলেন সেইজন্য তিনি পরমগতি লাভ করেন। প্রাপ্তিযুক্ত পুরুষের লক্ষণ বলছেন–

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।।২৯।।

যে পুরুষ সকল কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে সংঘটিত হতে দেখেন অর্থাৎ যতক্ষণ প্রকৃতি বিদ্যমান, ততক্ষণ কর্ম হতে দেখেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তাঁর দেখাটাই যথার্থ।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩০।।

যে কালে মানুষ পৃথক্ পৃথক্ ভূতসমূহের ভাব-এ এক পরমাত্মাকে প্রবাহিত, স্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা থেকে ভূতসকলের বিস্তার উপলব্ধি করেন, সেই কালে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। এই লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩১।।

কৌন্তেয়! এই অবিনাশী পরমাত্মা অনাদি ও গুণাতীত, সেইজন্য তিনি দেহে অবস্থিত হলেও বাস্তবে কোন কর্ম করেন না এবং লিপ্ত হন না। কিরূপে?–

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩২।।

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সূক্ষ্ম বলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সকল প্রকার দেহে অবস্থিত হয়েও আত্মা গুণাতীত বলে দৈহিক গুণসমূহে লিপ্ত হন না। আরও বললেন–

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৩।।

অর্জুন! যেরূপ একমাত্র সূর্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, সেইরূপ এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। অবশেষে বললেন—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৪।।

এইরূপ যাঁরা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ এবং প্রকৃতি ও তার বিকার থেকে মুক্ত হবার উপায় জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বারা জ্ঞাত হন, সেই মহাত্মাগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং জ্ঞান সাক্ষাৎকারে পর্যায়ভুক্ত।

নিষ্কর্ষ —

গীতাশাস্ত্রে শুরুতে ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেই ক্ষেত্র বস্তুতঃ কোথায়?— সেই স্থান-সম্বন্ধে বলা বাকী ছিল, যা' শাস্ত্রকার স্বয়ং প্রস্তুত অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন যে—কৌন্তেয়! এই দেহটাই একটা ক্ষেত্র। যিনি একে জানেন, তিনি ক্ষেতজ্ঞ। তিনি এই ক্ষেত্রে লিপ্ত নন, নির্লিপ্ত। এর সঞ্চালক। অর্জুন! 'সকল ক্ষেত্রে আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ', অন্যা মহাপুরুষগণের সঙ্গে নিজের তুলনা করলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন; কারণ যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, এই কথা মহাপুরুষগণ বলেছেন। আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্য মহাপুরুষের মতই আমি।

ক্ষেত্র যেরূপ, যে যে বিকারযুক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ যে যে প্রভাবযুক্ত, তার উপর যোগেশ্বর আলোকপাত করলেন। শুধু যে আমি বলছি তা নয়, মহর্ষিগণও তা'ই বলেছেন। বেদের মন্ত্রগুলিতেও একেই বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রেও সেই সমস্তের উল্লেখ রয়েছে।

দেহ (যা' ক্ষেত্র) কি এতটাই, যতটা চোখে পড়ে? এই দেহের উৎপত্তির পিছনে যে যে কারণ বিদ্যমান, তাদের গণনা করে বললেন যে, অষ্টধা মূল প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, ইন্দ্রিয়সমূহের পাঁচটি বিষয়, আশা, তৃষ্ণাও

বাসনা, এইরূপ এই বিকারসমূহের সামূহিক মিশ্রণ এই দেহ। যতক্ষণ এগুলি বিদ্যমান, ততক্ষণ কোন না কোনরূপে দেহ থাকবেই। এটাই ক্ষেত্র, যার মধ্যে ভাল-মন্দ যে বীজই বপন করা হয়, তা' সংস্কাররূপে অঙ্কুরিত হয়। যিনি এর অতীত হয়ে যান, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বলার পর তিনি ঈশ্বরীয় গুণধর্মের উপর আলোকপাত করলেন এবং বললেন যে, এই ক্ষেত্রের প্রকাশক ক্ষেত্রজ্ঞ।

যোগেশ্বর বললেন, সাধনা সম্পূর্ণ হবার পর পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান। সম্যক্ভাবে জানাটাই জ্ঞান। এর অতিরিক্ত যা' কিছু আছে, সে সমস্ত অজ্ঞান। জানার যোগ্য হলেন পরাৎপর ব্রহ্ম। তিনি সৎ নন এবং অসৎও নন। তিনি এই দুইয়ের অতীত। তাঁকে জানার জন্য মানুষ হৃদয়ে ধ্যান করেন, বাইরে মূর্তির সম্মুখে নয়। বহুব্যক্তি সাংখ্যযোগের মাধ্যমে ধ্যান করেন। বহুব্যক্তি নিষ্কাম কর্মযোগ, সমর্পণের সঙ্গে তাঁকে লাভ করার জন্য সেই নির্ধারিত কর্ম আরাধনার আচরণ করেন। যাঁরা এই বিধি জানেন না, তাঁরা তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষগণের কাছে শুনে আচরণ করেন। তাঁরাও পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হন। অতএব যদি কিছু বোধগম্য না হয়, তাহলে তার জ্ঞাতা মহাপুরুষের সৎসঙ্গ আবশ্যক।

স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ বলার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, যেরূপ আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও নির্লিপ্ত, সূর্য যেরূপ সর্বত্র প্রকাশিত করেও নির্লিপ্ত সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, সর্বত্র সম ঈশ্বর যেরূপ তদ্রূপ দেখার ক্ষমতা যাঁর তিনি ক্ষেত্র থেকে অথবা প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত। অবশেষে তিনি নির্ণয় করে বললেন যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জ্ঞানরূপ নেত্র দ্বারাই জানা সম্ভব। জ্ঞান, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে জানাটাই জ্ঞান। শাস্ত্র সকল মুখস্থ করে আবৃত্তি করাকে জ্ঞান বলে না বরং অধ্যয়ন এবং মহাপুরুষগণের কাছে সেই কর্মকে বুঝে, সেই কর্মের আচরণ করে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ এবং নিরুদ্ধের বিলয়কালে পরমতত্ত্বকে দর্শন করে যে অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির নাম জ্ঞান। অতএব ক্রিয়া আবশ্যক। বর্তমান অধ্যায়ে মুখ্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞের বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ক্ষেত্রের স্বরূপ ব্যাপক হয়। দেহ বলা সোজা কিন্তু এই দেহের সম্বন্ধ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? বলা যেতে পারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মূল প্রকৃতির বিস্তার। আপনার দেহের বিস্তার অনন্ত অন্তরিক্ষপর্যন্ত। তার দ্বারা আপনার জীবন ঊর্জস্বিত, তাদের ত্যাগ করে আপনি জীবিত থাকতে পারেন না। এই ভূমণ্ডল, বিশ্বজগৎ, দেশ-প্রদেশ এবং

আপনার এই দৃশ্যমান শরীর সেই প্রকৃতির একটা মাত্র অংশও নয়। এইরূপ বর্তমান অধ্যায়ে ক্ষেত্রেরই বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াংযোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো' নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।১৩।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো' নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।১৩।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।।

পূর্বে কয়েকটা অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন। অধ্যায় ৪/১৯-এ তিনি বলেছিলেন যে, যে পুরুষ নিয়ত কর্মের আচরণ আরম্ভ করেছেন এবং সেই আচরণ ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে কামনা ও সংকল্প সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে গেছে, সেই সময় তিনি যা' জানতে চাইবেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে যাবে, সেই অনুভূতিকেই জ্ঞান বলে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানকে পরিভাষিত করলেন, '**অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।**'-আত্মজ্ঞানে একরস স্থিতি এবং তত্ত্বের অর্থস্বরূপ পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শনকে জ্ঞান বলে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-এর বিভেদ বিদিত হবার পরেই উদয় হয় সেই জ্ঞান। জ্ঞানের তাৎপর্য শাস্ত্রার্থ নয়। সকল শাস্ত্র মুখস্থ করাই জ্ঞান নয়। অভ্যাসের সেই অবস্থাকে জ্ঞান বলে, যেখানে সেই তত্ত্বকে জানা সম্ভব হয়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের সঙ্গে যে অনুভূতি হয়, তাকে জ্ঞান বলা হয়, এর বিপরীত সবই অজ্ঞান।

এইরূপ সবকিছু বলার পরেও বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! সেই জ্ঞানের মধ্যেও যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তা' আমি পুনরায় তোমাকে বলব। যোগেশ্বর তারই পুনরাবৃত্তি করবেন; কারণ '**শাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিয়।**' যে শাস্ত্রসম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তন করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রও বার বার দেখা উচিত। কেবল এতটাই নয়, যেমন যেমন আপনি সাধন-পথে এগিয়ে যাবেন, ইষ্টের যত কাছে যাবেন, তেমন তেমন ব্রহ্মের কাছ থেকে নতুন নতুন অনুভূতি পাবেন। এই সকল অনুভব সদ্‌গুরু মহাপুরুষই প্রদান করেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি পুনরায় বলব।

স্মৃতিপট এমন যার উপর সংস্কারের অঙ্কন সর্বদা হতে থাকে। যখন পথিকের ইষ্টকে জানার জ্ঞান অস্পষ্ট সেই স্মৃতিপট হতে শুরু করে তখন প্রকৃতি অঙ্কিত হতে থাকে, যা' বিনাশের কারণ। সেইজন্য সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সাধককে ইষ্ট-সম্বন্ধী অনুভবের আবৃত্তি করা উচিত। আজ স্মৃতি স্পষ্ট হলেও; যখন পরের অবস্থাগুলিতে সাধক পৌঁছবেন, তখন এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। সেইজন্য 'পূজ্য মহারাজজী

বলতেন যে ব্রহ্মবিদ্যার চিন্তন প্রতিদিন করবে, একমালা প্রতিদিন ঘোরাবে। মালা চিন্তনদ্বারা ঘোরানো হয়, বাহ্য জগতের মালা নয়।

এই নিয়ম সাধকের জন্য; কিন্তু যিনি বাস্তবিক সদ্‌গুরু, তিনি সতত সেই পথিকের মার্গদর্শন করেন। অন্তরে জাগ্রত হয়ে এবং বাইরে নিজের ক্রিয়া-কলাপ-এর দ্বারা তাঁকে প্রত্যেক অভিনব পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মহাপুরুষ ছিলেন। অর্জুন শিষ্যের স্থানে ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভগবন্! আমাকে রক্ষা করুন, সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, জ্ঞানসকলের মধ্যে অতি উত্তম জ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলব।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১।।

অর্জুন! সকল জ্ঞানের মধ্যে অতি উত্তম জ্ঞান, পরম জ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলব (যা' পূর্বে বলেছেন), যার সম্বন্ধে জানার পর মুনিগণ এই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে পরমসিদ্ধিলাভ করেন (যার পর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না।)।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২।।

এই জ্ঞান '**উপাশ্রিত্য**'—এই জ্ঞান আশ্রয় করে, ক্রিয়ার আচরণ করে, সান্নিধ্যে এসে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত পুরুষগণ সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালে অর্থাৎ শরীরান্তের সময় ব্যাকুল হন না; কারণ মহাপুরুষের শরীরান্ত তখনই হয়ে যায়, যখন তিনি স্বরূপলাভ করেন। তার পরে তাঁর শরীর নিবাসস্থানরূপে থাকে। পুনর্জন্মের স্থান কোথায়, যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্‌গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।৩।।

হে অর্জুন! আমার 'মহদ্‌ব্রহ্ম' অর্থাৎ অষ্টধা মূল প্রকৃতি সর্বভূতের উৎপত্তির কারণরূপ যোনি এবং তাতে আমি চেতনরূপ বীজ স্থাপন করি। সেই জড়-চেতন-এর সংযোগে সর্বভূতের সৃষ্টি হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪।।

কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল দেহ উৎপন্ন, তাদের সকলের '**যোনিঃ**'- গর্ভধারিণী মাতা অষ্টধা মূল প্রকৃতি এবং আমিই বীজস্থাপনকর্তা পিতা। অন্য কেউ মাতাও নয়, পিতাও নয়। যতক্ষণ জড়-চেতন-এর সংযোগ হবে, জন্ম হতেই থাকবে, নিমিত্ত কেউ না কেউ হবেই। চেতন আত্মা জড় প্রকৃতিতে কেন আবদ্ধ হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন-

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫।।

মহাবাহু অর্জুন! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে। কিরূপে?—

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎপ্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬।।

নিষ্পাপ অর্জুন! এই গুণত্রয়ের মধ্যে উদ্ভাসিত নির্বিকার সত্ত্বগুণ '**নির্মলত্বাৎ**'- নির্মল সেইজন্য সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা আত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণও বন্ধনই। পার্থক্য এতটাই সুখ কেবল পরমাত্মাকে এবং জ্ঞান সাক্ষাৎকারকে বলা হয়। সত্ত্বগুণী ততক্ষণ আবদ্ধ, যতক্ষণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার না হয়।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭।।

হে অর্জুন! রজোগুণ রাগাত্মক। একে তুমি '**কর্মসঙ্গেন**'- কামনা ও আসক্তি থেকে উৎপন্ন জানবে। রজোগুণ জীবাত্মাকে কর্ম ও তার ফলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। এই গুণ কর্মে প্রবৃত্তি প্রদান করে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮।।

অর্জুন! তমোগুণ সকল দেহধারীগণকে মোহযুগ্ধ করে, একে তুমি অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন জানবে। এই গুণ আত্মাকে প্রমাদ অর্থাৎ ব্যর্থ চেষ্টা, আলস্য (যে,

কালকে করা হবে) এবং নিদ্রাদ্বারা বদ্ধ করে। নিদ্রার অর্থ এই নয় যে, তমোগুণী বেশী ঘুমায়। দেহ শয়ন করে, এইরূপ নয়। **‘যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।’** এই জগৎ রাত্রিরূপ। তমোগুণী ব্যক্তি এই জগৎরূপ রাত্রিতে দিবা-রাত্রি ব্যস্ত থাকে, প্রকাশ স্বরূপের দিক্ থেকে অচেতন থাকে। তমোগুণী নিদ্রা একেই বলে। যিনি এর মধ্যে আবদ্ধ, তিনিই নিদ্রিত। এখন গুণত্রয়ের বন্ধনের সামূহিক স্বরূপ বলছেন-

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯।।

অর্জুন! সত্ত্বগুণ সুখে, শাশ্বত পরমসুখের ধারাতে প্রবৃত্ত করে, রজোগুণ কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্যর্থ চেষ্টাতে প্রবৃত্ত করে। গুণ যখন একস্থানে, একটা হৃদয়েই থাকে তখন কিরূপে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হয়? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০।।

হে অর্জুন! সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়, সেইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। এইরূপ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। কিরূপে জানা যাবে যে, কখন, কোন্ গুণটি অধিক সক্রিয়?—

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্‌প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১।।

যে কালে এই দেহে, অন্তঃকরণে এবং সকলেন্দ্রিয়ে ঈশ্বরীয় প্রকাশ ও বোধশক্তি উৎপন্ন হয়, সেই সময় এইরূপ জানতে হবে যে, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে। এবং-

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১২।।

হে অর্জুন! রজোগুণ বর্ধিত হলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্ত হবার প্রচেষ্টা, কর্ম আরম্ভ, অশান্তি অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা, বিষয়ভোগের স্পৃহা এই সকল উৎপন্ন হয়। তমোগুণের বৃদ্ধিতে কি হয়?—

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩।।

অর্জুন! তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে '**অপ্রকাশঃ**'- (প্রকাশ পরমাত্মার দ্যোতক) ঈশ্বরীয় প্রকাশের দিকে না এগোনোর স্বভাব, '**কার্যম্ কর্ম**'-যা' করনীয় প্রক্রিয়া তাতে প্রবৃত্তির অভাব, অন্তঃকরণে ব্যর্থ চেষ্টা সকলের প্রবাহ এবং সংসারে বিমুগ্ধ করে যে প্রবৃত্তিগুলি-এই সমস্ত উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত গুণের সম্বন্ধে জানা থাকলে কি লাভ?—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্প্রতিপদ্যতে।।১৪।।

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে এই জীবাত্মা দেহত্যাগ করলে উত্তম কর্মকারীদের পাপমুক্ত দিব্য লোকাদিকে লাভ করে। এবং-

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫।।

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে যাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর কর্মে আসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মূঢ়যোনিতে জন্ম হয়, যার মধ্যে কীট-পতঙ্গাদিপর্যন্ত যোনির বিস্তার আছে। অতএব গুণত্রয়ের মধ্যে মানুষকে সাত্ত্বিক গুণধর্মেযুক্ত হওয়া উচিত। প্রকৃতির এই সুরক্ষিত ভাণ্ডার আপনার দ্বারা অর্জিত গুণসকলকে মৃত্যুর পরে আপনাকে সুরক্ষিত ফিরিয়ে দেয়। এখন এর পরিণাম দেখুন-

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।

রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬।।

সাত্ত্বিক কর্মের ফল সাত্ত্বিক, নির্মল, সুখ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাদি বলা হয়েছে। রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান। এবং—

সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ।।১৭।।

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান জন্মে (ঈশ্বরীয় অনুভূতিকে জ্ঞান বলা হয়), ঈশ্বরীয় অনুভূতির সঞ্চার হয়। রজোগুণ থেকে নিঃসন্দেহে লোভ উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ, আলস্য (অজ্ঞান) উৎপন্ন হয়। এই সকল উৎপন্ন হয়ে কোন্ গতি প্রদান করে?—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮।।

সত্ত্বগুণে স্থিত পুরুষগণ '**ঊর্ধ্বমূলম্**'—সেই মূল পরমাত্মার দিকে এগিয়ে যান, নির্মল লোকাদিতে গমন করেন। রজোগুণে স্থিত রাজসিক ব্যক্তিগণ মধ্যম শ্রেণীর মানুষ হয়, যাদের '**সাত্ত্বিকম্**'—বিবেক, বৈরাগ্য থাকে না এবং অধম কীট-পতঙ্গ যোনিগুলিতেও জন্ম হয় না বরং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিত তমোগুণে প্রবৃত্ত তামসিক ব্যক্তিগণ 'অধোগতিঃ' অর্থাৎ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে ত্রিগুণই কোন না কোনরূপে যোনির কারণ। যাঁরা এই গুণত্রয় অতিক্রম করেন, তাঁরা জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং আমার স্বরূপ লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি।।১৯।।

যে কালে দ্রষ্টা আত্মা ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে দেখেন না এবং ত্রিগুণের অতীত পরমতত্ত্ব '**বেত্তি**'- বিদিত হন, সেই সময় সেই পুরুষ আমার স্বরূপলাভ করেন। এটা বৌদ্ধিক মান্যতা নয় যে গুণ গুণেতেই আবর্তিত হয়। সাধনা করতে করতে সাধক এমন এক অবস্থাতে এসে পৌঁছান, যখন সেই পরম-এর অনুভূতি লাভ হয়, তখন ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে দেখতে পান না। সেই সময় পুরুষ ত্রিগুণাতীত হন। এটা কল্পিত মান্যতা নয়। এই প্রসঙ্গেই আরও বলছেন—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে।।২০।।

পুরুষ স্থূল দেহোৎপত্তির কারণরূপ এই গুণত্রয় অতিক্রম করে, জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধাবস্থা এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃত তত্ত্ব লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্‌গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌গুণানতিবর্ততে।।২১।।

প্রভু! এই ত্রিগুণকে যিনি অতিক্রম করেন, তাঁর লক্ষণ কি? তাঁর আচরণ কিরূপ এবং কি উপায়ে পুরুষ গুণাতীত হন?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২।।

অর্জুনের উপর্যুক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! যিনি পুরুষ সত্ত্বগুণের কার্যরূপ ঈশ্বরীয় প্রকাশ, রজোগুণের কার্যরূপ প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্যরূপ মোহে প্রবৃত্তি হলে দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হলে সেই সকলের আকাঙ্ক্ষাও করেন না এবং–

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩।।

এইরূপ উদাসীনের সদৃশ স্থিত যিনি, তিনি গুণসমূহদ্বারা বিচলিত হন না, গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত-এইরূপ জেনে সেই অবস্থা থেকে সরে যান না, তখন তিনিই গুণাতীত।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪।।

যিনি নিরন্তর স্বয়ং-এ অর্থাৎ আত্মভাবে স্থিত, সুখ ও দুঃখে সম, মৃৎ, পিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁর সমভাব, ধৈর্যবান্, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্যজ্ঞান, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁর সমবুদ্ধি এবং–

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫।।

যিনি মান ও অপমানে সম, মিত্র ও শত্রুপক্ষেও সম, যিনি সকল আরম্ভের ত্যাগী, সেই পুরুষকে গুণাতীত বলা হয়।

শ্লোক সংখ্যা ২২ থেকে ২৫ পর্যন্ত গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ও আচরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি বিচলিত হন না, গুণসমূহ বিচলিত করতে পারে না, স্থিরভাবে অবস্থান করেন। এখন প্রস্তুত গুণাতীত হবার বিধি—

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্‌সমতীত্যৈতান্‌ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬।।

যে পুরুষ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য সাংসারিক স্মরণগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, যোগদ্বারা অর্থাৎ সেই নির্ধারিত কর্মদ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনি উত্তমরূপে ত্রিগুণকে অতিক্রম করে পরব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হবার যোগ্য হন, যাকে কল্প বলা হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়াই বাস্তবিক কল্প। অনন্যভাবে নিয়ত কর্মের আচরণ না করে কেউ গুণাতীত হয় না। অবশেষে যোগেশ্বর নির্ণয় করলেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭।।

হে অর্জুন! সেই অবিনাশী ব্রহ্মের (যার সঙ্গে তিনি কল্প করেন, যাঁর মধ্যে তিনি গুণাতীত একীভাবে স্থিত হন।), অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং সেই অখণ্ড একরস আনন্দের আমিই আশ্রয় অর্থাৎ পরমাত্মস্থিত সদ্‌গুরুই এদের সকলের আশ্রয়। কৃষ্ণ যোগেশ্বর ছিলেন। এখন যদি আপনি অব্যক্ত, অবিনাশী, ব্রহ্ম, শাশ্বত ধর্ম, অখণ্ড, একরস আনন্দ পেতে চান, তাহলে কোন তত্ত্বস্থিত, অব্যক্তস্থিত মহাপুরুষের আশ্রয়ে যান। তাঁর দ্বারাই উপরোক্ত স্থিতিলাভ করা সম্ভব।

নিষ্কর্ষ —

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুন! জ্ঞান সমূহের মধ্যে অতি উত্তম পরমজ্ঞান সম্বন্ধে আমি পুনরায় তোমাকে বলব, যা' জেনে মুনিগণ উপাসনাদ্বারা আমার স্বরূপলাভ করেন, তারপর সৃষ্টির আদিতে তাঁরা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না; কিন্তু দেহত্যাগ নিশ্চয় হয়। সেই সময় তাঁরা ব্যথিত হন না। তাঁরা সেই দিনই দেহত্যাগ করেন, যেদিন স্বরূপলাভ করেন। প্রাপ্তি জীবিত অবস্থাতেই হয়; কিন্তু দেহান্তের সময়ও তাঁরা ব্যথিত হন না।

প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণই এই জীবাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। দুটি গুণকে অভিভূত করে তৃতীয় গুণের বৃদ্ধি সম্ভব। গুণ পরিবর্তনশীল। প্রকৃতি অনাদি, এর বিনাশ হয় না; বরং ত্রিগুণের প্রভাব এড়ানো যেতে পারে। গুণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে ঈশ্বরীয় প্রকাশ ও বোধশক্তি জাগে। রজোগুণ রাগাত্মক। সেই সময় কর্মের প্রতি লোভ, আসক্তি এই সমস্ত উৎপন্ন হয় এবং অন্তঃকরণে তমোগুণ কার্যরূপ নিলে আলস্য-প্রমাদ ঘিরে ফেলে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পুরুষ শ্রেষ্ঠ নির্মললোকাদিতে জন্মগ্রহণ করে। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মানুষ মানব-যোনিতে উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করে (পশু, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি) অধম যোনিতে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য মানুষকে ক্রমশঃ উন্নত সাত্ত্বিক গুণের দিকে এগোনো উচিত। বস্তুতঃ এই ত্রিগুণই কোন না কোন যোনির কারণ। এই গুণই আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে সেইজন্য গুণাতীত হওয়া উচিত।

পুরুষ যে গুণত্রয় থেকে মুক্ত হন, তার স্বরূপ বলবার পর যোগেশ্বর বললেন যে, অষ্টধা মূল প্রকৃতি গর্ভধারিণী মাতা এবং আমিই বীজরূপ পিতা। অন্য কেউ মাতা অথবা পিতা নয়। যতক্ষণ এই ক্রম চলবে, ততক্ষণ চরাচর জগতে নিমিত্তরূপে কেউ না কেউ মাতা-পিতা হতেই থাকবে; কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতিই মাতা ও আমিই পিতা।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন তিনটি প্রশ্ন করেছেন যে, গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি? আচরণ কিরূপ? কোন্ উপায়ে মানুষ এই ত্রিগুণের অতীত হন? এইরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ এবং আচরণ বললেন এবং শেষে গুণাতীত হবার উপায় বললেন যে, যে পুরুষ অব্যভিচারিণী ভক্তি ও যোগদ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হন। অন্য কারও চিন্তন না করে নিরন্তর ইষ্টের চিন্তন করা অব্যভিচারিণী ভক্তি। যিনি সংসারের সংযোগ-বিয়োগ থেকে সর্বথা মুক্ত তারই নাম যোগ, তাকে কার্যরূপে অনুষ্ঠিত করার নাম কর্ম। যজ্ঞ যারদ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই ক্রিয়া কর্ম। অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা সেই নিয়ত কর্মের আচরণদ্বারাই পুরুষ ত্রিগুণাতীত হন এবং অতীত হয়ে পুরুষ ব্রহ্মে একীভূত এবং পূর্ণকল্প প্রাপ্ত করার যোগ্য হন। গুণ যে মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করে, তা বিলয় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রহ্মে একীভূত হওয়া সম্ভব, একেই বাস্তবিক কল্প বলে। অতএব ভজন না করে কেউ গুণাতীত হতে পারেন না।

অবশেষে যোগেশ্বর নির্ণয় করলেন যে, সেই গুণাতীত পুরুষ যে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবে স্থিত হন, সেই ব্রহ্মের, অমৃততত্ত্বের, শাশ্বত ধর্মের এবং অখণ্ড একরস আনন্দের আমি আশ্রয় অর্থাৎ প্রধান কর্তা। এখন শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে নেই, এখন সেই আশ্রয় চলে গেছে। বড় সংশয়ের বিষয়, সেই আশ্রয় এখন কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তিনি যোগী ছিলেন, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ ছিলেন। '**শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।**' অর্জুন বলেছিলেন—আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবারই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ বলেছেন এবং তাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন। অতএব স্পষ্ট হল যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা, যোগী ছিলেন। এখন আপনি যদি অখণ্ড একরস আনন্দ, শাশ্বত ধর্ম অথবা অমৃততত্ত্ব লাভের ইচ্ছুক, তাহলে এই সকল প্রাপ্তির স্রোত একমাত্র সদ্‌গুরু। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ণদ্বারা এসকল লাভ করা অসম্ভব। যখন সেই মহাপুরুষ আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে রথী হয়ে যান, তখন ধীরে ধীরে অনুরাগীকে সঞ্চালিত করতে করতে তার স্বরূপপর্যন্ত, যাতে তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, পৌঁছিয়ে দেন। মহাপুরুষই একমাত্র মাধ্যম। এইরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সকলের আশ্রয় বলে এই চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত করলেন। যাতে গুণসমূহের বর্ণনা বিস্তারপূর্বক করা হয়েছে, অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'গুণত্রয়বিভাগযোগো' নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।।১৪।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'গুণত্রয় বিভাগ যোগ' নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'গুণত্রয়বিভাগযোগো' নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।।১৪।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'গুণত্রয় বিভাগ যোগ' নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।।

মহাপুরুষগণ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা সংসারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কেউ ভবাটবী বলেছেন, কেউ সংসার-সাগর বলেছেন। অবস্থা-ভেদে একেই ভবনদী ও ভবকূপও বলা হয়েছে এবং কখনও এর তুলনা গো-পদ-এর সঙ্গে করা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের আয়তন যৎ, সংসারও তৎটুকুই এবং শেষে এমন অবস্থা আসে যে (**'নাম লেত ভব সিন্ধু সুখাহীঁ।'**) নাম নিলেই ভবসিন্ধু শুকিয়ে যায়। এরূপ সমুদ্র সংসারে আছে কি? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও সংসারকে সমুদ্র ও বৃক্ষের নাম দিয়েছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন—যাঁরা আমার অনন্যভক্ত, তাঁদের শীঘ্রই সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি। এখানে প্রস্তুত অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই সংসার বৃক্ষস্বরূপ, এর ছেদন করতে করতে যোগীগণ সেই পরমপদের খোঁজ করেন। দেখুন—

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১।।

অর্জুন! **'ঊর্ধ্বমূলম্'**—ঊর্ধ্বে পরমাত্মাই-এর মূল, **'অধঃশাখম্'**—নিম্নদিকে প্রকৃতিই এর শাখাসমূহ, এইরূপ সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয়। (বৃক্ষ অ-শ্বঃ অর্থাৎ কালপর্যন্তও যে থাকবেই, এটা বলা যায় না, যে কোন সময় ছেদন হতে পারে; কিন্তু অবিনাশী বলা হয়) শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে অবিনাশী দুটি—এক সংসাররূপ বৃক্ষ অবিনাশী এবং দ্বিতীয় তার থেকেও শ্রেষ্ঠ পরম অবিনাশী। এই অবিনাশী সংসাররূপ বৃক্ষের পাতা বেদকে বলা হয়েছে। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞাতা, গ্রন্থ পাঠকরা জানেন না। গ্রন্থ পাঠ করলে সেই পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণালাভ হয় মাত্র। পত্রসমূহের

স্থানে বেদের কি প্রয়োজন? বস্তুতঃ পুরুষ পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন অন্তিম জন্ম গ্রহণ করে, সেখান থেকেই বেদের সেই সকল ছন্দ (যা' কল্যাণের সৃজন করে) প্রেরণা প্রদান করে, তার পর থেকেই বেদের উপযোগ আরম্ভ হয় এবং সংসার শেষ হয়ে যায়। তিনি স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান। এবং—

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২।।

এই সংসাররূপ বৃক্ষ-এর শাখাসমূহ গুণত্রয়দ্বারা বর্ধিত ও বিষয়-ভোগরূপ পল্লববিশিষ্ট এবং অধোদেশ ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। নিম্নে কীট-পতঙ্গপর্যন্ত এবং ঊর্ধ্বে দেবভাব থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মাপর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত এবং কেবল মনুষ্য-যোনিতে কর্মানুসারে আবদ্ধ করে, অন্য সমস্ত যোনি ভোগ উপভোগ করে। মনুষ্য-যোনিই কর্মানুসারে বন্ধন তৈরী করে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢমূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্বা।।৩।।

কিন্তু এই সংসার-বৃক্ষ-এর রূপ যেমন বলা হয়েছে, তেমন দেখা যায় না; কারন এর আদি নেই ও অন্তও নেই এবং এর স্থিতিও উত্তম নয় (কারণ এই বৃক্ষ পরিবর্তশীল)। এই দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে দৃঢ় **'অসঙ্গশস্ত্রেণ'**- অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করতে হবে। (সংসাররূপ বৃক্ষকে ছেদন করতে হবে। এমন নয় যে অশ্বত্থের মূলে পরামাত্মা বাস করেন অথবা অশ্বত্থপাতা বেদ আর শুরু করে দিলেন বৃক্ষের পূজা।)

এই সংসার-বৃক্ষ-এর মূল স্বয়ং পরমাত্মাই বীজরূপে প্রসারিত, তাহলে কি তাও ছেদন হবে? দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা এই প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়, একেই ছেদন বলা হয়। ছেদন করে কি করা হবে?—

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্‌গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪।।

দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করে সেই পরমপদ পরমেশ্বরের উত্তমরূপে অন্বেষণ করতে হয়, যাঁকে প্রাপ্ত হলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ পূর্ণ নিবৃত্তিলাভ হয়। কিন্তু তাঁর অন্বেষণ কিরূপে সম্ভব? যোগেশ্বর বলছেন, এরজন্য সমর্পণ আবশ্যক। যে পরমেশ্বর হতে পুরাতন সংসার-বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তৃত, সেই আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণাগত আমি (তাঁর শরণাগত না হলে বৃক্ষ লুপ্ত হবে না।)। এখন শরণাগত, বৈরাগ্যে স্থিত পুরুষ কিরূপে বুঝবেন যে বৃক্ষ-ছেদন হয়েছে? তার পরিচয় কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসঞ্জ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢাঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫।।

উপর্যুক্ত প্রকার সমর্পণদ্বারা যাঁদের মোহ ও মান নষ্ট হয়েছে, যাঁরা আসক্তিরূপ সঙ্গদোষজয়ী, '**অধ্যাত্মনিত্যা**'—পরমাত্মার স্বরূপে যাঁদের নিরন্তর স্থিতি, যাঁদের কামনা নিবৃত্ত হয়েছে এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত জ্ঞানীগণ সেই অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ এই অবস্থালাভ না হয়, ততক্ষণ সংসার-বৃক্ষ ছেদন হয় না। বৈরাগ্যের প্রয়োজন এতদূরপর্যন্তই। সেই পরমপদের স্বরূপ কি? যা লাভ করা হয়?—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬।।

সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না। যাঁকে লাভ করলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, সেটাই আমার পরমধাম অর্থাৎ তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না। এই পদলাভ করার অধিকার সকলের সমান। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭।।

'জীবলোকে' অর্থাৎ এই দেহে (দেহকেই লোক বলে) এই জীবাত্মা আমারই সনাতন অংশ এবং সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে স্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। কিরূপে?—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮।।

বায়ু যেমন গন্ধস্থান থেকে গন্ধ আহরণ করে, তেমনি দেহের স্বামী জীবাত্মা যে পূর্বদেহ ত্যাগ করে, সেই দেহ থেকে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের কার্য-কলাপ গ্রহণ করে (আকর্ষণ করে, সঙ্গে নিয়ে) আবার যে নতুন দেহ লাভ করে, তাতে প্রবেশ করে। (যখন নতুন দেহ পরের মুহূর্তেই লাভ হয় তখন আটার পিণ্ড তৈরী করে কাকে অর্পণ করেন? গ্রহণ কে করে? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে, এই অজ্ঞান তোমার কোত্থেকে উৎপন্ন হল যে এই পিণ্ডোদক ক্রিয়া লুপ্ত হবে।) সেখানে করে কি? মনসহিত ছয়টি ইন্দ্রিয় কে কে?

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯।।

সেই দেহস্থিত জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্‌, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে অর্থাৎ এদের সাহায্যেই বিষয়সমূহ উপভোগ করেন। এইরূপ দেখা যায় না, সকলে তাঁর দর্শন করতে সমর্থ হয় না, এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌।

বিমূঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০।।

যিনি দেহান্তরে গমন করেন, যিনি দেহে অবস্থানপূর্বক বিষয়ভোগ করেন অথবা যিনি ত্রিগুণের সঙ্গে সংযুক্ত হন, সেই জীবাত্মাকে মূঢ়, অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ জানতে পারে না। কেবল জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা জ্ঞানিগণই তাঁকে জানতে পারেন, দর্শন করেন। এখন সেই দৃষ্টি কিরূপে লাভ হবে? এখন দেখুন—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১।।

যোগীগণ স্বীয় হৃদয়ে চিত্তকে সর্বদিক্ থেকে রুদ্ধ করে এই আত্মাকে যত্নপূর্বক প্রত্যক্ষ দর্শন করেন; কিন্তু অকৃতার্থ আত্মা যাদের অর্থাৎ মলিন অন্তঃকরণ যাদের, সেই অজ্ঞানীগণ যত্নশীল হলেও এই আত্মাকে জানতে পারে না (কারণ তাদের অন্তঃকরণ বাহ্য প্রবৃত্তিসমূহে বিক্ষিপ্ত এখন)। চিত্তকে সর্বদিক্ থেকে রুদ্ধ করে অন্তরাত্মাতে যত্নশীল ভাবুকগণই তাঁকে লাভ করার যোগ্য। অতএব অন্তঃকরণ থেকে নিরন্তর সুমিরণ আবশ্যক। এখন সেই মহাপুরুষগণের স্বরূপে যে সমস্ত বিভূতিলাভ হয় (যা' পূর্বেও বলেছেন), সেই সকলের উপর আলোকপাত করলেন–

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২।।

যে জ্যোতিঃ সূর্যে স্থিত হয়ে সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, সেই জ্যোতিঃ তুমি আমার জানবে। এখন সেই প্রসঙ্গে বলছেন–

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩।।

আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে স্বীয় শক্তিদ্বারা ভূতসকলকে ধারণ করি এবং চন্দ্রে রসস্বরূপ হয়ে সকল বনস্পতিদের পুষ্ট করি।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।১৪।।

আমিই প্রাণিগণের দেহে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে স্থিত হয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত চতুর্বিধ অন্নকে পরিপাক করি।

চতুর্থ অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইন্দ্রিয়াগ্নি, সংযমাগ্নি, যোগাগ্নি, প্রাণ-অপানাগ্নি, ব্রহ্মাগ্নি প্রভৃতি তেরো-চৌদ্দটি অগ্নির উল্লেখ করেছেন, এদের সকলের পরিণাম জ্ঞানরূপেই পরিভাষিত হয়েছে। জ্ঞানকেই অগ্নি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এইরূপ অগ্নিস্বরূপ হয়ে প্রাণ ও অপানের সঙ্গে সংযুক্ত চার প্রকার বিধিদ্বারা

(জপ সর্বদা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে হয়, জপের চার বিধি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা এই চার বিধি দ্বারা) প্রস্তুত অন্নকে আমিই পরিপাক করি।

শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র অন্ন, যারদ্বারা আত্মা পূর্ণ তৃপ্ত হয় আর কখনও অতৃপ্ত হয় না। দেহের পোষক প্রচলিত অন্নকে যোগশ্বর আহারের নাম দিয়েছেন (যুক্তাহার ......।) বাস্তবিক অন্ন পরমাত্মা। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা এই চারটি বিধি পেরিয়ে সেই অন্ন পরিপক্ক হয়। একেই অনেক মহাপুরুষ নাম, রূপ, লীলা ও ধাম বলেছেন। সর্বপ্রথম নাম-জপ করা হয়, ক্রমশঃ হৃদয়ে ইষ্টের স্বরূপ প্রকট হতে থাকে, তার পরে তাঁর লীলার বোধ জাগে যে, সেই ঈশ্বর কিভাবে কণায়-কণায় ব্যাপ্ত? কিভাবে তিনি সর্বত্র কার্য করেন? এইরূপ হৃদয়ে-দেশে ক্রিয়াকলাপের দর্শনই তাঁর লীলা (বাহ্য রামলীলা-রাসলীলা নয়) এবং সেই ঈশ্বরীয় লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি করতে করতে যখন মূললীলাধারীর স্পর্শলাভ হয়, তখন ধামের অবস্থালাভ হয়। তাঁকে জানার পর সাধক তাঁতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও পরাবাণীর পরিপক্কাবস্থাতে পরব্রহ্মের স্পর্শ করে তাঁতে স্থিত হওয়া, দু-ই একসঙ্গে হয়।

এইরূপ প্রাণ ও অপান অর্থাৎ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চার বিধি দ্বারা অর্থাৎ বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও ক্রমশঃ পরা সম্পূর্ণ হয় যখন, তখন সেই 'অন্ন' (ব্রহ্ম) পরিপক্ক হয়ে যায়, লাভও হয়, পরিপাক ও হয় এবং পাত্র পরিপক্কই হয়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।১৫।।

আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে স্থিত আছি। আমার দ্বারাই স্বরূপের স্মৃতি (সুরতি, যে তত্ত্ব পরমাত্মা বিস্মৃত, তাঁর স্মরণ হয়ে আসা) উৎপন্ন হয়, (এই লক্ষণ প্রাপ্তিকালের) স্মৃতির সঙ্গে জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) ও 'অপোহনম্' অর্থাৎ সকলবাধা শান্ত আমার দ্বারাই হয়। সকল বেদ মধ্যে যা' জানার যোগ্য তা আমি। বেদান্তের কর্তা অর্থাৎ 'বেদস্য অন্তঃ সঃ বেদান্ত' (পৃথক্ ছিলেন তবেই তো অনুভব হল, যখন

জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন আর কে কাকে জানতে চাইবেন?) বেদান্তের কর্তা আমি এবং 'বেদবিৎ'ও অর্থাৎ বেদের জ্ঞাতাও আমিই। অধ্যায়ের আরম্ভে তিনি বলেছিলেন যে, এই সংসার বৃক্ষের ন্যায়। ঊর্ধ্বে পরমাত্মা মূল এবং নিম্নে প্রকৃতিপর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখাসমূহ। যিনি এই মূল থেকে প্রকৃতির বিভাজন করে একে জানেন, মূলসহ জানেন, তিনিই বেদবিৎ। এখানে যোগেশ্বর বলছেন যে, আমি বেদবিৎ। শ্রীকৃষ্ণ নিজের তুলনা বেদজ্ঞ মহাপুরুষগণের সঙ্গে করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ, যোগীগণের মধ্যে পরমযোগী ছিলেন। এই প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ হল। এখন বলছেন যে, এই সংসারে পুরুষের স্বরূপ দুই প্রকারের—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬।।

অর্জুন! এই সংসারে পুরুষ দুই প্রকারের 'ক্ষর'-ক্ষয়শীল, পরিবর্তনশীল এবং দ্বিতীয় '**অক্ষর**'- অক্ষয়, অপরিবর্তনশীল। তন্মধ্যে প্রথম সকল ভূতপ্রাণীগণের শরীর বিনাশশীল, আজ আছে কাল থাকবে না এবং দ্বিতীয় কূটস্থ পুরুষকেই অবিনাশী বলা হয়। সাধনের দ্বারা যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ অর্থাৎ যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ কূটস্থ, তাঁকে অক্ষর বলা হয়। এখন আপনি স্ত্রী অথবা পুরুষ যা হোন না কেন, যদি দেহ ও দেহের উৎপত্তির কারণ সংস্কারের ক্রম বিদ্যমান, তাহলে আপনি ক্ষর পুরুষ এবং যদি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কূটস্থ হয়ে যায়, তাহলে তিনিই অক্ষর পুরুষ। কিন্তু এটাও পুরুষের অবস্থা-বিশেষই। এই দুইয়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ এক 'অন্য' পুরুষও রয়েছেন—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭।।

এই উভয় থেকে অতি উত্তম পুরুষ তো অন্যই, যিনি ত্রিলোকে অবস্থিত হয়ে সকলের ধারণ-পোষণ করেন এবং তাঁকে অবিনাশী, পরমাত্মা, ঈশ্বর বলা হয়েছে। পরমাত্মা, অব্যক্ত, অবিনাশী, পুরুষোত্তম এই সমস্ত শব্দগুলি তাঁর পরিচায়ক, বস্তুতঃ তিনি 'অন্য' অর্থাৎ অনির্বচনীয়। ক্ষর-অক্ষর থেকে অতীত মহাপুরুষের চূড়ান্ত অবস্থা এটা, যাঁকে পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু তিনি 'অন্য' অর্থাৎ অনির্বচনীয়। সেই স্থিতিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেরও পরিচয় দিলেন। যথা—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।

আমি উপর্যুক্ত বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র থেকে সর্বথা অতীত এবং অক্ষর-অবিনাশী কূটস্থ পুরুষ থেকেও উত্তম, সেইজন্য লোক ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

যো মামেবমসম্মূঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।।১৯।।

হে ভারত ! উপর্যুক্ত এইপ্রকার যে জ্ঞানী পুরুষ আমাকে, পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ পুরুষ, তিনি সর্বপ্রকারে পরমাত্মারূপ আমাকেই ভজনা করেন। তিনি আমার থেকে পৃথক্ নন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্‌স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০।।

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এইরূপ অতিগোপনীয় শাস্ত্র আমার দ্বারা বলা হল। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে মানুষ পূর্ণজ্ঞাতা ও কৃতার্থ হন। অতএব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী স্বয়ং-ই পূর্ণ শাস্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য অত্যন্ত গুপ্ত ছিল। তিনি কেবল অনুরাগীদেরই বলেছেন। এই বিষয় কেবল অধিকারীর জন্য, সকলের জন্য নয়। কিন্তু যখন এই রহস্য (শাস্ত্র) সম্বন্ধেই লেখা হয়, শাস্ত্র সকলের জন্য সুলভ হয়, তখন মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই বলেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ এই রহস্য (শাস্ত্র) শুধু অধিকারীর জন্যই। শ্রীকৃষ্ণের সেই অলৌকিক স্বরূপ সকলের দর্শন করার জন্য ছিলও না। কেউ তাঁকে রাজা বলে জানতেন, কেউ দূত এবং কেউ তাঁকে যদুবংশীয় বলেই মনে করতেন; কিন্তু অধিকারী অর্জুনের কাছে কিছু গোপন করেননি। অর্জুন অনুভব করলেন যে তিনি পরমসত্য পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ গোপন করলে অর্জুনের কল্যাণ সম্ভব ছিল না।

এই বিশেষত্ব ভগবৎপ্রাপ্ত প্রত্যেক মহাপুরুষের মধ্যে পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তখন ভক্তগণ জিজ্ঞাসা

করেছিলেন—"আজ আপনি যে খুব আনন্দিত।" তিনি বলেছিলেন—"আজ আমি 'সেই' পরমহংস হয়ে গেছি।" তাঁর সমকালীন কোন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ পরমহংস ছিলেন, তিনি তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অনুগামী সাধকদের, যাঁরা কায়মনোবাক্যে বৈরাগ্য লাভের আশায় তাঁর অনুগামী, তাঁদের বলেছিলেন—"দেখ, তোমরা আর সন্দেহ করো না। আমিই সেই রাম যিনি ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমিই সেই কৃষ্ণ যিনি দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরই পবিত্র আত্মা, সেই স্বরূপ। যদি ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা কর তাহলে আমার স্বরূপ দেখ।

এইরূপ 'পূজ্য মহারাজজী'ও সকলকে বলতেন—"হো, আমি ভগবানের দূত। যিনি প্রকৃত সন্ত, তিনি ভগবানের দূত হন। আমাদের দ্বারাই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়।" যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন—"আমি ভগবানের পুত্র, আমার কাছে এসো- তাহলে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবে।" অতএব সকলেই পুত্র হতে পারেন। সান্নিধ্যে আসার তাৎপর্য তাঁরা সাধনা করে যে ব্রহ্মে স্থিত হয়েছেন, সাধনা-ক্রমে চলে তা' সম্পূর্ণ করতে হবে। মহম্মদ সাহেবও বলেছিলেন--"আমি আল্লার রসূল, সংবাদবাহক।" 'পূজ্য মহারাজজী' সকলে এটুকু বলতেন—কারো বিচার খণ্ডন করেননি তিনি। বৈরাগ্যযুক্ত অনুগামীদের বলতেন—"কেবল আমার স্বরূপ দেখ। যদি তুমি সেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চাও তাহলে আমাকে দেখ, সন্দেহ করো না।" যাঁরা সন্দেহ করতেন তাঁদের অনুশাসনের মধ্যে রেখে, অন্তরে অনুভব-সঞ্চার করে, বাহ্য সমস্ত বিচার থেকে সরিয়ে, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে (অধ্যায় ২/৪০-৪৩) অনন্ত পূজা-পদ্ধতি যার অন্তর্গত, নিজের স্বরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি অদ্যাবধি মহাপুরুষরূপে অবস্থিত। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি গোপনীয় ছিল; কিন্তু নিজের অনন্য ভক্ত পূর্ণ অধিকারী অনুরাগী অর্জুনের প্রতি তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। প্রত্যেক ভক্তের জন্য সম্ভব, মহাপুরুষ লক্ষ্য-লক্ষ্য পরিচালিত করেন।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় এই সংসার। অশ্বত্থ একটা উদাহরণ মাত্র। ঊর্ধ্বে এর মূল পরমাত্মা এবং নিম্নে প্রকৃতিপর্যন্ত বিস্তৃত এর শাখা- প্রশাখা। যিনি এই বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসমূহ ঊর্ধ্বদেশে এবং অধোদেশে সর্বত্র বিস্তৃত

এবং '**মূলানি**'-এর মূলের জাল ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে সর্বত্র ব্যাপ্ত; কারণ সেই 'মূল' ঈশ্বর ও তিনিই বীজরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বাস করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে। একবার পদ্মফুলের উপর বসে ব্রহ্মা বিচার করছিলেন যে, আমার উৎপত্তি স্থান কোথায়? কোথায় আমার জন্ম হয়েছিল? তিনি সেই পদ্মফুলের নালে প্রবেশ করে অনবরত এগিয়ে যেতে লাগলেন; কিন্তু নিজের উদ্‌গম দেখতে পেলেন না। তখন তিনি হতাশ হয়ে পদ্মাসনে বসে পড়লেন। চিত্ত নিরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা করতে লাগলেন এবং ধ্যান দ্বারা তিনি নিজের মূল উৎস কোথায় তা খুঁজে পেলেন, পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করে তাঁর স্তব করলেন। পরমস্বরূপের দ্বারা অবগত হলেন যে, আমি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু আমার প্রাপ্তিস্থান হৃদয়। হৃদয়-দেশ-এ যিনি ধ্যান করেন, তিনি আমাকে লাভ করেন।

ব্রহ্মা প্রতীক স্বরূপ। যোগসাধন-এর পরিপক্ক অবস্থাতে এই স্থিতি জাগ্রত হয়। ঈশ্বর লাভে ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধিকেই ব্রহ্মা বলা হয়। পদ্মফুল জলে অবস্থিত হয়েও নির্মল ও নির্লিপ্ত থাকে। বুদ্ধি যতক্ষণ এদিক্-সেদিক্ সন্ধান করে, ততক্ষণ লাভ করতে পারে না; কিন্তু যখন সেই বুদ্ধিই নির্মলতার আসনে স্থির হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযম করে হৃদয়-দেশে নিরুদ্ধ করে এবং সেই নিরুদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহও যখন বিলীন হয়ে যায়, তখন স্বীয় হৃদয়ে পরমাত্মাকে লাভ করে।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে সংসার বৃক্ষস্বরূপ, যার মূল এবং শাখাসমূহ সর্বত্র বিস্তৃত। '**কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে**'– কর্মানুসারে কেবল মনুষ্য যোনিতে বন্ধন তৈরী করে, আবদ্ধ করে। অন্য যোনিতে যাঁদের জন্ম হয়, তারা কর্মের অনুসারে ভোগ উপভোগ করে। অতএব দৃঢ় বৈরাগ্য রূপ শস্ত্রদারা এই সংসার-বৃক্ষকে তুমি ছেদন কর এবং সেই পরমপদের অনুসন্ধান কর, যে মহর্ষিগণ তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

কিরূপে জানা যাবে যে, সংসার-বৃক্ষ ছেদন হয়েছে? যোগেশ্বর বলছেন যে, যিনি মান ও মোহমুক্ত, যিনি সঙ্গাদোষ জয় করেছেন, যাঁর কামনা নিবৃত্ত হয়েছে এবং যিনি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, তিনি সেই পরমতত্ত্বলাভ করেন। সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউ প্রকাশিত করতে পারে না, সেই পদ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। যাঁকে

লাভ করলে সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না, সেটাই আমার পরমধাম, এই ধাম লাভ করার অধিকার সকলের, কারণ এই জীবাত্মা আমারই শুদ্ধ অংশ।

জীবাত্মা দেহত্যাগের সময় মন ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সঙ্গে নিয়ে যায় অর্থাৎ নতুন দেহে প্রবেশ করে। সংস্কার সাত্ত্বিক হলে সাত্ত্বিক স্তরে গিয়ে পৌঁছয়, রাজসিক হলে মধ্যম স্থানে এবং তামসিক হলে জঘন্য যোনিতে জন্ম হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা মনের সাহায্যে সকল বিষয়কে উপভোগ করে। একে দেখতে পাওয়া যায় না, জ্ঞান সেই দৃষ্টি যার মাধ্যমে একে দেখা সম্ভব। কোন বিষয় মুখস্থ করে নেওয়াটাই জ্ঞান নয়। যোগীগণ চিত্ত হৃদয়ে সংযম করে প্রযত্নপূর্বক তাঁকে দর্শন করেন, অতএব জ্ঞান হল সাধনগম্য। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা তাঁর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়। সংশয়যুক্ত, অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ যত্নশীল হলেও এঁকে দেখতে পায় না।

এখানে প্রাপ্তিস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব সেই অবস্থাতে বিভূতিসমূহের প্রবাহ স্বাভাবিক। সে সকলের উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, সূর্য ও চন্দ্রে যে প্রকাশ আছে, সেই প্রকাশ আমার জানবে, অগ্নিতে যে তেজ আছে, সেই তেজও আমার। আমিই প্রচণ্ড অগ্নিরূপে চারবিধি দ্বারা পরিপক্ক অন্নকে পরিপাক করি। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে অন্ন একমাত্র বহ্ম- **'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/১)** যাকে লাভ করে এই আত্মা পূর্ণ তৃপ্ত হয়। বৈখরী থেকে পরাপর্যন্ত পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে অন্ন পরিপাক হয়ে যায়, সেই পাত্রও বিলীন হয়। এই অন্ন আমিই পরিপাক করি অর্থাৎ সদ্‌গুরু রথী না হলে, এই উপলব্ধি সম্ভব নয়।

এই বিষয়ের উপর জোর দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, সকল প্রাণীর অন্তর্দেশে অবস্থিত হয়ে আমিই স্মৃতি প্রদান করি। বিস্মৃত স্বরূপের স্মৃতি প্রদান করি। স্মৃতির সঙ্গে যে জ্ঞানলাভ হয় তা' আমি। এই জ্ঞানলাভের পথে যে বাধা উপস্থিত হয়, সেই বাধা আমিই দূর করি। আমিই জ্ঞাতব্য এবং বিদিত হলে জ্ঞানের অন্তকর্তাও আমি। কে কাকে জানবার জন্য প্রযত্নশীল হবে? আমি সেই বেদবিৎ। অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছিলেন, যিনি সংসার-বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনিই বেদবিৎ। যিনি এই সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনিই একে জানতে পারেন। এখানে বলছেন আমিই বেদবিৎ। সেই বেদবিৎগণের মধ্যে নিজের গণনাও করলেন অতএব শ্রীকৃষ্ণও এখানে বেদবিৎ পুরুষোত্তম তাঁকে লাভ করার অধিকার মানুষ মাত্রেরই।

পরিশেষে বললেন যে, দুই প্রকারের পুরুষ এই পৃথিবীতে আছেন। সকল ভূতপ্রাণীর দেহ ক্ষর। মন যখন কূটস্থ হয়, তখন এই পুরুষকে অক্ষর বলা হয়; অক্ষর হলেও এখনও দ্বন্দ্বাত্মক এবং এর থেকেও অতীত যাঁকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর, অব্যক্ত ও অবিনাশী বলা হয়, তিনি বস্তুতঃ অন্য। এই অবস্থা ক্ষর-অক্ষর-এর ঊর্ধ্বে; একেই পরমস্থিতি বলা হয়। এরসঙ্গে তুলনা করে বললেন, আমিও ক্ষর-অক্ষর-এর ঊর্ধ্বে, আমি সেই, তাই লোকে আমাকে পুরুষোত্তম বলে। এইরূপ যাঁরা উত্তমপুরুষকে জানেন, সেই জ্ঞানী ভক্তগণ সদা আমার ভজনা করেন। তাদের জ্ঞানে পার্থক্য নেই। অর্জুন! এই অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য সম্বন্ধে আমি তোমাকে বললাম। ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ সকলের সম্মুখে এসমস্ত কথা বলেন না; কিন্তু অধিকারী ভক্তের কাছে কিছু গোপন করেন না। গোপন করলে ভক্তের কল্যাণ কি করে হবে?

বর্তমান অধ্যায়ে আত্মার তিনটি স্থিতির বর্ণনা ক্ষর-অক্ষর এবং অতি উত্তম পুরুষের রূপে স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন এর আগে কোন অধ্যায়ে বলা হয়নি, অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'পুরুষোত্তমযোগো' নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।।১৫।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'পুরুষোত্তম যোগ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'পুরুষোত্তমযোগো' নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।।১৫।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'পুরুষোত্তম যোগ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।।

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন প্রস্তুত করার নিজস্ব বিশিষ্ট শৈলী। প্রথমে তিনি প্রকরণের বিশেষত্বের উল্লেখ করেন, যার ফলে জিজ্ঞাসুগণ সে বিষয়ে জানার জন্য আকৃষ্ট হন, তার পর তিনি সেই প্রকরণ স্পষ্ট করেন। উদাহরণার্থ কর্মকে নিন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়েই প্রেরণা দিয়েছেন— অর্জুন! কর্ম কর। তৃতীয় অধ্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন, নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কি? তখন বলেছেন যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। তারপর যজ্ঞের স্বরূপ কি তা না বলে যজ্ঞের উৎপত্তি হল কোত্থেকে ও যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি? আগে তা বললেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তেরো-চৌদ্দটি বিধির মাধ্যমে যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন, যজ্ঞকেই কর্ম বলেছেন। এখানে কর্ম কি তা স্পষ্ট হয়েছে, যার শুদ্ধ অর্থ—যোগ-চিন্তন, আরাধনা, যা' মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হয়।

এইরূপ তিনি নবম অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। এদের বিশেষত্ব বলেছেন যে, অর্জুন! যাদের স্বভাব আসুরী, তারা আমাকে তুচ্ছ ব্যক্তি বলে অবজ্ঞা করে। মনুষ্যদেহ আশ্রয়পূর্বক ব্যবহার করি কারণ মনুষ্য দেহেই আমি এই স্থিতিলাভ করেছি; কিন্তু আসুরী স্বভাব যাদের, সেই মূঢ়গণ আমাকে ভজনা করে না, দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত ভক্তগণ অনন্য চিত্তে আমাকে ভজনা করেন। এখনও পর্যন্ত এই দুটি প্রবৃত্তির স্বরূপ, এদের গঠন সম্বন্ধে বলা হয়নি। এখন বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর এদের স্বরূপ স্পষ্ট করবেন, উভয়ের মধ্যে আগে দৈবী সম্পদের লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।।১।।

ভয়শূন্য, অন্তঃকরণের শুদ্ধতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানে অচলস্থিতি অথবা নিরন্তর একাগ্রতা, সর্বস্বের সমর্পণ, উত্তমরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, যজ্ঞের আচরণ (যেরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন—সংযমাগ্নিতে আহুতি, ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি, প্রাণ-অপান-এ আহুতি এবং শেষে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি অর্থাৎ আরাধনার প্রক্রিয়া, যা কেবল মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের অন্তর্ক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হয়। তিল, যব, বেদী ইত্যাদি সামগ্রী দ্বারা যে যজ্ঞসম্পন্ন হয়, সেই যজ্ঞের এই গীতোক্ত যজ্ঞের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কোন কর্মকাণ্ডকে যজ্ঞ বলে স্বীকার করেননি।), স্বাধ্যায় অর্থাৎ যে অধ্যয়ন স্ব-স্বরূপের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তপস্যা অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ইষ্টের অনুরূপ তৈরী করা এবং '**আর্জবম্**'- দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণের সরলতা—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।।২।।

অহিংসা অর্থাৎ আত্মার উদ্ধার (আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যাওয়াই হিংসা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে এই সকল প্রজার হননকর্তা এবং বর্ণসঙ্করের কর্তা হব। আত্মার শুদ্ধবর্ণ হল পরমাত্মা। আত্মা যখন প্রকৃতির মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়, তখনই বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, আত্মার হিংসা একেই বলা হয় এবং আত্মার উদ্ধার করাকে অহিংসা বলা হয়।), সত্য (সত্যের তাৎপর্য যথার্থ ও প্রিয় বাক্য নয়। আপনি যদি বলেন এই বস্ত্রটি আমার, তাহলে কি আপনি সত্য বলছেন? এর থেকে বড় মিথ্যা আর কি হবে? দেহটাই যখন আপনার নয়, নশ্বর, তখন এই দেহ আবৃত করার বস্ত্র আপনার কি করে হতে পারে? বস্তুতঃ যোগেশ্বর স্বয়ং সত্যের স্বরূপ বলেছেন যে, অর্জুন! সত্য বস্তুর তিনকালে অভাব নেই। এই আত্মাই সত্য, পরমসত্য—এই সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখা।), ক্রোধহীনতা, সর্বস্বের সমর্পণ, শুভাশুভ কর্মফলের ত্যাগ, চিত্ত চাঞ্চল্যের অভাব, লক্ষ্যের বিপরীত নিন্দিত কাজ না করা, সর্বভূতে দয়া, ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও বিষয়াসক্তের অভাব, কোমলতা, লক্ষ্য থেকে বিমুখ হতে লজ্জা, ব্যর্থ চেষ্টার অভাব এবং—

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩।।

তেজ (যা একমাত্র ঈশ্বরে আছে, তাঁর তেজে যিনি কার্য করেন। মহাত্মাবুদ্ধের দৃষ্টি-নিক্ষেপমাত্র অঙ্গুলিমালের বিচারে পরিবর্তন হয়েছিল। সেই তেজের জন্য এইরূপ সম্ভব হয়েছিল, যার দ্বারা কল্যাণ হয়, এই তেজ বুদ্ধের মধ্যে ছিল), ক্ষমা, ধৈর্য, শুদ্ধি, অবৈরভাব, পূজনীয় হবার ভাব যাঁর মধ্যে নেই- হে অর্জুন! দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। এইভাবে ছাবিশটি লক্ষণ বললেন, যা সাধনাতে পরিপক্ক পুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব এবং আংশিকরূপে আপনার মধ্যেও আছে এবং আসুরী প্রবৃত্তি যাদের মধ্যে বিশেষ রূপে সক্রিয়, এইরূপ মানুষের মধ্যেও এইসব গুণ আছে; কিন্তু প্রসুপ্ত অবস্থাতে, তবেই তো ঘোর পাপীও কল্যাণের অধিকারী। এখন আসুরী সম্পদের প্রমুখ লক্ষণ বলছেন—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪।।

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কঠোরবাক্য ও অজ্ঞান—এগুলি আসুরী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ। এই দুই সম্পদের কাজ কি?—

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।।৫।।

এই দুই সম্পদের মধ্যে দৈবী সম্পদ্ '**বিমোক্ষায়**'—মুক্তির কারণ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। হে অর্জুন! শোক করো না; কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষ মুক্তিলাভ করবে অর্থাৎ আমাকে লাভ করবে। সেই সম্পদ্ দুটি কোথায় থাকে?—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬।।

হে অর্জুন! এই লোকে ভূতগণের স্বভাব দুই প্রকারের হয়— দেরতুল্য ও অসুরতুল্য। যখন দৈবী সম্পদ্ হৃদয়ে কাজ করে তখন এই মানুষই দেবতা এবং যখন আসুরী সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন এই মানুষই অসুর। সৃষ্টিতে কেবল এই দুটি জাতিরই মানুষ বিদ্যমান। তা তাঁর জন্ম আরবদেশ অথবা অষ্ট্রেলিয়া যেখানেই

হয়ে থাকুক; তিনি এই দুটির মধ্যেই কোন একটি সম্পদ্‌যুক্ত হবেন। এখন পর্যন্ত দেব-স্বভাব সম্বন্ধেই বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এবার অসুর-স্বভাব সম্বন্ধে আমার কাছে শোন।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষুবিদ্যতে।।৭।।

হে অর্জুন ! অসুর-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'কার্যম্ কর্মে' প্রবৃত্ত এবং অকর্তব্য কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না সেইজন্য তাদের মধ্যে শুদ্ধি থাকে না, আচরণ এবং সত্য থাকে না। ঐ ব্যক্তিগণের বিচারধারা কিরূপ হয় ?—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎকামহৈতুকম্।।৮।।

আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বলে, এই জগৎ আশ্রয়রহিত, মিথ্যা ও ঈশ্বর ব্যতীরেকে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। সেইজন্য ভোগ-উপভোগ করা। ভিন্ন আর কি আছে?

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ।।৯।।

এই মিথ্যা দৃষ্টিকোণ আশ্রয় করে যাদের স্বভাব নষ্ট হয়েছে, সেই অল্পবুদ্ধি, অনিষ্টকারী ও ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।

মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্‌প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ।।১০।।

দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হয়ে, যে কামনা কখনও পূর্ণ হবে না তার আশ্রয় নিয়ে, অজ্ঞানবশতঃ মিথ্যা সিদ্ধান্তগ্রহণপূর্বক সেই অশুভ এবং অশুদ্ধব্রত ব্যক্তিগণ সংসারে প্রবৃত্ত হয়। তারা ব্রতও করে; কিন্তু অশুদ্ধ।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১।।

তারা মৃত্যুকালপর্যন্ত অনন্ত চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে, বিষয়ভোগের জন্য তৎপর 'আনন্দ এইটুকু'—এইরূপ চিন্তা করে। তারা এই রীতি অনুসরণ করে যে, যতটা হতে পারে ভোগ সংগ্রহ কর, এছাড়া কিছু নেই।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২।।

শত শত আশারূপ ফাঁস-এ আবদ্ধ (একটা ফাঁসেই মানুষের মৃত্যু হয়, এখানে শত শত ফাঁসদ্বারা) কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে তারা বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়পূর্বক ধনাদি বহু পদার্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ধনের জন্য তারা দিবা-রাত্রি অসামাজিক কাজে প্রবৃত্ত থাকে আরও বলছেন—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩।।

তারা চিন্তা করে যে আজ আমার এই লাভ হয়েছে, এই মনোরথ ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে, আমার এত ধন আছে, এত ধন ভবিষ্যতে লাভ হবে।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্সুখী।।১৪।।

এই শত্রু আমি নাশ করেছি এবং অন্য শত্রু সকলও নাশ করব। আমি ঈশ্বর ও ঐশ্বর্যভোগী। আমিই পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান ও সুখী।

আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫।।

আমি ধনী ও বিশাল পরিবারভুক্ত। আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব—এইরূপে অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ অজ্ঞানমুগ্ধ হয়। তাহলে যজ্ঞ, দান কি অজ্ঞান? এই প্রসঙ্গে শ্লোক ১৭তে বলা হয়েছে। এর পরেও তারা স্থির হয় না, বরং বহু প্রাপ্তির মধ্যে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ।।১৬।।

বহুসংকল্পে বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়-ভোগে আসক্ত হয়ে সেই অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলবেন যে, নরক কাকে বলে?—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্।।১৭।।

তারা আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট, ধন ও মানের মদযুক্ত হয়ে দম্ভের সঙ্গে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। যে যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সেই যজ্ঞই কি করে?

না, সেই বিধিত্যাগ করে, করে। কারণ বিধিসম্বন্ধে স্বয়ং যোগেশ্বর বলেছেন। (অধ্যায় ৪/২৪-৩৩ এবং অধ্যায় ৬/১০-১৭)

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।।১৮।।

তারা অন্যের নিন্দা করে এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা ও ক্রোধ আশ্রয়পূর্বক স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (অন্তর্যামী পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। শাস্ত্রবিধিদ্বারা পরমাত্মাকে স্মরণ করা এক প্রকারের যজ্ঞ। শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যারা নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, যজ্ঞের নাম করে কোন না কোন অনুষ্ঠান করতেই থাকে, তারা স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। মানুষ দ্বেষ করেই আর রেহাইও পায়। এরাও কি নিস্তার পাবে? এই প্রসঙ্গে বলছেন—না,

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯।।

আমাকে দ্বেষ করে যারা, সেই পাপীচারী, ক্রূরকর্মা নরাধমগণকে আমি সংসারে আসুরী যোনিতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করি। যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যজন করে, তারা পাপযোনি, তারাই মনুষ্য মধ্যে অধম, এদেরই ক্রূরকর্মা বলা হয়েছে। অন্য কেউ অধম নয়। পূর্বে বলেছেন, এইরূপ অধমগণকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি, তাকেই এখানে বললেন যে তাদের কে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

একেই নরক বলা হয়। সাধারণ জেলের যাতনাই ভয়ঙ্কর হয়, এখানে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্তের ক্রম কত পীড়াদায়ক হবে। অতএব দৈবী সম্পদ্ অর্জন করার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০।।

কৌন্তেয়! মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে লাভ করা দূরে থাক, পূর্বজন্মপেক্ষা আরও নীচযোনি লাভ করে, যাকে নরক বলা হয়। এখন দেখুন, নরকের উৎপত্তির কারণ–

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ–এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। এরা আত্মার অধোগতিদায়ক। অতএব এই তিনটি ত্যাগ করা উচিত। সমস্ত আসুরী সম্পদ্ এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত। এদের ত্যাগ করলে কি লাভ হয়?–

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।২২।।

কৌন্তেয়! এই তিনটি নরকদ্বার থেকে মুক্ত হলে মানুষ স্বীয় কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং সেই অনুষ্ঠানবশতঃ সে পরমগতি অর্থাৎ আমাকে লাভ করে। এই তিনটি বিকার ত্যাগ করার পরেই মানুষ নিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, যার পরিণাম পরমশ্রেয়ঃ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩।।

যিনি উপর্যুক্ত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক (অন্য কোন শাস্ত্র নয়, **'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্'**–(১৫/২০) গীতা স্বয়ং পূর্ণ শাস্ত্র, যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সেই বিধি ত্যাগ করে) স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিহিতের আচরণ করেন না অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি সিদ্ধিলাভের যোগ্য হন না, তিনি পরমগতি এবং সুখলাভ করতে পারেন না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।২৪।।

অতএব অর্জুন! কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে যে—কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, শাস্ত্রই এ বিষয়ে তোমার জ্ঞাপক। অতএব শাস্ত্রবিধির স্বরূপ জেনে তোমার নিয়ত কর্ম করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়েও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ '**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং**'— নিয়ত কর্মের উপর জোর দিয়েছেন ও বলেছেন যে, যজ্ঞের প্রক্রিয়াই সেই নিয়ত কর্ম এবং সেই যজ্ঞ আরাধনার বিধি-বিশেষর বর্ণনাকেই বলা হয়েছে, যা' মন নিরুদ্ধ করে শাশ্বত ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়ে দেয়। এখানে তিনি বলছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং লাভ এরাই নরকের তিনটি মুখ্য দ্বার। এই তিনটি ত্যাগ করার পরেই সেই কর্মের (নিয়ত কর্মের) আরম্ভ হয়, যা আমি বারংবার বলেছি, যে আচরণ পরমকল্যাণ ও পরমশ্রেয় প্রদান করে। সাংসারিক কাজে যে যত ব্যস্ত, কাম, ক্রোধ এবং লোভ তার মধ্যে সেই পরিমাণেই পাওয়া যায়। কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করার পরেই কর্মে প্রবেশ পাওয়া যায়, কর্মের আচরণ সম্ভব হয়। যারা সেই বিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে আচরণ করে, তারা সুখ, সিদ্ধি অথবা পরমগতি কিছুই লাভ করতে পারে না। কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্ধারণের শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রবিধির অনুসারে তোমার কর্ম করা উচিত এবং সেই শাস্ত্র হল 'গীতা'।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৈবী সম্পদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রস্তুত অধ্যায়ে ধ্যানে স্থিতি, সর্বস্বের সমর্পণ, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলির দমন, মনের শমন, যে অধ্যয়ন স্বরূপের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই অধ্যয়ন, যজ্ঞকর্মে যত্নশীল, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করা, ক্রোধহীনতা, চিত্তে শান্তভাব ইত্যাদি ছাব্বিশটি সদ্‌গুণ সম্বন্ধে বললেন, যে সদ্‌গুণগুলি যোগসাধনাতে প্রবৃত্ত ইষ্টের নিকটবর্তী যে কোন সাধকের মধ্যেই থাকা সম্ভব। আংশিকরূপে সকলের মধ্যেই আছে।

তদনন্তর তিনি আসুরী সম্পদের অন্তর্গত যে চার-ছয়টি প্রমুখ বিকার আছে, সে সকলের নাম নিয়েছেন; যেমন—অভিমান, দম্ভ, কঠোরতা, অজ্ঞান ইত্যাদি ও

শেষে বললেন যে, অর্জুন! দৈবী সম্পদ্ '**বিমোক্ষায়**'– পূর্ণ নিবৃত্তিতে সাহায্য করে, পরমপদের প্রাপ্তির জন্য এর প্রয়োজন হয় এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে ও অধোগতিতেনিয়ে যায়। অর্জুন! তুমি শোক করো না; কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ সম্পন্ন।

এই দুটি সম্পদের উৎপত্তি হয় কোথায়? তিনি বলেছেন, এই জগতে মানুসের স্বভাব দুই প্রকারের–দেবতুল্য ও অসুরতুল্য। যখন দৈবী সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন মানুষ দেবতুল্য হয় এবং যখন আসুর সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন মানুষই অসুরতুল্য হয়। এই সৃষ্টিতে মানুষের কেবল দুটি জাতি; তাতে কোথাও জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

এর পর তিনি আসুর স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বললেন। আসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত এবং অকর্তব্য কার্য থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। কর্মে প্রবৃত্ত হয়নি সেইজন্য তাদের শৌচ নেই, আচরণ নেই এবং সত্যও নেই। তারা বলে এই জগৎ আশ্রয়রহিত, ঈশ্বর ব্যতিরেকে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। অতএব ভোগ হল জীবনের পরম পুরুষার্থ। এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এই ধরণের চিন্তনধারা কৃষ্ণকালেও ছিল। সর্বদা ছিল। কেবল চার্বাক বলেছেন, এমন কথা নয়। যতক্ষণ মানুষের মনে দৈবী-আসুরী প্রবৃত্তির ওঠা-নামা চলবে, ততক্ষণ থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সেই মন্দবুদ্ধি ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ সকলের অহিত (কল্যাণনাশ) করার জন্য জগতে উৎপন্ন হয়। তারা বলে থাকে– এই শত্রুকে আমি নাশ করেছি, পরে অমুক শত্রুর নাশ করব ইত্যাদি। এইরূপ অর্জুন! কাম, ক্রোধ আশ্রয় করে সেই ব্যক্তিগণ শত্রুনাশ করে না বরং স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। তবে কি অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে জয়দ্রথাদিকে বধ করেছিলেন? যদি বধ করেছিলেন, তাহলে আসুর স্বভাব বিশিষ্ট তিনি, পরমাত্মাকে দ্বেষ করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্পষ্ট বলেছিলেন যে তুমি দৈবী সম্পদ্ সম্পন্ন, শোক করো না। এখানেও একথা স্পষ্ট হল যে, সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের নিবাস। স্মরণ রাখা উচিত যে, একজন তোমাকে সবসময় দেখছেন। অতএব সদা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়ার আচরণ করা উচিত অন্যথা দণ্ড প্রস্তুত।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন যে, আসুর শ্বভাব বিশিষ্ট ক্রূর ব্যক্তিগণকে আমি পুনঃপুনঃ নরকে নিক্ষেপ করি। নরকের স্বরূপ কি? বললেন, বারংবার

নীচ-অধম যোনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া একে অন্যের পর্যায়। এই হল নরকের স্বরূপ। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। সমস্ত আসুর সম্পদ্ এই তিনটির অন্তর্ভুত। এই তিনটি ত্যাগের পরেই সেই কর্ম আরম্ভ হয়, যা' আমি বার বার বলেছি। অতএব কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করার পরেই কর্ম শুরু হয়।

সাংসারিক কার্যে, মর্যাদা অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা নির্বাহে যিনি যত ব্যস্ত, কাম-ক্রোধ ও লোভ তাঁদের মধ্যে সেই পরিমাণেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই তিনটি ত্যাগ করার পরেই কর্মে প্রবেশ লাভ হয়, যা' পরম-এ স্থিতি প্রদান করে। সেইজন্য কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় এই কর্তব্য, অকর্তব্যের নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। কোন শাস্ত্র ? এই গীতাশাস্ত্র; **'কিমন্যৈ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।'** সেইজন্য এই শাস্ত্রদ্বারা নির্ধারিত কর্ম-বিশেষ (যজ্ঞার্থ কর্ম) তুমি কর।

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৈবী ও আসুর দুটি সম্পদেরই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের স্থান মানব-হৃদয় বললেন। তাদের ফল সম্বন্ধে বললেন। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো' নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ' নামক ষোড়শ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো' নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ।।১৬।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ' নামক ষষ্ঠদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।।

ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছিলেন যে, কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করলেই কর্ম শুরু হয়, যা আমি বারংবার বলেছি। নিয়ত কর্মের আচরণ না করলে সুখ, সিদ্ধি বা পরমগতি কিছুই লাভ হয় না। সেইজন্য এখন তোমার জন্য কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্ধারণের যে, কি করা উচিত, কি নয়?– এই সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। অন্য কোন শাস্ত্র নয় বরং **"ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদম্" (১৫/২০)**, শাস্ত্র স্বয়ং গীতা। অন্য শাস্ত্রও আছে; কিন্তু এখানে এই শাস্ত্রেরই অধ্যয়ন করুন, অন্য শাস্ত্র খুঁজবার দরকার নেই। অন্য কোথাও এই ক্রমবদ্ধতা পাওয়া যাবে না, সেইজন্য ভ্রান্ত হতে পারেন।

ষএই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! যে ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে **'যজন্তে'**–যজন অর্থাৎ যজ্ঞ করেন, তাঁদের কিরূপ গতি হয়? তাঁদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসিক অথবা তামসিক? কারণ অর্জুন আগে শুনেছিলেন যে, সাত্ত্বিকী, রাজসিক অথবা তামসিক হোক, যতক্ষণ গুণ বিদ্যমান, ততক্ষণ কোন না কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতেই হয়। সেইজন্য প্রস্তুত অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১।।

হে কৃষ্ণ! যাঁরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন, তাঁদের গতি কি হয়? তাঁদের সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসিক অথবা তামসিক? দেবতা, যক্ষ, ভূত সকলেই যজনের অর্থাৎ যজ্ঞের অন্তর্ভুত।

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর বলেছিলেন যে, অর্জুন! এই যোগসাধনাতে নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই। অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হয় সেইজন্য তারা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। বহিঃ শোভাময় বাণীতে তা ব্যক্তও করে। যাদের চিত্ত সেই সকল বাক্যে বিমুগ্ধ, অর্জুন! তাদের বুদ্ধিনাশ হয় না। কিছু লাভ করতে পারে না। তারই পুনরাবৃত্তি এখানেও হয়েছে যে, "**শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য**"–যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ভজনা করে, তাদের শ্রদ্ধা তিন প্রকারের।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধাও তিন প্রকার সাত্ত্বিকী, রাজসিক ও তামসিক, এই বিষয়ে তুমি আমার কাছে শোন। মানুষের হৃদয়ে এই শ্রদ্ধা নিরন্তর বিদ্যমান–

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩।।

হে ভারত! সকল মানুষের শ্রদ্ধা তাদের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হয়। মানুষ শ্রদ্ধালু, সেইজন্য যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। প্রায়ই লোকে জিজ্ঞাসা করেন–আমি কে? কেউ বলে, আমি আত্মা। কিন্তু না, এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যেরূপ শ্রদ্ধা, যেরূপ বৃত্তি, মানুষ সেইরূপই হয়।

গীতা হল যোগদর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগী ছিলেন। তাঁর 'যোগদর্শন' গ্রন্থটি এক যোগ-বিষয়ক গ্রন্থ। যোগ কি? তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন, '**যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।**' (১/২)–চিত্তবৃত্তিসমূহকে সর্বপ্রকারে নিরুদ্ধ করাকেই যোগ বলে। কেউ পরিশ্রম করে রোধ করে নিলে, তাতে লাভ কি? '**তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্।**' (১/৩)– সেই সময় এই দ্রষ্টা জীবাত্মা নিজের শাশ্বত স্বরূপে স্থিত হন। স্থিত হওয়ার পূর্বে তিনি কি মলিন ছিলেন? পতঞ্জলি বলেছেন– '**বৃত্তিসারুপ্যমিতরত্র।**'(১/৪)। অন্য সময় যেরূপ বৃত্তির রূপ হয়, সেইরূপই সেই দ্রষ্টা হন। এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- মানুষ শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধায় ওত-প্রোত। এক কথায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মানুষের প্রকৃতিজাত যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। যেরূপ বৃত্তি, মানুষ সেইরূপই হয়। এখন শ্রদ্ধার তিনটি ভেদ বলছেন–

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪।।

তাঁদের মধ্যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত ও প্রেতাদির পূজা করেন। তাঁরা পূজাদিতে যথেষ্ট পরিশ্রমও করেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫।।

সেই ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর কল্পিত (কল্পিত ক্রিয়ার রচনা করে) তপস্যার অনুষ্ঠান করে, দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত, কামনা-আসক্তি-বলান্বিত হয়ে—

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬।।

তারা দেহরূপে স্থিত ভূতসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণস্থিত আমাকে (অন্তর্যামীকে) কৃশ করে অর্থাৎ দুর্বল করে। আত্মা প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে বিকার সমূহদ্বারা দুর্বল ও যজ্ঞ-সাধনা দ্বারা সবল হয়। সেই অবিবেকীগণ (অজ্ঞানীগণ) কে আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট বলে জানবে অর্থাৎ তারা সকলেই অসুর। প্রশ্নটি এখানেই সম্পূর্ণ হল।

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করেন। কেবল পূজাই করেন না, ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু অর্জুন! দেহরূপে স্থিত ভূতগণকে ও অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দুর্বল করেন, আমার থেকে দূরে সরে যান, ভজনা করেন না। তাদের তুমি অসুর বলে জানবে অর্থাৎ দেবতাগণের পূজকগণও অসুর হয়। এর থেকে বেশী আর কেউ কি বলবে? অতএব এরা সকলেই যাঁর অংশমাত্র, সেই মূল এক পরমাত্মার ভজন করুন। এই প্রসঙ্গের উপর পরম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বারংবার জোর দিয়েছেন।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭।।

অর্জুন! যেরূপ শ্রদ্ধা তিন প্রকার হয়, সেইরূপ পূর্বোক্ত তিন প্রকার লোকের আহারও সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হয় এবং সেইরূপ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তিন প্রকার হয়। এদের প্রভেদ তুমি শ্রবণ কর। প্রথমে প্রস্তুত আহার—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮।।

যে সকল আহার আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে মনোরম, বল, আরোগ্য, বুদ্ধি এবং আয়ুবর্দ্ধক আহার সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে কোন খাদ্য পদার্থই সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক নয়। গ্রহণ কিভাবে করা হয় সেই অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়। দুধ সাত্ত্বিক নয়, পেঁয়াজ রাজসিক নয় এবং রসুনও তামসিক নয়।

যতদূর বল, বুদ্ধি, আরোগ্য এবং মনোরম খাদ্যের প্রশ্ন, তা গোটা বিশ্বে মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতি, বাতাবরণ ও পরিস্থিতির অনুকূল বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রিয় হয়। যেমন-বাঙ্গালী ও মাদ্রাজের লোকেদের ভাত প্রিয় এবং পাঞ্জাবীরা রুটি পছন্দ করে। একদিকে আরববাসীরা দুম্বা, চীনারা ব্যাঙ, মেরু-অঞ্চলে মাংস ছাড়া জীবন চলে না। রুশ ও মঙ্গোলিয়ার আদিবাসী খাদ্যে ঘোড়ার প্রয়োগ করে, ইউরোপবাসী গরু ও শুকর দু-ই খায়, তবুও বিদ্যা, বুদ্ধি-বিকাশ এবং উন্নতিতে আমেরিকা ও ইউরোপবাসী প্রথম শ্রেণীর বলে গন্য হচ্ছে।

গীতাশাস্ত্রের অনুসারে সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর ভোজ্য পদার্থ সাত্ত্বিক। দীর্ঘ আয়ু, অনুকূল, বল-বুদ্ধিবর্দ্ধক, আরোগ্যবর্দ্ধক পদার্থ সাত্ত্বিক। যে ভোজ্য পদার্থে চিত্ত তৃপ্ত হয় সেই খাদ্যকে সাত্ত্বিক বলা হয়। অতএব কোন খাদ্য পদার্থ কম-বেশী করার প্রয়োজন নেই। পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং দেশকালের অনুসারে যে খাদ্য বস্তু প্রিয় এবং জীবনীশক্তি প্রদান করে, সেই খাদ্যবস্তুই সাত্ত্বিক। কোন খাদ্য পদার্থ সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক নয়, গ্রহণ কিভাবে করা হয় সেই অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়।

এই অনুকূলনের জন্য যাঁরা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরের আরাধনাতে লিপ্ত, সন্ন্যাস আশ্রমে আছেন, তাঁদের জন্য মাংস-মদিরা ত্যাজ্য; কারণ অনুভবে দেখা গেছে যে, এই সকল পদার্থ আধ্যাত্মিক মার্গের বিপরীত মনোভাব উৎপন্ন করতে সাহায্য করে, অতএব এই সমস্ত ব্যবহার করলে সাধন-পথ থেকে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যাঁরা নির্জনে বাস করেন বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁদের জন্য

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এক খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করেছেন যে, 'যুক্তাহার বিহারস্য' এটি মনে রেখে আচরণ করা উচিত। খাদ্য গ্রহণ ততটাই করা উচিত, যতটা (যা) আরাধনাতে সহায়ক।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯।।

তিক্ত, অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শুষ্ক, প্রদাহকর এবং দুঃখ, চিন্তা ও রোগ সৃষ্টি করে যে সকল আহার রাজসিকগণের প্রিয় হয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০।।

যে আহার ঘন্টা পূর্বে পাক করা হয়েছে, '**গতরসং**'–রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট (এঁটো) এবং অপবিত্র, সেই আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। প্রশ্নটি এখানেই সম্পূর্ণ হল। এখন প্রস্তুত 'যজ্ঞ'–

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১।।

যে যজ্ঞ '**বিধিদৃষ্ট**'–শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত করা হয়েছে। (যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের নাম মাত্র নিয়েছেন, চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের স্বরূপ বলেছেন যে, বহুযোগী প্রাণকে অপানে, অপানকে প্রাণে আহুতি দেন। প্রাণ-অপানের গতি নিরুদ্ধ করে প্রাণের গতি স্থির করেন, সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন। এইভাবে যজ্ঞের চৌদ্দটি সোপান সম্বন্ধে বলেছেন, যেগুলি ব্রহ্মকে লাভ করার একটাই ক্রিয়ার উঁচু-নীচু অবস্থা-বিশেষ। সংক্ষেপে যজ্ঞ চিন্তন বিশেষের প্রক্রিয়ার বর্ণনা, যার পরিণাম সনাতন ব্রহ্মে স্থিতিলাভ হয়। এই শাস্ত্রে যার বিধান দেওয়া হয়েছে।) সেই শাস্ত্র-বিধানের উপর পুনরায় জোর দিলেন যে, অর্জুন ! শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত, যার আচরণ কর্তব্য এবং যা মনকে নিরুদ্ধ করে, যার আচরণ ফলাকাঙ্ক্ষাশূণ্য পুরুষগণ করেন, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২।।

হে অর্জুন! যে যজ্ঞ কেবল দম্ভপ্রকাশের জন্যই অথবা ফলকামনা করে অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে। রাজসকর্তা যজ্ঞের বিধি সম্বন্ধে অবগত; কিন্তু দম্ভপ্রকাশ অথবা ফলকামনা করে অনুষ্ঠিত হয় যে, অমুক বস্তুলাভ হবে এবং লোকে বলবে যে যজ্ঞ করে, প্রশংসা করবে, এইরূপ যজ্ঞকর্তা রাজসিক হয়। এখন তামসিক যজ্ঞের স্বরূপ বলেছেন–

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩।।

যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবর্জিত, যা অন্নের (পরমাত্মার) সৃষ্টি করতে অসমর্থ, মনের অন্তরালে নিরুদ্ধ করার ক্ষমতাশূণ্য, দক্ষিণাবিহীন অর্থাৎ সর্বস্বের সমর্পণরহিত এবং শ্রদ্ধারহিত, এইরূপ যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। এইরূপ ব্যক্তিগণ বাস্তবিক যজ্ঞ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এখন প্রস্তুত তপস্যা–

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪।।

পরমদেব পরমাত্মা, দ্বৈতভাব জয়কর্তা দ্বিজ, সদ্‌গুরু এবং জ্ঞানীগণের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা–এইগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে। দেহ সর্বদা বাসনাভিমুখে ধাবিত, একে অন্তঃকরণের উপর্যুক্ত বৃত্তির অনুরূপ গড়ে তোলাই কায়িক তপস্যা।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫।।

অনুদ্বেগকর, প্রিয়, হিতকর এবং সত্যবচন ও পরমাত্মায় স্থিতি প্রদান করে যে শাস্ত্রগুলি, সেই শাস্ত্ররে চিন্তনের, নামজপকে বাচিক তপস্যা বলে। বাণী বিষয়োন্মুখ বিচারগুলিকেও ব্যক্ত করে থাকে। একে সেদিক থেকে সংযম করে পরমসত্য পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত করাকে বাচিক তপস্যা বলে। এখন মানসিক তপস্যা দেখুন–

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।।১৬।।

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌন অর্থাৎ ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য বিষয়ের স্মরণও যেন না আসে, মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। উপর্যুক্ত তিনটি (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) যে তপস্যা করেন, তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭।।

ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ পরমশ্রদ্ধাসহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা করেন, তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। এখন প্রস্তুত রাজসিক তপস্যা—

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮।।

সৎকার, সম্মান ও পূজা পাবার আশায় অথবা দম্ভপূর্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই অনিশ্চিত এবং ক্ষণিক ফলবিশিষ্ট তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে।

মূঢগ্রাহেণাত্মনো যৎপীডয়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।।১৯।।

যে তপস্যা মুর্খতাপূর্বক আগ্রহ দ্বারা, মন, বাণী ও দেহকে কষ্ট দিয়ে অথবা অপরের অনিষ্টের জন্য করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলে।

এইরূপ সাত্ত্বিক তপস্যাতে দেহ, মন ও বাণীকে ইষ্টের অনুরূপ তৈরী করা হয়। রাজসিক তপস্যাতে ক্রিয়া সেই একই; কিন্তু দম্ভমান সম্মানের ইচ্ছা নিয়ে তপস্যা করেন। প্রায়ই মহাত্মাগণ গৃহত্যাগ করার পরেও এই বিকারের শিকার হন এবং তামসিক তপস্যা অবিধিপূর্বক সম্পাদন হয়, পরপীড়নের জন্য করা হয়। এখন প্রস্তুত দান—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০।।

‘দান করা কর্তব্য’—এইভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করে স্থান, কাল ও উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১।।

যে দান অনিচ্ছাসত্ত্বে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে দান করা হয়) এবং প্রত্যুপকারের আশায় 'এই করলে এই ফললাভ হবে' অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

অশুচিস্থানে, অশুভসময়ে ও অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞাপূর্বক ও সৎকাররহিত যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন—'হো, কুপাত্রে দান করলে দাতা নষ্ট হয়ে যায়।' সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বলছেন যে, দান করাই কর্তব্য। পুণ্যস্থানে, শুভসময়ে ও উপযুক্ত পাত্রে প্রত্যুপকারের আশা না করে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বে, ফললাভের উদ্দেশ্যে যে দান করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে এবং সৎকাররহিত, তিরস্কারপূর্বক প্রতিকূল স্থানে, সময়ে, কুপাত্রে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক বলে, পরন্তু সেটাও দান। যিনি দেহ-গেহ ইত্যাদির আসক্তি ত্যাগ করে একমাত্র ইষ্টের উপর নির্ভরশীল, তাঁর জন্য দানের বিধান এর থেকে আরও উন্নত এবং তা হল সর্বস্বের সমর্পণ, সম্পূর্ণভাবে বাসনামুক্ত হয়ে মন সমর্পণ, যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'**ময্যেব মন আধৎস্ব।**' অতএব দান করা নিতান্ত আবশ্যক। এখন প্রস্তুত ওঁ, তৎ ও সৎ-এর স্বরূপ—

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩।।

অর্জুন! ওঁ, তৎ ও সৎ—এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম '**ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ**'—ব্রহ্মের নির্দেশ করে, স্মরণ করিয়ে দেয়, সঙ্কেত প্রদান করে এবং যা হল ব্রহ্মের পরিচায়ক। তার থেকেই '**পুরা**'—পূর্বকালে (আরম্ভে) ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ এবং বেদ ওঁ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এগুলি যোগজাত। ওঁ-এর সতত চিন্তন দ্বারাই এদের উৎপত্তি হয়, আর কোন পথ নেই।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।২৪।।

এইজন্য ওঁ এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে পুরুষগণ শাস্ত্র-বিধান অনুযায়ী যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্মঅনুষ্ঠান করেন, যারফলে সেই ব্রহ্মের স্মরণ হয়ে আসে। এখন 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ বলছেন–

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫।।

'তৎ' অর্থাৎ সেই (পরমাত্মা-ই) সর্বত্র ব্যাপ্ত, এইভাবে তৎ ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে শাস্ত্রদ্বারা নির্দিষ্ট নানা প্রকার যজ্ঞ তপদানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তৎ শব্দটি পরমাত্মার প্রতি সমর্পণসূচক। অর্থাৎ ওঁ জপ করুন, যজ্ঞ, দান ও তপাদি কর্ম তাঁর উপর নির্ভর হয়ে করে যান। এখন সৎ-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে বলছেন–

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎপ্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬।।

এবং সৎ; যোগেশ্বর বলছেন যে সৎ কি? গীতাশাস্ত্রে শুরুতেই অর্জুন বলেছিলেন যে কুলধর্মই শাশ্বত, সত্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন–অর্জুন! এই অজ্ঞান তোমার কোত্থেকে উৎপন্ন হল? সৎ বস্তুর তিনকালে অভাব নেই, তার বিনাশ সম্ভব নয় এবং অসৎ বস্তুর তিনকালে অস্তিত্ব নেই, তাকে নিরস্ত করা যায় না। বস্তুতঃ সেটি কোন্ বস্তু, যার তিনকালে অভাব নেই? সেই অসৎ বস্তুই বা কি, যার অস্তিত্ব নেই? উত্তরে বললেন–এই আত্মাই সত্য এবং ভূতাদির দেহ নাশবান্। আত্মা সনাতন, অব্যক্ত, শাশ্বত এবং অমৃতস্বরূপ। এই হল পরমসত্য।

এখানে বলছেন, 'সৎ' এইরূপ পরমাত্মার এই নাম '**সদ্ভাবে**'– সত্যভাবে ও সাধুভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং হে পার্থ! যখন নিয়ত কর্ম সাঙ্গোপাঙ্গ, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। সৎ-এর অর্থ এই নয় যে, এই সমস্ত বস্তু আমার। যখন দেহটাই আমার নয়, তখন এর ব্যবহার্য বস্তুগুলি কি করে আমার হতে পারে? একে সৎ বলা যেতে পারে না। সৎ-এর প্রয়োগ কেবল একদিশাতে

করা হয়—সদ্ভাবে। আত্মাই পরমসত্য। সেখানে সত্যের প্রতি ভাব, তাঁকে জানার জন্য সাধুভাব এবং তাঁর প্রাপ্তির কর্ম প্রশস্ত ভাবে হতে থাকে, সেখানেই সৎ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর আরও বলছেন—

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭।।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে স্থিতিলাভ হয়, তাও সৎরূপে নির্দিষ্ট হয়। '**তদর্থীয়ং**'—ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাও সৎ নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্মই সৎ। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কর্মেরই পূরক। শেষে নির্ণয় করে বলছেন, এই সকলের জন্য শ্রদ্ধা প্রয়োজন।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ।।২৮।।

হে পার্থ! শ্রদ্ধাশূণ্য হয়ে যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং যা কিছু করা হয়, তা অসৎ। এই সকল যজ্ঞাদি ইহলোক এবং পরলোকে নিষ্ফল হয়। অতএব সমর্পণের সঙ্গে শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক।

নিষ্কর্ষ –

অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবন্! যারা শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করে এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যজ্ঞ করে (লোকে ভূত-ভবানী অন্যান্যের পূজা করতেই থাকে) তাদের শ্রদ্ধা কিরূপ? সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন! এই পুরুষ শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধার প্রতিমূর্তি। তার শ্রদ্ধা অবশ্যই কোথাও স্থির আছে। শ্রদ্ধা যেরূপ পুরুষ সেইরূপ হয়, বৃত্তির অনুরূপ পুরুষ হয়। তাদের সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার হয়। সাত্ত্বিক পুরুষগণ দেবতাগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ (যিনি যশ, শৌর্য্য প্রদান করবেন), রাক্ষসগণের (যিনি সুরক্ষা প্রদান করবেন) পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত, প্রেতাদির পূজা করেন। শাস্ত্র বিরুদ্ধে এইরূপ পূজা দ্বারা, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধালুগণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং হৃদয়-দেশে অবস্থিত

আমাকে (অন্তর্যামীকে) কৃশ করে, তাদের অসুর বলে জানবে অর্থাৎ ভূত, প্রেত, যক্ষ,রাক্ষস এবং দেবতাগণের পূজকগণ অসুর।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেবতা- প্রসঙ্গ তৃতীয়বার তুলেছেন। প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে- অর্জুন! কামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, সেই মূঢ়গণ অন্য দেবতাগণের পূজা করে। দ্বিতীয়বার নবম অধ্যায়ে সেই প্রশ্ন সম্বন্ধেই পুনরায় বললেন- যারা অন্য দেবগণের পূজা করে, তারা আমাকেই পূজা করে; কিন্তু তাদের সেই পূজা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব তা নষ্ট হয়। এখানে সপ্তদশ অধ্যায়ে বলেছেন, তারা আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমাত্মার পূজার বিধান দিয়েছেন।

এর পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চারটি প্রশ্ন তুলেছেন– আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান। আহার তিন প্রকারের হয়। সাত্ত্বিক পুরুষের আরোগ্য প্রদানকারী, মনোহর, স্নিগ্ধ আহার প্রিয় হয়। রাজসিক পুরুসের তিক্ত, অম্ল, অতি লবণাক্ত, উষ্ণ, মুখরোচক, মশলাযুক্ত রোগবর্দ্ধক আহার প্রিয় হয়। উচ্ছিষ্ট, বাসি ও অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্দিষ্ট যজ্ঞ (যা আরাধনার অন্তঃক্রিয়া) যা মনকে নিরুদ্ধ করে, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। ফলকামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলা হয়। শাস্ত্রবিধি বর্জিত, মন্ত্র, দান ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

পরমদেব পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করতে যিনি সক্ষম, সেই প্রাজ্ঞ সদ্‌গুরুর সেবা-অর্চনা এবং অন্তঃকরণ থেকে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এবং পবিত্রতার অনুরূপ দেহ গড়ে তোলাই শারীরিক তপস্যা। সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্যকে বাচিক তপস্যা বলে এবং মনকে কর্মে প্রবৃত্ত রাখা, ইষ্ট ব্যতীত বিষয়সমূহের চিন্তনে মনকে শান্ত রাখা–এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। মন, বাণী ও দেহ তিনটি এক করে তপস্যাতে নিযুক্ত করাই সাত্ত্বিক তপস্যা। রাজসিক তপস্যাতে কামনা করে সেই কর্মই অনুষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রবিধিরহিত স্বেচ্ছাচারযুক্ত আচরণকে তামসিক তপস্যা বলা হয়।

কর্তব্য মনে করে, দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করে শ্রদ্ধাপূর্বক যে দান করা হয় তা সাত্ত্বিক দান। ফললাভের উদ্দেশ্যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে দান করা হয় তা রাজসিক দান এবং তিরস্কার করে কুপাত্রে যে দান করা হয়, তা তামসিক দান।

ওঁ, তৎ, সৎ-এর স্বরূপ বলবার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই নাম পরমাত্মার স্মৃতি প্রদান করে। শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত তপস্যা, দান ও যজ্ঞ শুরু করার সময় ওঁ-এর প্রয়োগ হয়, ও সাধনা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই শান্ত হয়। তৎ-এর অর্থ পরমাত্মা, তাঁর প্রতি সমর্পণের ভাব থাকলেই সেই কর্ম অনুষ্ঠিত হয় যখন নিরন্তর কর্ম হতে থাকে, তখন সৎ-এর প্রয়োগ করা হয়। ভজনই সৎ। সত্যের প্রতি ভাব ও সাধুভাব-এর মধ্যেই সৎ-এর প্রয়োগ করা হয়। পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য কর্ম, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার পরিণামেও সৎ-এর প্রয়োগ করা হয় এবং যে কর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে সেই কর্ম নিশ্চয়ই সৎ; কিন্তু এতে শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক। শ্রদ্ধাশূণ্য হয়ে যে দান, যে কর্ম, যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তা ইহলোকে এবং পরলোকেও নিষ্ফল হয়। অতএব শ্রদ্ধা অপরিহার্য।

সম্পূর্ণ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং শেষে ওঁ, তৎ এবং সৎ-এর বিশদ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা হয়েছে, যার উল্লেখ প্রথমবার করা হয়েছে। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ‘ওঁ তৎসৎ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো’ নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।।১৭।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে ‘ওঁ তৎসৎ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ’ নামক সপ্তদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ ‘যথার্থগীতা’ ভাষ্যে ‘ওঁ তৎসৎশ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো’ নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।।১৭।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র ভাষ্য ‘যথার্থ গীতা’তে ‘ওঁ তৎসৎ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ’ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথাষ্টদশোহধ্যায়ঃ ।।

এটাই গীতাশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যাযের পূর্বার্দ্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অনেক প্রশ্নের সমাধান এবং উত্তরার্দ্ধ গীতাশাস্ত্রের উপসংহার, যাতে এই শাস্ত্রাধ্যয়ন থেকে কি লাভ হয় ? সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে আহার, তপস্যা, যজ্ঞ, দান এবং শ্রদ্ধাকে বিভাগ করে তাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সন্দর্ভে ত্যাগের স্বরূপ হল সেই আলোচ্য বিষয়বস্তু। মানুষ কি কারণে কর্ম করে ? কে কর্ম করান—ভগবান অথবা প্রকৃতি ? এই প্রশ্নগুলি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলির উপর বর্তমান অধ্যায়ে পুনরায় আলোকপাত করা হয়েছে। এইরূপ পূর্বে বর্ণব্যবস্থার চর্চাও করা হয়েছে। প্রস্তুত অধ্যায়ে বর্ণব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধেই বিশদ বিবরণ দেওযা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে এর স্বরূপ-এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষে গীতা থেকে কি কি বিভূতিলাভ হয় ?—তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে বহু প্রকরণের বিভাজন শুনে শেষে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব জানবার জন্য প্রস্তুত অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করলেন—

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন।।১।।

অর্জুন বললেন— হে মহাবাহো !, হে হৃদয়ের সর্বস্ব !, হে কেশিনিষূদন ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যথার্থ স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানতে চাই। পূর্ণ ত্যাগই সন্ন্যাস, যখন সঙ্কল্প ও সংস্কার উভয়েরই বিলুপ্তি ঘটে। এর পূর্বে সাধনার পূর্তির জন্য উত্তরোত্তর আসক্তির ত্যাগ করাই ত্যাগ। এখানে প্রশ্ন দুটি— সন্ন্যাস তত্ত্বকে এবং ত্যাগ তত্ত্বকে জানতে চাই। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২।।

অর্জুন! কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই পণ্ডিতগণের কেউ কেউ সন্ন্যাস বলেন এবং কিছু বিচারকুশল পুরুষগণ সম্পূর্ণ কর্মফলের ত্যাগকে ত্যাগ বলেন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩।।

কিছু বিদ্বানগণ এইরূপ বলেন যে, সকল কর্ম দোষযুক্ত অতএব ত্যাগ করা উচিত। অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কারও ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ বহু মত প্রস্তুত করার পর যোগেশ্বর নিজের নিশ্চিত মতটি দিলেন–

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।।৪।।

হে অর্জুন! সেই ত্যাগবিষয়ে আমার নিশ্চয় শোন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫।।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাজ্য যোগ্য নয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করা উচিত, কারণ এই তিনটি মানুষকে পবিত্র করে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে চারটি প্রচলিত মতের উল্লেখ করলেন। প্রথম–কাম্যকর্মের ত্যাগ, দ্বিতীয়–সম্পূর্ণ কর্মফলের ত্যাগ, তৃতীয়–দোষযুক্ত হওয়ার জন্য সকল কর্মের ত্যাগ ও চতুর্থ–যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। চারটির মধ্যে একটি মতে নিজের অভিমত দিলেন যে, অর্জুন! আমারও এই সুনিশ্চিত মত যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। এর থেকে প্রমাণিত হল যে, কৃষ্ণকালেও কয়েকটিই মত প্রচলিত ছিল, যেগুলির মধ্যে যথার্থটিও ছিল। সেই সময়েও নানা মত ছিল, আজও আছে। যখন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন মত-

মতান্তরের মধ্যে থেকে কল্যাণকর মতটিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাই করেছেন। তিনি কোন নতুন পথ দেখাননি, বরং প্রচলিত মতগুলির মধ্য থেকে সত্যকে সমর্থন করে তা স্পষ্ট করেছেন।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬।।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জোর দিয়ে বললেন—পার্থ! যজ্ঞ, দান ও তপস্যাররূপ কর্ম আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে অবশ্য কর্তব্য। এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। এখন অর্জুনের জিজ্ঞাসা অনুসারে তিনি ত্যাগের বিশ্লেষণ করলেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ।।৭।।

হে অর্জুন! নিয়ত কর্ম (শ্রীকৃষ্ণের মতে নিয়ত কর্ম একটাই, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। এই 'নিয়ত' শব্দটি যোগেশ্বর আট-দশবার উচ্চারণ করেছেন। এর উপর বার বার জোর দিয়েছেন, যাতে সাধক ভ্রান্ত হয়ে অন্য কোন কাজকে কর্ম মনে করে করতে শুরু না করে দেন), এই শাস্ত্রবিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্মের ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহগ্রস্ত হয়ে তার ত্যাগ করাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়েছে। সাংসারিক বিষয়বস্তুর আসক্তিতে জড়িয়ে কার্যম্ কর্ম (কার্যম্ কর্ম, নিয়ত কর্ম একে অন্যের পূরক)-এর ত্যাগ তামসিক ত্যাগ। এইরূপ পুরুষ **'অধঃ গচ্ছতি'** কীট-পতঙ্গপর্যন্ত অধম যোনিতে জন্ম নেয়; কারণ সে ভজনের প্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে। এখন রাজসিক ত্যাগের বিষয়ে বলছেন—

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮।।

কর্ম দুঃখকর মনে করে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করেন, তিনি এই রাজসিক ত্যাগ করেও ত্যাগের ফললাভ করতে পারেন না। যিনি ভজন সম্পূর্ণ করতে পারেন না ও **'কায়ক্লেশভয়াৎ'**— দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তির ত্যাগ রাজসিক, তিনি ত্যাগের ফল পরমশান্তি লাভ করতে পারেন না।

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯।।

হে অর্জুন ! 'করা কর্তব্য'- এইরূপ বিবেচনা করে যে '**নিয়তম্**'—শাস্ত্রবিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্ম, সঙ্গদোষ ও ফলকামনা ত্যাগ করে করা হয়, সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। অতএব নিয়ত কর্ম করুন এবং তা ভিন্ন সমস্তই ত্যাগ করুন। এই নিয়ত কর্ম কি সর্বদা করতে হবে অথবা কখনও এই কর্মও সম্পূর্ণ হবে ? এই প্রসঙ্গে বলছেন, (এখন ত্যাগের শেষ রূপ দেখুন)—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০।।

হে অর্জুন ! যিনি '**অকুশলং কর্ম**' অর্থাৎ অকল্যাণকর কর্মে (শাস্ত্র নিয়ত কর্মই কল্যাণকর। এর বিপরীত যা কিছু করা হয়, তা এই লোকের বন্ধন সেইজন্য অকল্যাণকর, এইরূপ কর্মে) দ্বেষ করেন না ও কল্যাণকর কর্মে আসক্ত হন না, যা কর্তব্য কর্ম ছিল তাও অসম্পূর্ণ নেই—এইরূপ সত্ত্বসংযুক্ত পুরুষ সংশয়মুক্ত, জ্ঞানী ও ত্যাগী হন। কারণ তিনি সর্বকর্মের ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির সঙ্গে পূর্ণ ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। এর থেকেও সরল পথ আছে কি ? তিনি বলেছেন—না। দেখুন—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১।।

দেহধারী পুরুষগণ (কেবল দেহটাই নয়, যেটা আপনার চোখে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে প্রকৃতিজাত সত্ত্ব-রজঃ-তম এই তিনটি গুণই জীবাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। যতক্ষণ গুণ সক্রিয়, ততক্ষণ দেহ ধারণ করতে হয়। দেহধারণের কারণ গুণত্রয় যতক্ষণ সক্রিয়, ততক্ষণ কোন না কোন রূপে দেহের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।) নিঃশেষরূপে সকলকর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, সেইজন্য যিনি কর্মফলের কামনাত্যাগ করেছেন, তিনিই ত্যাগী—এইরূপ বলা হয়। অতএব যতক্ষণ দেহ ধারণের কারণ বর্তমান, ততক্ষণ তিনি কর্মের অনুষ্ঠান করুন এবং ফলের কামনা ত্যাগ করুন। কিন্তু সকামী ব্যক্তিগণও কর্মের ফললাভ করে থাকেন।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্কচিৎ।।১২।।

ভাল, মন্দ ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার ফল সকামী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরেও লাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরপর্যন্ত ভোগ করে; কিন্তু 'সন্ন্যাসিনাম্'— সর্বস্বের ন্যাস (শেষ) করেছেন যে পূর্ণত্যাগী পুরুষগণ, তাঁরা কোন কর্মফল ভোগ করেন না। একেই বলে শুদ্ধ সন্ন্যাস। সন্ন্যাস হল চরমোৎকর্ষের অবস্থা। ভাল, মন্দ কর্মগুলির ফল এবং পূর্ণ ন্যাসকালে সেগুলির সমাপ্তির প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ হল। কি কারণে মানুষ শুভ অথবা অশুভ কর্ম করে? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্।।১৩।।

হে মহাবাহো! সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সর্বকর্ম সম্পাদনের পাঁচটি কারণ নিরূপিত হয়েছে। এইগুলি আমার কাছে অবগত হও।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪।।

এই বিষয়ে কর্তা (এই মন), পৃথক্ পৃথক্ করণ (যাদের সাহায্যে কর্ম করা হয়—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ত্যাগ, অনবরত চিন্তনের প্রবৃত্তিগুলি শুভকর্ম সম্পাদনের করণ হয় এবং কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ, লিপ্সা ইত্যাদি অশুভ কর্ম সম্পাদনের করণ হয়।), বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টা (অনন্ত ইচ্ছা), আধার (অর্থাৎ সাধন, যে ইচ্ছার সঙ্গে সাধন জোটে, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে শুরু করে) এবং পঞ্চম হেতু দৈব অথবা সংস্কার। এর-ই পুষ্টি করে-

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎকর্ম প্রারভতে নরঃ।

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫।।

শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা মানুষ শাস্ত্রের অনুসারে অথবা বিপরীত যে কর্ম করে, সেই সমস্ত কর্মের কারণ এই পাঁচটি। পরন্তু এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও—

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।।১৬।।

যিনি অশুদ্ধ বুদ্ধি হেতু সেই বিষয়ে কৈবল্য স্বরূপ আত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি যথার্থদর্শী নন অর্থাৎ ভগবান করেন না।

এই প্রশ্নের উপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জোর দিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন, প্রভু স্বয়ং করেন না, করান না এবং ক্রিয়ার সংযোগও করিয়ে দেন না। তবে লোকে বলে কেন? তাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, সেজন্য তারা যা ইচ্ছা তা ই বলতে পারেন। এখানেও বলছেন—সমস্ত কর্মের কারণ পাঁচটি। এর পরেও যাঁরা কৈবল্য স্বরূপ পরমাত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, সেই মূঢ়গণ যথার্থদর্শী নন অর্থাৎ ভগবান করেন না, পরন্তু ভগবান অর্জুনকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন, '**নিমিত্তমাত্রং ভব**' যে, হর্তা-কর্তা তো আমি, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। তাহলে তিনি বলতে চাইছেন কি?

বস্তুতঃ ভগবান ও প্রকৃতির মাঝে একটা আকর্ষণ রেখা আছে। যতক্ষণ সাধক প্রকৃতির সীমার মধ্যে থাকেন, ভগবান তাঁর জন্য কিছু করেন না। অতি কাছে থেকে ঈশ্বর কেবল দ্রষ্টা-রূপেই থাকেন। অনন্যভাবে ইষ্টের আশ্রিত হলে তিনি সাধকের হৃদয়-দেশ-এ সঞ্চালক হয়ে যান। তখনই সাধক প্রকৃতির আকর্ষণ সীমা পার করে ঈশ্বরীয় ক্ষেত্রে চলে যান। এইরূপ অনুরাগীকে সাহায্য কবরার জন্য ঈশ্বর সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। কেবল এইরূপ অনুরাগীর জন্যই ভগবান করেন। অতএব চিন্তন করুন। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। আরও দেখুন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭।।

'আমি কর্তা'—এই ভাব যাঁর নেই এবং যাঁর বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোকের সংহার করলেও সংহর্তা হন না বা আবদ্ধ হন না। লোক-সম্বন্ধী সংস্কারের বিলয়কেই লোক-সংহার বলা হয়। কিরূপে সেই নিয়ত কর্মের প্রেরণা লাভ হয়? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসঙ্গ্রহঃ।।১৮।।

অর্জুন! পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষগণ দ্বারা, '**জ্ঞানং**'- তাঁকে অবগত হবার বিধিদ্বারা এবং '**জ্ঞেয়ম্**'—জানবার যোগ্য বস্তু (শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলেছেন আমিই জ্ঞেয়, জানবার যোগ্য) দ্বারা কর্ম করার প্রেরণালাভ হয়। পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষের কাছে সেই জ্ঞান-সম্বন্ধে জানার বিধিলাভ হলে, জ্ঞেয়—লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি থাকলে তবেই কর্মের প্রেরণা পাওয়া যায় এবং কর্তা (মনের নিষ্ঠা), করণ (বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ইত্যাদি) এবং কর্মের স্বরূপ অবগত হলে কর্ম সঞ্চয় হয়। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, প্রাপ্তির পরে কর্ম করবার দরকার হয় না ও কর্মত্যাগ করলে কোন লোকসানও হয় না; তা সত্ত্বেও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ অনুগামীদের হৃদয়ে কল্যাণকর সাধনের সংগ্রহের জন্য তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। কর্তা, করণ এবং কর্মদ্বারা এগুলি সংগ্রহ হয়। জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকারের হয়—

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯।।

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণভেদে তিন প্রকার বলা হয়েছে, সেই সকল তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর। প্রথমে প্রস্তুত জ্ঞানের ভেদ—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।২০।।

অর্জুন! যে জ্ঞানদ্বারা মানুষ পৃথক্ পৃথক্ সকলভূতে এক অবিনাশী পরমাত্মভাবকে অবিভক্ত সমভাবে স্থিত দেখেন, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, এই অনুভূতির সঙ্গে-সঙ্গেই ত্রিগুণ শান্ত হয়ে যায়। এটাই জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা। এখন রাজসিক জ্ঞান দেখুন—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্পৃথগ্বিধান্।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১।।

যে জ্ঞানদ্বারা সর্বভূতে ভিন্নভিন্ন বহুভাবকে পৃথকভাবে জানা যায় যে, ইনি ভাল, ইনি মন্দ—সেই জ্ঞানকে তুমি রাজসিক বলে জানবে। এইরূপ স্থিতিতে যিনি আছেন, তাঁর জ্ঞান রাজসিক স্তরের। এখন দেখুন তামসিক জ্ঞান—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্কার্যে সক্তমহৈতুকম্।

অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

যে জ্ঞানদ্বারা কোন একটি দেহে সম্পূর্ণ আত্মা আছেন—এইরূপ অভিনিবেশ হয়, সেই অযৌক্তিক অর্থাৎ যার পিছনে কোন ক্রিয়া নেই, তত্ত্বের অর্থস্বরূপ পরমাত্মা থেকে পৃথক করে এবং তুচ্ছ, সেইজন্য সেই জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে। এখন প্রস্তুত কর্মের তিনটি ভেদ—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩।।

যে কর্ম '**নিয়তম্**'—শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত, সঙ্গদোষ ও ফলাভিলাষরহিত পুরুষদ্বারা রাগ ও দ্বেষবর্জনপূর্বক করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। নিয়ত কর্ম (আরাধনা) চিন্তনকে বলা হয়, যে চিন্তন পরম-এ স্থিতি প্রদান করে।)

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।।২৪।।

ফলকামনাযুক্ত ও অহংকারযুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় সেই সকল কর্মকে রাজসিক কর্ম বলা হয়। এই রাজস পুরুষও সেই নিয়ত কর্ম করেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, ফলকামনা করে ও অহঙ্কারযুক্ত সেইজন্য তার দ্বারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক কর্ম বলে। এখন দেখুন—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।।২৫।।

যে কর্ম শেষে নষ্ট হয়ে যায়, হিংসা-সামর্থ্যের বিচার না করে কেবল মোহবশ আরংভ করা হয়, তা তামসিক কর্ম বলে উক্ত হয়। স্পষ্ট হল যে, এই কর্ম শাস্ত্রের

নিয়ত কর্ম নয়। শাস্ত্রের জায়গাতে ভ্রান্ত ধারণাকে আশ্রয় করা হয়েছে। এখন দেখুন কর্তার লক্ষণ—

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬।।

যিনি সঙ্গদোষমুক্ত, অহংবাদী নন, ধৃতিশীল ও উদ্যমযুক্ত, ক্রিয়মাণ কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন এবং অসিদ্ধিতে বিষাদশূণ্য, বিকারগুলি থেকে মুক্ত হয়ে কর্মে (অহর্নিশ) প্রবৃত্ত, সেই কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়। এগুলি উত্তম সাধকের লক্ষণ। কর্ম সেই একটাই—নিয়ত কর্ম।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।।২৭।।

আসক্তিযুক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোলুপ, পরপীড়ক, অপবিত্র এবং হর্ষ-শোকে যিনি লিপ্ত, সেই কর্তাকে রাজসিক কর্তা বলা হয়।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোহনৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।।২৮।।

চঞ্চল চিত্ত, অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনম্র, বঞ্চক, পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, সদা অবসন্ন স্বভাব ও দীর্ঘসূত্রী সেই কর্তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়। যারা দীর্ঘসূত্রী তারা কর্মকে 'কাল করা যাবে' বলে অসম্পূর্ণ রাখে, যদিও তার অন্তরে কর্ম করার ইচ্ছা থাকে। এইরূপ কর্তার লক্ষণ সম্পূর্ণ হল। এখন যোগেশ্বর এক নতুন প্রশ্ন সম্বন্ধে বলছেন বুদ্ধি, ধারণা ও সুখের লক্ষণ—

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯।।

ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনপ্রকার ভেদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলছি, শ্রবণ কর।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০।।

পার্থ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষ—এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। অর্থাৎ পরমাত্ম-পথ, গমনাগমন পথ উভয়েরই উত্তমপ্রকার জ্ঞানকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যথা—

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ।

অযথাবৎপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১।।

পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এবং কর্ত্য ও অকর্তব্য যথাযথরূপে জানতে পারা যায় না, তা রাজসিক বুদ্ধি। এখন তামসিক বুদ্ধির স্বরূপ দেখুন—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।

সর্বার্থান্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২।।

পার্থ! যে বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয় বিপরীতভাবে বোঝে, তা তামসিক বুদ্ধি।

এখানে শ্লোকসংখ্যা ত্রিশ থেকে বত্রিশপর্যন্ত বুদ্ধির তিনটি ভেদ বলা হয়েছে। প্রথমে বুদ্ধি কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে এবং কোন কাজে প্রবৃত্ত হবে, কর্তব্য কি ও অকর্তব্য কি— যে বুদ্ধি উত্তমরূপে এইগুলি সম্বন্ধে অবগত, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী। যে বুদ্ধি কর্তব্য-অকর্তব্যকে অস্পষ্টভাবে জানে, যথার্থ জানে না, সেই বুদ্ধি রাজসিক এবং অধর্মকে ধর্ম, নশ্বরকে শাশ্বত এবং হিতে অহিত-এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি। এইভাবে বুদ্ধির ভেদ সম্পূর্ণ হল। এখন প্রস্তুত অন্য প্রশ্ন 'ধৃতি'—ধারণার তিন ভেদ—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩।।

'**যোগেন**'—যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারা '**অব্যভিচারিণী**'—যোগ-চিন্তন ব্যতীত অন্য কোন চিন্তন ব্যভিচার, চিত্ত বিচলিত হওয়া ব্যভিচার, অতএব এইরূপ অব্যভিচারিণী ধৃতিদ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ শাস্ত্রমার্গে বিধৃত হয়, এই প্রকার ধৃতিই সাত্ত্বিকী। অর্থাৎ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ইষ্টোন্মুখ করা সাত্ত্বিকী ধারণা। এবং—

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪।।

হে পার্থ! ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে যে ধৃতিদ্বারা কেবল ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করে থাকে (মোক্ষ নয়) তা রাজসিক ধৃতি। এই ধৃতিতেও লক্ষ্য সেই একই, এতে কেবল কামনা করা হয়। যা কিছু কার্য করে, তার পরিবর্তে ফল পেতে চায়। এখন তামসিক ধৃতির লক্ষণ দেখুন—

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫।।

হে পার্থ! দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতিদ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ ও অভিমান পরিত্যাগ করে না, তাদের ধারণ করে থাকে, তা তামসিক ধৃতি। এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। পরের প্রশ্নটি সুখ—

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।।৩৬।।

অর্জুন! এখন আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। তাদের মধ্যে যে সুখে সাধক অভ্যাসবশতঃ রমণ করে অর্থাৎ চিত্ত সংযম করে ইষ্টে রমণ করে এবং যা দুঃখ থেকে মুক্ত করে। এবং—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।৩৭।।

উপর্যুক্ত সুখ সাধনের আরম্ভকালে যদিও বিষতুল্য। (প্রহ্লাদকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, মীরাকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। কবীর বলেছেন—'**সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ে অওর সোয়ে। দুখিয়া দাস কবীর হ্যায়, জাগে অউর রোয়ে।**' অতএব আরম্ভে বিষতুল্য।) কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, অমৃততত্ত্ব প্রদান করে। অতএব আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। এবং—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮।।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তা ভোগকালে যদিও অমৃততুল্য কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য; কারণ এই সুখ জন্ম-মৃত্যুর কারণ, সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয়। এবং–

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।

নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্।।৩৯।।

যে সুখ ভোগকালে ও পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে, নিদ্রা **'যা নিশা সর্বভূতানাং'**- জগৎরূপ নিশাতে অচৈতন্য করে রাখে, আলস্য ও ব্যর্থ চেষ্টা থেকে উৎপন্ন সেই সুখকে তামসিক সুখ বলা হয়। এখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণ সম্বন্ধে বলছেন, সকলের সঙ্গেই যেগুলির সম্পর্ক আছে–

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ।।৪০।।

অর্জুন! পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নেই, যে এই প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গপর্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, জন্ম-মৃত্যুশীল, ত্রিগুণের অন্তর্ভুত অর্থাৎ দেবতাও ত্রিগুণের বিকারকেই বলে; দেবতাও নশ্বর।

এখানে বাহ্য দেবতাগণের যোগেশ্বর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন। প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে তারপর নবম, সপ্তদশ এবং এখানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে। এরগুলির অর্থ এই থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে দেবগণও ত্রিগুণের অন্তর্ভুত। যাঁরা এদের পূজা করেন, তাঁরা নশ্বরকে পূজা করেন।

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে মহর্ষি শুক এবং পরীক্ষিত প্রসিদ্ধ আখ্যান আছে। এখানে তাঁরা পরীক্ষিতকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পর প্রেমের সম্পর্কের জন্য শঙ্কর-পার্বতীর, আরোগ্য লাভের জন্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের, জয়লাভের জন্য ইন্দ্রের এবং ধনলাভের জন্য কুবেরের পূজা করুন। এইরূপ বিবিধ কামনার উল্লেখ করে অবশেষে নির্ণয় করলেন যে, সমস্ত কামনা পূরণের জন্য এবং মোক্ষ লাভের জন্য একমাত্র নারায়ণের পূজা করা উচিত। **'তুলসী মূলহিঁ সীঁচিয়ে,**

ফুলই ফলই অঘাই।' অতএব সর্বব্যাপক প্রভুর স্মরণ করুন, যাঁকে লাভ করবার জন্য সদ্‌গুরুর শরণ, নিষ্কপটভাবে প্রশ্ন ও সেবা একমাত্র উপায়।

আসুরী ও দৈবী সম্পদ্ অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তিকে বলে। দৈবী সম্পদ্ পরমদেব পরমাত্মার দিগ্‌দর্শন করিয়ে দেয়, সেইজন্য একে দৈবী বলা হয়; কিন্তু এই প্রবৃত্তিও ত্রিগুণেরই অন্তর্ভুত। গুণাতীত হলে দৈবী সম্পদ্‌ও শান্ত হয়ে যায়। গুণাতীত, আত্মতৃপ্ত যোগীর জন্য কোন কর্তব্য বাকী থাকে না।

এখন প্রস্তুত বর্ণ-ব্যবস্থা। বর্ণ জন্ম-প্রধান অথবা কর্মদ্বারা অন্তঃকরণে যা যোগ্যতা অর্জন হয় তার নাম? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১।।

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মসমূহ স্বভাবজাত ত্রিগুণানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভক্ত হয়েছে। স্বভাব সাত্ত্বিক হলে, আপনার মধ্যে নির্মলতা, ধ্যান-সমাধির ক্ষমতা থাকবে। তামসিক গুণ কাজ করলে আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ স্বভাবে দেখা যাবে। সেই স্তর অনুসারেই আপনার দ্বারা কর্মও হবে। যে গুণ কার্যরত, সেটাই আপনার বর্ণ, স্বরূপ। এইরূপ অর্দ্ধসাত্ত্বিক এবং অর্দ্ধরাজসিক গুণ ক্ষত্রিয় বর্গের মধ্যে দেখা যায় এবং অর্দ্ধেকের কম তামসিক ও বিশেষ রাজসিক গুণ দ্বিতীয় বর্গের বৈশ্য মধ্যে দেখা যায়।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থবার উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারটি বর্গের মধ্যে থেকে এ বর্গ ক্ষত্রিয়ের নাম উল্লেখ করেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ থেকে শ্রেয়স্কর আর কোন পথ নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, যারা দুর্বল গুণযুক্ত, তারা স্বভাব থেকে উৎপন্ন যোগ্যতা অনুসারে ধর্মে প্রবৃত্ত হবে, স্বধর্মে মৃত্যুও পরমকল্যাণকর. অন্যের অনুকরণ ভয়াবহ। চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন— চার বর্ণের রচনা আমি করেছি। তাহলে কি মানুষের চারটি জাতিতে বিভাগ করেছেন? বলছেন—না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**'—গুণের যোগ্যতা অনুসারে কর্মকে চারটি স্তরে বিভাগ করেছেন। এখানে গুণ মানদণ্ড, এর দ্বারা কর্ম করার ক্ষমতাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে একমাত্র অব্যক্ত পুরুষকে লাভ করবার

ক্রিয়া-বিশেষকে কর্ম বলে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আচরণ আরাধনা, যা শুরু হয় একমাত্র ইষ্টে শ্রদ্ধা থেকে। চিন্তনের বিধি-বিশেষ থেকে যা পূর্বে বলেছেন। এই যজ্ঞার্থ কর্মকে চার ভাগে বিভাগ করেছেন। এখন কিরূপে বোঝা যাবে যে আপনার মধ্যে কোন গুণ কার্যরত ও আপনি কোন শ্রেণীর? এই প্রসঙ্গে এখানে বলেছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।৪২।।

মনের শমন ও ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, পূর্ণ পবিত্রতা; কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, ক্ষমা, সরলতা, আস্তিক বুদ্ধি অর্থাৎ একমাত্র ইষ্টে আস্থা, জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানের সঞ্চার, বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের জাগৃতি এবং সেই অনুসারে চলবার ক্ষমতা—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। যখন স্বভাবে এই যোগ্যতাগুলি দেখা দেয়, নিরন্তর কর্ম হয় ও পরে কর্ম করা স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, তখন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর যোগ্যতা অর্জন হয়েছে বলা যেতে পারে। এবং—

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীস্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।৪৩।।

পরাক্রম, ঈশ্বরীয় তেজলাভ, ধৈর্য, চিন্তনে দক্ষতা অর্থাৎ '**কর্মসু কৌশলম্**'—কর্মকুশলতা, প্রকৃতির সংঘর্ষ থেকে পশ্চাৎপদ না হওয়ার স্বভাব, দান অর্থাৎ সর্বস্ব সমর্পণ, সকলভাবের উপর 'আমিই কর্তা'—এইভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের '**স্বভাবজম্**'—স্বভাবজাত কর্ম। যাঁদের মধ্যে এই যোগ্যতাগুলি পাওয়া যায়, তাঁরা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্তা। এখন প্রস্তুত বৈশ্য ও শূদ্রের স্বরূপ—

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪।।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। গোপালনই কেন? তবে কি মহিস রক্ষা করবে না? ছাগল পুসবে না? এর তাৎপর্য হল ইন্দ্রিয়সমূহের রক্ষা। সুদূর বৈদিক বাঙ্ময়ে 'গো' শব্দ অন্ত:করণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের জন্য প্রচলিত ছিল। গোরক্ষার অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহের রক্ষা। বিবেক-বৈরাগ্য-শম-দমদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সুরক্ষিত

হয়, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়, দুর্বল হয়। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। এটাই নিজধন, যা একবার অর্জন করতে সক্ষম হলে সর্বদা সঙ্গে থাকে। প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে এই সম্পত্তিগুলি সংগ্রহ করাই বাণিজ্য (‘**বিদ্যা ধনং সর্বধন প্রধানম্**’—এই বিদ্যা অর্জন করাই বাণিজ্য।) কৃষি কাকে বলে? দেহটাই ক্ষেত্র। এর অন্তরালে যে বীজ বপন করা হয়, তা ভাল-মন্দ সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মে বীজ অর্থাৎ আরম্ভের নাশ হয় না। (তার মধ্যে থেকে কর্মের এই তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম অর্থাৎ ইষ্ট-চিন্তনই নিয়ত কর্ম) পরমতত্ত্ব চিন্তনের যে বীজ এই ক্ষেত্রে পড়ে আছে, তাকে সুরক্ষিত করে যাওয়া ও এতে যে বিজাতীয় বিকারগুলির আক্রমণ হয়, সেগুলির নিরাকরণ করে যাওয়াই কৃষি।

কৃষি নিরাবহিঁ চতুর কিসানা।
জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা।। (মানস, ৪/১৪/৮)

যাঁরা চতুর কৃষক, তাঁরা ভাল ফসললাভের জন্য আগাচ্ছাগুলি উন্মুলন করেন, ফলে ফসল ভাল তৈরী হয়, সেইরূপ বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণই মোহ, মদ এবং মান পরিত্যাগ করেন।

এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ের সুরক্ষা এবং প্রকৃতির দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে থেকে আত্মিক সম্পত্তি সংগ্রহ করা এবং এই ক্ষেত্রে পরমতত্ত্বের চিন্তনের বর্দ্ধন এইগুলি বৈশ্য শ্রেণীর কর্ম।

শ্রীকৃষ্ণে অনুসারে ‘**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ**’- যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে আমরা যজ্ঞ থেকে পরাৎপর ব্রহ্মকে লাভ করি। সেই ব্রহ্মের আস্বাদন করে সন্তপুরুষগণ সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। চিন্তন-ক্রিয়া দ্বারা তারই শনৈঃ শনৈঃ বীজারোপণ হয়। এর সুরক্ষা করে যাওয়াই কৃষিকার্য। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে অন্ন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাই একমাত্র অশন, অন্ন। চিন্তন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে এই আত্মা পূর্ণ তৃপ্ত হয় আর কখনও অতৃপ্ত হয় না, আর আসা-যাওয়া করতে হয় না। এই অন্নের বীজকে অঙ্কুরিত করা এবং তার সুরক্ষা করে চলাকে কৃষিকার্য বলা হয়েছে।

নিজের থেকে উন্নত অবস্থাযুক্ত ব্যক্তিগণের, ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুজনের সেবা করা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম। শূদ্রের অর্থ হীন নয় বরং অল্পজ্ঞ। নিম্ন শ্রেণীর সাধকই শূদ্র। প্রবেশিকা শ্রেণীর সেই সাধক পরিচর্যা থেকেই সাধনা আরম্ভ করবে। ধীরে

ধীরে সেবাদ্বারা তার হৃদয়ে সেই সংস্কারগুলির সৃজন হবে এবং ক্রমশঃ সে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পৌঁছে অবশেষে বর্ণগুলি পার করে ব্রহ্মে লীন হয় যাবে। স্বভাব পরিবর্তী হয় এবং স্বভাব পরিবর্তন হলে বর্ণ-পরিবর্তন হয়। বস্তুতঃ এই বর্ণের অবস্থা চারটি অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট, কর্মপথের পথিকদের উঁচু-নীচু চারটি স্তর। কর্ম একটাই, নিয়ত কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, পরমসিদ্ধিলাভ করার এটাই একমাত্র পথ, সেইজন্য স্বভাবে যেরূপ যোগ্যতা আছে, সেটাই সম্বল করে সেই স্থান থেকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। এখন দেখুন—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫।।

মানুষ নিজ নিজ স্বভাবের যোগ্যতা অনুসারে কর্মে রত হয়ে '**সংসিদ্ধিম্**'-ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধিলাভ করে। পূর্বেও বলেছেন—এই কর্ম সম্পূর্ণ করে তুমি পরমসিদ্ধিলাভ করবে। কোন্ কর্ম করে ? অর্জুন ! তুমি শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম কর। এখন স্বকর্ম করার ক্ষমতা অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত মানুষ কিরূপে পরমসিদ্ধিলাভ করেন, সেই বিধি তুমি আমার কাছে শ্রবণ কর। লক্ষ্য করুন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।

যে পরমেশ্বর থেকে ভূতগণের উৎপত্তি, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমেশ্বরকে '**স্বকর্মণা**'—মানুষ স্বভাবজাত কর্মদ্বারা অর্চনা করে পরমসিদ্ধি লাভ করে। অতএব পরমাত্মার চিন্তন ও পরমাত্মারই সর্বাঙ্গীণ অর্চনা ও ক্রমশঃ চিন্তনপথে চলা আবশ্যক। যেমন কোন নিম্নশ্রেণীর ছাত্র যদি উচ্চ শ্রেণীতে পড়তে যায়, তাহলে সে তার নিজের শ্রেণীর যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে, উচ্চ শ্রেণীর যোগ্যতা তো লাভ হবেই না। অতএব এই কর্মপথে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন ১৮/৬ দ্রষ্টব্য। এর উপরই জোর দিয়ে পুনরায় বলছেন যে, যদি আপনি অল্পজ্ঞ, তবু সেই স্তর থেকেই শুরু করুন। সেই বিধি হল—পরমাত্মার প্রতি সমর্পণ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭।।

স্বীয় ধর্ম অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। **'স্বভাব নিয়তং'**-স্বভাবদ্বারা নির্ধারিত কর্ম করে মানুষকে পাপ অর্থাৎ আসা-যাওয়া করতে হয় না। প্রায়ই সাধকগণ উদ্বিগ্ন হন, চিন্তা করেন—আমি কি সেবা করতেই থাকব, তিনি তো ধ্যানস্থ, গুণের জন্য তাঁকে সম্মান করা হয়, এই চিন্তা করে তাঁরাও অনুকরণ করতে শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে অনুকরণ অথবা ঈর্ষা করলে কিছু লাভ হবে না। স্বভাবের ক্ষমতা অনুসারে কর্ম করেই সাধক পরমসিদ্ধি লাভ করেন, ত্যাগ করে নয়।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।৪৮।।

কৌন্তেয় ! দোষযুক্ত (অল্পজ্ঞ অবস্থাযুক্ত হলে দোষের বাহুল্য হওয়া স্বাভাবিক, এইরূপ দোষযুক্তও) **'সহজং কর্ম'**—স্বভাবজাত সহজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় কারণ ধুমদ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই দোষযুক্ত। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হলেও, কর্ম তো করতেই হচ্ছে। যতক্ষণ স্থিতিলাভ হয়, ততক্ষণ দোষ বিদ্যমান, প্রকৃতির আবরণ বিদ্যমান। যেখানে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্মও ব্রহ্মে প্রবেশের সঙ্গে বিলয় হয়, তখনই দোষমুক্ত হওয়া যায়। প্রাপ্তিযুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি, যখন কর্ম করার প্রয়োজন থাকে না ?-

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯।।

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, স্পৃহাশূণ্য, সংযতচিত্ত পুরুষ **'সন্ন্যাসিনাম্'**—সর্বস্ব ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে সন্ন্যাস ও পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি একই পর্যায়ভুক্ত। সাংখ্য যোগীও সেই অবস্থালাভ করেন, যে অবস্থা নিষ্কাম কর্মযোগী লাভ করেন। উভয় মার্গীই সমান উপলব্ধি করেন। এখন পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যে ভাবে ব্রহ্মলাভ করেন, সংক্ষেপে তার বর্ণনা করেছেন—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০।।

কৌন্তেয়! এইরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পরমনিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞাননিষ্ঠার উক্ত প্রাপ্তিক্রম সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ কর। পরের শ্লোকে সেই বিধি সম্বন্ধে বলছেন, লক্ষ্য করুন–

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১।।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাসী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২।।

অর্জুন! বিশেষরূপে শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হয়ে নির্জন ও পবিত্র স্থানে অবস্থান, পরিমিত আহার করেন, বাক্য, শরীর ও মন সংযত করে, দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করে, নিরন্তর ধ্যাননিষ্ঠ ও যোগপরায়ণ হয়ে, অন্তঃকরণবশীভূত করে, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগপূর্বক, আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন করে এবং–

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩।।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, বাহ্য বস্তু ও আন্তরিক চিন্তন পরিত্যাগ করে, মমতাবর্জিত এবং চিত্তবিক্ষেপশূণ্য পুরুষ পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন। আরও দেখুন–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪।।

এইরূপ ব্রহ্মে একীভূত হয়ে সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোন বিষয়ে শোক করেন না এবং কিছুই আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্বভূতে সমভাব সেই পুরুষ ভক্তির পরাকাষ্ঠায় স্থিত হন। ভক্তি এখানে পরিণামস্বরূপ ব্রহ্মেস্থিতি প্রদান করে। এখন–

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।৫৫।।

সেই পরাভক্তিদ্বারা তিনি আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন। সেই তত্ত্ব কি? আমি 'যে'ও যেরূপ প্রভাবযুক্ত, অজর-অমর-শাশ্বত যে অলৌকিক গুণধর্মযুক্ত, আমার

এই তত্ত্ব অবগত হয়ে তিনি আমাতে প্রবেশ করেন। প্রাপ্তিকালে ভগবানের দর্শন করেন ও প্রাপ্তির ঠিক পরেই তিনি আত্মস্বরূপকে সেই ঈশ্বরীয় গুণধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত দেখেন যে, আত্মাই অজর, অমর, শাশ্বত, অব্যক্ত ও সনাতন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—আত্মাই সত্য, সনাতন, অব্যক্ত ও অমৃতস্বরূপ; কিন্তু এই সমস্ত বিভূতিযুক্ত আত্মাকে কেবল তত্ত্ব দর্শীগণই দেখেছেন। এখন প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, বস্তুতঃ সেই তত্ত্বদর্শিতা কি? বহু লোক পাঁচ তত্ত্ব, পঁচিশ তত্ত্বের বৌদ্ধিক গণনা শুরু করেন; কিন্তু এই বিষয়ের উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত অধ্যায়ে নির্ণয় করে বললেন যে, সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মা. যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। এখন যদি আপনি সেই তত্ত্বলাভের ইচ্ছুক, পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভের ইচ্ছুক তাহলে ভজন-চিন্তন আবশ্যক।

এখানে শ্লোক উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করলেন যে সন্ন্যাস মার্গেও কর্ম করতে হয়। তিনি বললেন, '**সন্ন্যাসেন**'- সন্ন্যাসদ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা) কর্ম করতে করতে ইচ্ছাশূণ্য, আসক্তিশূণ্য এবং সংযত চিত্ত পুরুষ যেভাবে নৈষ্কর্ম্যের পরমসিদ্ধিলাভ করেন, তা সংক্ষেপে বলব। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম-ক্রোধ, মদ-মোহ ইত্যাদি যে বিকারগুলি প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করে, সেগুলি যখন শান্ত হয় এবং বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দম, নির্জনে বাস, ধ্যান ইত্যাদি ব্রহ্মে প্রবেশ করতে সাহায্য করে যে যোগ্যতাগুলি, সে সমস্ত যখন পরিপক্ক হয়, তখন ব্রহ্মকে জানার যোগ্যতা লাভ হয়। সেই যোগ্যতার নাম পরাভক্তি, এই যোগ্যতার দ্বারাই তত্ত্বকে জানা যায়। তত্ত্ব কি? আমাকে জানা। ভগবান যে যে বিভূতিযুক্ত, যিনি ভগবানকে তাঁর বিভূতিসহ জানেন, তিনি আমাতে স্থিত হন। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বর, পরমাত্মা ও আত্মা একে অন্যের পর্যায়। একটিকে জানতে পারলে বাকি সব জানা যায়। এই হল পরমসিদ্ধি, পরমগতি ও পরমধাম।

অতএব গীতাশাস্ত্রে দৃঢ় নির্ণয় এই যে, সন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগ দুটি পরিস্থিতিতেই পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করার জন্য নিয়ত কর্ম (চিন্তন) অনিবার্য।

এ পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর জন্য ভজন-চিন্তন করবার উপর জোর দিয়েছেন, এখন সমর্পণ বলে সেই বার্তাকে নিষ্কাম কর্মযোগীর জন্যও বলছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শ্বাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।৫৬।।

আমার উপর সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত পুরুষ সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও, লেশমাত্রও ত্রুটি না রেখে কর্ম করে আমার অনুগ্রহে শাশ্বত, অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। কর্ম সেই এক নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। পূর্ণরূপে যোগেশ্বর সদ্গুরুর আশ্রিত সাধক তাঁর অনুগ্রহে শাশ্বত পরমপদ শীঘ্র লাভ করেন। অতএব তাঁকে লাভ করার জন্য সমর্পণ আবশ্যক।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭।।

অতএব অর্জুন ! সমস্ত কর্ম (যতটা তোমার দ্বারা সম্ভব) আমাতে সমর্পণপূর্বক, নিজের ভরসায় নয় বরং আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হবে অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক সর্বদা আমাতে চিত্ত সমাহিত কর। যোগ একটাই, যা সর্বপ্রকারের দুঃখের বিনাশ করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতে প্রবেশ প্রদান করে। এর ক্রিয়া একটাই—যজ্ঞের প্রক্রিয়া, যা মন ও সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং ধ্যান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। যার পরিণামও এক-'**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**।' এই প্রসঙ্গেই আরও বলেছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮।।

আমাতে চিত্ত অর্পণ করলে আমার অনুগ্রহে তুমি মন ও সকল ইন্দ্রিয়ের দুর্গগুলিকে অতিক্রম করবে। "**ইন্দ্রিহ্ন দ্বার ঝরোখা নানা। তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা।। আবত দেখহি বিষয় বয়ারী। তে হঠি দেহিঁ কপাট উঘারী।।**" এইগুলিই দুর্জয় দুর্গ। আমার অনুগ্রহে তুমি এই বাধা সকল অতিক্রম করবে কিন্তু যদি তুমি অভিমানবশতঃ আমার কথা না শোন, তাহলে তোমার বিনাশ হবে, পরমার্থের অযোগ্য হবে। পুনরায় এই প্রসঙ্গের উপর জোর দিলেন—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯।।

অহঙ্কারকে আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না' এইরূপ যা চিন্তন করছ, তোমার এই নিশ্চয় ভ্রমমূলক। কারণ, তোমার ক্ষাত্র স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎকরিষ্যস্যবশোহপি তৎ।।৬০।।

কৌন্তেয়! অজ্ঞানবশতঃ তুমি যে কর্ম করতে চাইছ না, স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা করবে। প্রকৃতির সংঘর্ষ থেকে পশ্চাৎপদ না হওয়ার তোমার ক্ষত্রিয়শ্রেণীর স্বভাব তোমাকে বলপূর্বক কর্মে নিযুক্ত করবে। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। এখন প্রশ্ন, সেই ঈশ্বর কোথায় বাস করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া।।৬১।।

অর্জুন! ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও লোকে জানতে পারে না, কেন? মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকলেই ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করছে, সেইজন্য জানতে পারে না। এই যন্ত্র বাধাস্বরূপ, যা বার বার নশ্বর কলেবরে ভ্রমণ করাতে থাকে। তাহলে কার শরণে যাওয়া উচিত?—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২।।

সেইজন্য হে ভারত! সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের (যিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত) শরণাগত হও। তাঁর অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি, শাশ্বত পরমধাম প্রাপ্ত হবে। অতএব যদি ধ্যান করতে চান, তাহলে হৃদয়-দেশ-এ করুন। এই সম্বন্ধে জানার পর মন্দির, মসজিদ, চার্চ অথবা অন্যত্র সন্ধান করা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে জানা না থাকলে, এটা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের নিবাস-স্থান হৃদয়। ভাগবতের চতুঃশ্লোকী গীতার সারাংশও এই যে, যদিও আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত; কিন্তু হৃদয়-দেশ ধ্যান করলেই আমাকে লাভ করা যেতে পারে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩।।

এই প্রকার আমি তোমার কাছে গুহ্য থেকেও গুহ্যতর জ্ঞান বললাম। তুমি এটি সম্পূর্ণরূপে বিচার করে; যা ইচ্ছে হয় তা-ই অনুষ্ঠান কর। সত্য অনুসন্ধানের স্থান ও প্রাপ্তি স্থানও এটাই। কিন্তু হৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে দেখা যায় না, এর উপায় বলছেন–

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪।।

অর্জুন! সর্বাপেক্ষা গুহ্য আমার রহস্যযুক্ত বাক্য তুমি পুনরায় শ্রবণ কর (পূর্বে বলেছেন, কিন্তু পুনরায় শ্রবণ কর। সাধকের জন্য ইষ্ট সদা প্রস্তুত থাকেন) কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতকর বাক্য আমি পুনরায় বলছি। তা কি?–

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।৬৫।।

অর্জুন! তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমার অনন্য ভক্ত হও, আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও (সমর্পণে অশ্রুপাত যেন হয়) এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে বলেছেন–ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁর শরণাগত হও। এখানে বলছেন–আমার শরণে এস। এই গুহ্যতর রহস্যযুক্ত বাক্য শোন, আমার শরণে এস। বাস্তবে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন? এই যে সাধকের জন্য সদ্গুরুর শরণ নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণযোগেশ্বর ছিলেন। এখন সমর্পনের বিধি সম্বন্ধে বলেছেন–

সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।

সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক (অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্তা অথবা শূদ্র শ্রেণীর, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য শ্রেণীর–এই বিচার পরিত্যাগ করে) কেবল একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি সকল পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব। শোক করো না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণগুলির বিচার না করে (এই যে, আমি এই কর্মপথে কোন শ্রেণীর) যিনি একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাগত হন, ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কারও কাছ থেকে কৃপা পেতে চান না, তাঁর ক্রমশঃ বর্ণ-পরিবর্তন, উত্থান ও সমস্ত পাপ থেকে নিবৃত্তির (মোক্ষ) দায়িত্ব ইষ্ট সদ্‌গুরু স্বয়ং নিজের হাতে তুলে নেন।

প্রত্যেক মহাপুরুষ এই কথাই বলেছেন। শাস্ত্র যখন লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন মনে হয় যে সেটা সকলের জন্য; কিন্তু সেটা শুধু শ্রদ্ধাবান্‌দের জন্যই। অর্জুন অধিকারী ছিলেন, তা-ই তাঁকে জোর দিয়ে বললেন। এখন যোগেশ্বর স্বয়ং নির্ণয় করে বলছেন যে, এর অধিকারী কে?–

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।৬৭।।

অর্জুন! এইরূপ হিতের জন্য তোমাকে উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র তপস্যাহীন ব্যক্তি বলবে না, ভক্তিরহিত ব্যক্তিকে কখনও বলবে না, যে শ্রবণেচ্ছু নয় তাকে বলবে না ও আমাকে নিন্দা করে যারা–এই দোষ আমাতে, ঐ দোষ আমাতে এই প্রকার মিথ্যা সমালোচনা করে যারা, তাদেরও বলবে না। মহাপুরুষ তো ছিলেন, যার সমক্ষে স্তুতিকর্তাদের সাথে সাথে কতিপয় নিন্দুকও হয়ত ছিল। নিন্দুকদের বলবে না। কিন্তু প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, কাকে বলা উচিত? এই প্রসঙ্গে দেখুন–

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮।।

যিনি আমার পরাভক্তিলাভ করে এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্রের উপদেশ আমার ভক্তের কাছে পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করবেন। কারণ যিনি উপদেশ উত্তমরূপে শ্রবণ করে হৃদয়ঙ্গম করে নেবেন, তিনি সেই পথে চলবেন ও উদ্ধার হয়ে যাবেন। এখন সেই উপদেশকর্তার সম্বন্ধে বলছেন–

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯।।

মনুষ্যগণের মধ্যে উপদেশকর্তার অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় এ জগতে আর কেউ নেই এবং আর কেউ হবেও না। কার থেকে? যিনি আমার ভক্তগণের

মধ্যে আমার উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন, সেই পথে তাদের চালাবেন; কারণ কল্যাণের স্রোত এই একটাই, রাজমার্গ। এখন দেখুন অধ্যয়ন–

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০।।

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের ধর্মময় সংবাদরূপ গ্রন্থ 'অধ্যেষ্যতে'–মনন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব অর্থাৎ এইরূপ যজ্ঞ যার পরিণাম হল জ্ঞান, যার স্বরূপ পূর্বে বলা হয়েছে, যার তাৎপর্য–সাক্ষাৎ করে তাঁকে অবগত হওয়া, এই আমার অভিমত।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকর্মণাম্।।৭১।।

যিনি শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূণ্য হয়ে অর্থবোধ না হলেও এই গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তমকর্মকারিগণের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ লোকলাভ করেন। অর্থাৎ কর্মে সক্ষম না হলে কেবল শ্রবণ করুন, তবুও উত্তম লোকলাভ হবে; কারণ এতে উপদেশ গ্রহণ হয়। এখানে সাতসট্টি থেকে একাত্তরপর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ অনাধিকারীদের বলতে বারণ করেছেন; কিন্তু যিনি শ্রদ্ধাবান, তাঁকে অবশ্য বলা উচিত। যিনি শ্রবণ করবেন, তিনি আমাকে লাভ করবেন; কারণ অতি গোপনীয় কথা শুনে মানুষ সেই অনুসারে আচরণ করতে শুরু করে। যিনি ভক্তগণের মাঝে বলবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। যজ্ঞের পরিণাম জ্ঞান। যিনি গীতাশাস্ত্রের অনুসারে কর্ম করতে অসমর্থ; কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন, তিনি পুণ্যলোকলাভ করেন। এইপ্রকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর পাঠ-শ্রবণ এবং অধ্যয়নে কি ফললাভ হয়, তা বললেন। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। অবশেষে তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিছু বুঝতে পারলে কি?

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২।।

হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতাশাস্ত্র শুনেছ? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহের বিনাশ হল কি? এই প্রসঙ্গে অর্জুন বলছেন–

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।

অচ্যুত! আপনার কৃপাতে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে এবং স্মৃতিলাভ হয়েছে। (মনু যে রহস্যময় জ্ঞানের সূত্রপাত স্মৃতি-পরম্পরায় করেছিলেন, অর্জুন সেই জ্ঞানলাভ করেছিলেন।) আমি নিঃসংশয় হয়ে অবস্থিত, এখন আপনার আজ্ঞাপালন করব। যদিও সৈন্য নিরীক্ষণের সময় উভয় সেনাতেই স্বজনদের দেখে অর্জুন ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি নিবেদন করেছিলেন যে, গোবিন্দ! স্বজনদের বধ করে কিরূপে আমরা সুখী হব? এইরূপ যুদ্ধে শাশ্বত কুলধর্ম নষ্ট হবে, পিণ্ডোদক ক্রিয়া লুপ্ত পাবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। আমরা বুদ্ধিমান্ হয়েও পাপ করতে উদ্যত হয়েছি। এগুলি এড়িয়ে চলার উপায় আমরা খুঁজব না কেন? শস্ত্রধারী কৌরবগণ শস্ত্ররহিত আমাকে রণে মেরেই ফেলুক না কেন, সেই মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না, বলে তিনি রথের পশ্চাৎভাগে বসে পড়লেন।

এইপ্রকার গীতাশাস্ত্রে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন প্রশ্নের পরিপ্রশ্ন করেছিলেন। যেমন অধ্যায় ২/৭—সেই সাধন আমাকে বলুন, যা আমার পক্ষে পরমশ্রেয়স্কর। ২/৫৪—স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ কি? ৩/১—যদি আপনার মতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে এই ভয়ঙ্কর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? ৩/৩৬—মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? ৪/৪—আপনার জন্ম অনেক পরে হয়েছে এবং সূর্যের জন্ম বহু পূর্বে হয়েছিল। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলেন, তা কিরূপে বুঝব? ৫/১—কখনও আপনি সর্বকর্মের ত্যাগ আবার কখনও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করতে বলছেন। এই দুটির মধ্যে যেটি প্রকৃতপক্ষে পরমশ্রেয় প্রদান করে, তা আমাকে নিশ্চয় করে বলুন। ৬/৩৫—মন যে চঞ্চল, তাহলে শিথিল যত্নশীল শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ আপনাকে প্রাপ্ত না হলে কোন মার্গে গমন করেন? ৮/১-২—গোবিন্দ! যাঁর আপনি বর্ণনা করলেন, সেইব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? অধিদৈব, অধিভূত কাকে বলে? এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? সেই কর্ম কি? মৃত্যুকালে ব্যক্তিগণ কিরূপে আপনাকে জানতে পারেন? সাতটি প্রশ্ন করলেন। অধ্যায় ১০/১৭—তে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিরূপে সতত আপনার চিন্তন

করলে আমি আপনাকে জানতে পারব? এবং কোন কোন বস্তুতে আপনাকে আমি ধ্যান করব? ১১/৪—অর্জুন নিবেদন করলেন যে, যদি আমি যোগ্য হই, তাহলে যে যে বিভূতির আপনি বর্ণনা করলেন, সেগুলি আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। ১২/১—অনন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে নিযুক্ত যে সকল ভক্তজন উত্তমরূপে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁরা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা? ১৪/২১—গুণাতীতের লক্ষণ কি এবং কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়? ১৭/১—যাঁরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন, তাঁদের গতি কি হয়? এবং ১৮/১—হে মহাবাহো! আমি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের যথার্থস্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

এইভাবে অর্জুন প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন করে গেলেন। যে প্রশ্ন তিনি করতে পারেননি, সে সকল গোপনীয় রহস্যের সমাধান ভগবান স্বয়ং করেছেন। এগুলির সমাধনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন থেকে বিরত হয়ে বললেন, গোবিন্দ! এখন আমি আপনার আজ্ঞাপালন করব। বস্তুতঃ এই সমস্ত প্রশ্নই মানুষ মাত্রের জন্য। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান না হলে কোন সাধকই শ্রেয়-পথ-এ এগিয়ে যেতে পারেন না। অতএব সদ্‌গুরুর আদেশপালন করার জন্য, শ্রেয়-পথ-এ এগিয়ে যাবার জন্য, গীতাশাস্ত্রের সম্পূর্ণটাই শুনে যাওয়া অত্যাবশ্যক। অর্জুনের সমাধান হয়ে গেল। তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর উপসংহার হল। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় বললেন—

[একাদশ অধ্যায়ে বিরাট রূপের দর্শন দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুন! কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারাই এইরূপ আমাকে প্রত্যক্ষ করতে (যেরূপ তুমি দর্শন করেছ), তত্ত্বতঃ জানতে ও প্রবেশ করতে সুলভ (১১/৫৪)। এইরূপ দর্শন করে সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ও এখানে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মোহ নষ্ট হয়েছে কি? অর্জুন বললেন যে, তাঁর মোহনাশ হয়েছে। স্মৃতিলাভ হয়েছে। এখন আপনার উপদেশপালন করব। দর্শন করে অর্জুনের মুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বস্তুতঃ তাঁর যে স্থিতিলাভ করার ছিল, তা তিনি লাভ করেছিলেন; কিন্তু শাস্ত্র উত্তরপুরুষদের জন্য হয়। তার উপযোগিতা আপনাদের সকলের জন্যই।]

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪।।

আমি এইরূপ বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জুনের (অর্জুন মহাত্মা, যোগী, সাধক, কোন ধনুর্ধর নন, যিনি বধ করবার জন্য প্রস্তুত। অতএব মহাত্মা অর্জুনের) এই বিলক্ষণ ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শ্রবণ করলাম। কিরূপে তিনি শ্রবণে সমর্থ হয়েছিলেন? আরও বলছেন—

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎকৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫।।

শ্রীব্যাসদেবের কৃপাপ্রসাদে লব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা আমি এই পরমগুহ্য যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে সাক্ষাৎ শ্রবণ করেছি। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে মনে করেন। যিনি স্বয়ং যোগী ও অন্যকেও যোগ প্রদান করতে সমর্থ, তিনিই যোগেশ্বর।

রাজন্সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬।।

হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই পরমকল্যাণকরও অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃ স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হচ্ছি। অতএব এই কথোপকথন সর্বদা স্মরণ করা উচিত ও স্মরণ করে প্রসন্ন থাকা উচিত। এখন তাঁর স্বরূপ স্মরণ করে সঞ্জয় বললেন—

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭।।

হে রাজন! হরির (যিনি শুভাশুভ হরণ করে তিনিই শুধু বিরাজিত, সেই হরির) সেই অত্যদ্ভুত রূপ বার বার স্মরণ করে আমার মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হচ্ছি। ইষ্টের স্বরূপ বার বার স্মরণ করা উচিত। অবশেষে সঞ্জয় নির্ণয় করে বললেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভুতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।৭৮।।

রাজন্! যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ধনুর্ধারী অর্জুন (ধ্যানই ধনুক, ইন্দ্রিয়সমূহের দৃঢ়তাই গাণ্ডীব অর্থাৎ স্থিরভাবে যিনি ধ্যান করেন, তিনিই মহাত্মা অর্জুন) সেই পক্ষে **'শ্রীঃ'**-ঐশ্বর্য, বিজয়- যার পশ্চাতে পরাজয় নেই, ঈশ্বরীয় বিভূতি ও চলে সংসারে অচলনীতি বিরাজ করে, এই আমার অভিমত।

বর্তমানে অর্জুন নেই। তবে কি এই নীতি, বিজয়-বিভূতি অর্জুন পর্যন্তই সীমিত ছিল। তৎসাময়িক ছিল। তাহলে কি দ্বাপরযুগেই শেষ হয়ে গেছে? না। যোগেশ্বর বলেছেন যে, আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আপনার হৃদয়েও তিনি আছেন। অনুরাগই অর্জুন। আপনার অন্তঃকরণের ইষ্টোন্মুখ নিষ্ঠার নাম অনুরাগ। যদি আপনার হৃদয় অনুরাগের পূর্ণ, তাহলে সর্বদা বাস্তবিক বিজয় ও অচল স্থিতি প্রদানকারী নীতি সর্বদাই থাকবে, এমন নয় যে কখনও তা ছিল, এখন নেই। যতক্ষণ প্রাণী থাকবে, ততক্ষণ পরমাত্মা তাদের হৃদয়ে নিবাস করবেন। ব্যাকুল আত্মা তাঁকে লাভ করতে চাইবে, তাদের মধ্যে যারই হৃদয় তাঁকে লাভ করার জন্য অনুরাগে ভরে উঠবে, তিনিই অর্জুনের শ্রেণীভুক্ত হবেন; কারণ অনুরাগই অর্জুন। অতএব মানুষ মাত্রই প্রত্যাশী হতে পারেন।

নিষ্কর্ষ –

গীতাশাস্ত্রের এটাই অন্তিম অধ্যায়। শুরুতেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, প্রভু! আমি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের ভেদ এবং স্বরূপ জানতে চাই। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এরজন্য চারটি প্রচলিত মতের উল্লেখ করলেন। এর মধ্যেই সঠিক মতটিও ছিল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কোন কালে ত্যাগ করা উচিত নয়। এগুলি মনীষীগণকেও পবিত্র করে। এই তিনটিতে প্রবৃত্ত থেকে, এদের বিরোধী বিকারগুলিকে ত্যাগ করাই যথার্থ ত্যাগ। একেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ফলকামনা করে যে ত্যাগ করা হয়, তা রাজসিক ত্যাগ এবং মোহগ্রস্ত হয়ে নিয়ত কর্মেরই ত্যাগকে তামসিক ত্যাগ বলে। এবং সন্ন্যাস ত্যাগেরই চরমোৎকৃষ্ট অবস্থাকে বলে। নিয়ত কর্ম ও ধ্যানজনিত সুখ, সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ রাজসিক ও তৃপ্তিদায়ক অন্নের উৎপত্তি থেকে রহিত দুঃখপূর্ণ সুখ তামসিক।

মানুষ মাত্র দ্বারা শাস্ত্রের অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে কাজ সম্পাদন হয়, তা সম্পাদনের কারণ পাঁচটি–কর্তা (মন), পৃথক্ পৃথক্ করণ (যাদের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয়। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, করণরূপে থাকলে শুভ কর্মসম্পাদন হয়। কাম, ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি করণ হলে শুভ কাজ হয় না), নানা ইচ্ছা (ইচ্ছা অনন্ত, সব ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কেবল সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যার সঙ্গে আধার পাওয়া যায়।) চতুর্থ কারণ আধার (সাধন) ও পঞ্চম হেতু-দৈব (প্রারব্ধ অথবা সংস্কার)। এই পাঁচটি কারণেই প্রত্যেকটি কাজ হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও যাঁরা কৈবল্যস্বরূপ পরমাত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, সেই মূঢ়ব্যক্তি যথার্থ জানে না। অর্থাৎ ভগবান করেন না; কিন্তু পূর্বে বলেছেন যে, অর্জুন! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, কর্তা-হর্তা তো আমি। অন্ততঃ সেই মহাপুরুষ কি বলতে চাইছেন?

বস্তুতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের মাঝে এক আকর্ষণ সীমা আছে। যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিতে লিপ্ত, ততক্ষণ মায়া কাজ করার প্রেরণা প্রদান করে, যখন সাধক এর ঊর্ধ্বে উঠে ইষ্টের কাছে আত্মা সমর্পণ করেন ও ইষ্ট হৃদয়-দেশ-এ রথী হন, তখন ভগবান করেন। অর্জুন সেই স্তরের ছিলেন, সঞ্জয়ও ছিলেন, সকলেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারেন। অতএব এই স্তর থেকেই ভগবান প্রেরণা প্রদান করেন। পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষ, জানবার বিধি ও জ্ঞেয় পরমাত্মা-এই তিনটির সংযোগেই কর্মের প্রেরণালাভ হয়। সেইজন্য কোন মহাপুরুষের (সদ্‌গুরুর) সান্নিধ্যে গিয়ে এই গুঢ়বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত।

বর্ণ-ব্যবস্থার সম্বন্ধে চতুর্থবার উল্লেখ করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ইন্দ্রিয়ের দমন, মনের শমন, একাগ্রতা, কায়মনোবাক্যে তপস্যা, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সঞ্চার, ঈশ্বরীয় নির্দেশ অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা ইত্যাদি ব্রহ্মে প্রবেশ প্রদান করে যে যোগ্যতাগুলি, সেগুলি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্ম। শৌর্য, পশ্চাৎপদ না হওয়ার স্বভাব, সকলভাবের উপর প্রভুত্ব, কর্মে প্রবৃত্ত হবার দক্ষতা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম। ইন্দ্রিয়সমূহের সংরক্ষণ, আত্মিক সম্পত্তির বৃদ্ধি ইত্যাদি বৈশ্য শ্রেণীর কর্ম এবং পরিচর্যা শূদ্র শ্রেণীর কর্ম। শূদ্রের অর্থ অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞ সাধক নিয়ত কর্ম চিন্তনে দুঘন্টা বসে দশ মিনিটও একাগ্রচিত্ত হতে পারে না। দেহটাকে বসিয়ে রাখে কিন্তু যে মনকে স্থির হওয়া উচিত, সে তো কুতর্কের জাল বুনতে থাকে। এরূপ সাধকের কল্যাণ কিরূপে হবে?

তার নিজের থেকে উন্নত ব্যক্তির সেবা করা উচিত অথবা সদ্‌গুরুর সেবা করা উচিত। ধীরে ধীরে তার মধ্যে সংস্কারের সৃজন হবে, সাধনপথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। অতএব এই অল্পজ্ঞের কর্ম, সেবা থেকেই শুরু হবে। কর্ম একটাই-নিয়ত কর্ম, চিন্তন। যাঁরা এই কর্ম করেন, তাঁরা চারটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট এরাই হলেন ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মানুষকে নয় বরং গুণের মাধ্যমে কর্মকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই হল গীতোক্ত বর্ণ।

তত্ত্ব স্পষ্ট করে তিনি বললেন, অর্জুন! সেই পরমসিদ্ধির বিধি বলব, যা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ধারাবাহিক চিন্তন ও ধ্যান প্রবৃত্তি, ব্রহ্মে প্রবেশ প্রদানকারী সমস্ত যোগ্যতা যখন পরিপক্ক হয়; কাম, ক্রোধ, মোহ, রাগ-দ্বেষাদি প্রকৃতিতে ভ্রমণ করাতে থাকে যে প্রবৃত্তিগুলি, সেগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়, তখন ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানার যোগ্য হয়। সেই যোগ্যতাকে পরাভক্তি বলে। পরাভক্তির দ্বারা তত্ত্বকে জানা যায়। তত্ত্ব কি? বললেন—আমি যে এবং যে যে বিভূতিযুক্ত, তা যিনি জানেন অর্থাৎ পরমাত্মা যে অব্যক্ত, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল যে যে অলৌকিক গুণধর্মযুক্ত, তা যিনি জানেন, তিনি আমাতে স্থিত হন। অতএব তত্ত্ব—পরমতত্ত্বকে বলে, পাঁচ তত্ত্ব, পঁচিশতত্ত্বকে বলে না। প্রাপ্তির পর আত্মা সেই স্বরূপে স্থিত হয় এবং সেই সেই গুণধর্মে যুক্ত হয়।

ঈশ্বরের নিবাসস্থান সম্পর্কে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন! সেই ঈশ্বর সকল ভূতপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত; কিন্তু মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে লোক ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে, সেইজন্য জানতে পারে না। অতএব অর্জুন! তুমি হৃদয়ে স্থিত সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। এর থেকেও গোপনীয় রহস্য আরও আছে যে, সর্বধর্মের চিন্তাত্যাগ করে তুমি আমার শরণাগত হও। তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। এই রহস্য অনাধিকারীকে বলা উচিত নয়। যে ভক্ত নয় তাকেও বলা উচিত নয়; কিন্তু ভক্তকে অবশ্য বলা উচিত। তার কাছে গোপন করা উচিত নয়, না হলে তার কল্যাণ কিভাবে সম্ভব? অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, অর্জুন! আমি যা বললাম, তা তুমি উত্তমরূপে শুনেছ-বুঝেছ, তোমার মোহ নষ্ট হয়েছে কি? অর্জুন বললেন—ভগবন্! আমার মোহ নষ্ট হয়েছে। আমি স্মৃতিলাভ করেছি। আপনি যা বলছেন তা-ই সত্য, এখন আমি তা-ই করব।

সঞ্জয়, যিনি উত্তমরূপে উভয়ের কথোপকথন শুনেছিলেন নির্ণয় করে বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন মহাযোগেশ্বর ও অর্জুন হলেন মহাত্মা। তাঁদের কথোপকথন বার বার স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হচ্ছেন। অতএব কথোপকথন স্মরণ করা উচিত। হরির রূপ স্মরণ করেও তিনি বার বার আনন্দিত হচ্ছেন। অতএব বার বার স্বরূপের স্মরণ করা উচিত। ধ্যান করা উচিত। যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে মহাত্মা অর্জুন। সেই পক্ষেই শ্রীঃ, বিজয়-বিভূতি ও ধ্রুবনীতি। সৃষ্টির নীতি আজ যেমন, কাল তেমন থাকবে না। ধ্রুব একমাত্র পরমাত্মা। তাতে প্রবেশ প্রদান করে যে ধ্রুবনীতি, তা-ও সেই এক। যদি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দ্বাপরযুগের ব্যক্তি বলে চিন্তা করা হয়, তবে তো আজ না কৃষ্ণ আছেন, না আছেন অর্জুন! বিজয়-বিভূতি কি তাহলে লাভ করা সম্ভব নয়? তাহলে গীতাশাস্ত্রের উপযোগিতা কি আমাদের কাছে? কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। অনুরাগপূরিত হৃদয় যে মহাত্মার, তিনিই অর্জুন। তাঁরা সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি অব্যক্ত, কিন্তু যেভাব আশ্রয় করেছি, সেই ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বাস করেন। তিনি সদা ছিলেন ও সদাই থাকবেন। সকলকে তাঁর শরণাগত হতে হবে। যিনি শরণাগত, তিনি মহাত্মা, অনুরাগী এবং অনুরাগকেই অর্জুন বলা হয়। কল্যাণের জন্য কোন স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ তিনিই একমাত্র প্রেরক।

বর্তমান অধ্যায়ে সন্ন্যাসের স্বরূপ স্পষ্ট করা হয়েছে, সর্বস্বের ন্যাসকেই সন্ন্যাস বলে। কেবল কৌপীন ধারণ সন্ন্যাস নয়; বরং এর সঙ্গে নির্জনে বাস ও নির্ধারিত কর্মে সামর্থ্য অনুসারে অথবা সমর্পণ করে নিরন্তর প্রযত্ন করা অপরিহার্য। প্রাপ্তির পর সর্বকর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে, সন্ন্যাস ও মোক্ষ একই পর্যায়। এটাই সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'সন্ন্যাসযোগো' নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।। ১৮।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'সন্ন্যাসযোগ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামীঅড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'সন্ন্যাসযোগো' নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।।১৮।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামীঅড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'সন্ন্যাসযোগ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

উপসংহার

প্রায়ই জনসাধারণ টীকার মধ্যে নতুন তত্ত্ব খোঁজেন; কিন্তু সত্য সবসময় সত্য হয়, নূতন বা পুরানো হয় না। নতুন সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হয়। সত্য অপরিবর্তনশীল তাহলে তা নতুন করে আর কেউ কি বলবে? যদি বলে, তবে বুঝতে হবে সে সত্যের সন্ধান পায়নি। প্রত্যেক মহাপুরুষ সেই পথে চলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর সেই একমাত্র সত্যই বলবেন। তাঁরা সমাজে বিভেদের সৃষ্টি করেন না, যদি কেউ করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি সত্যে পৌঁছাননি। শ্রীকৃষ্ণও সেই সত্য সম্বন্ধেই বলেছেন, যা পূর্বে মনীষীগণ দর্শন করেছিলেন, লাভ করেছিলেন ও ভবিষ্যতেও যদি কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে তিনিও সেই একই কথা বলবেন।

মহাপুরুষ ও তাঁর কার্যপ্রণালী—মহাপুরুষ সর্বদা সমাজে প্রচলিত সত্যের নামে যে কুরীতি-কুপ্রথা থাকে, তা খণ্ডন করে কল্যাণের পথটি প্রশস্ত করেন। সেই কল্যাণের পথ পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরও মত ও পথ প্রচলিত হয়, যা সত্য বলে মনে হয়। এই সকল মত ও পথের মধ্যে যথার্থ মত কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন হয়। মহাপুরুষ সত্যে স্থিত সেইজন্য সত্যটি চিনে, ভ্রান্ত জনসাধারণকে সত্যের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা প্রদান করেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, কবীর, গুরু নানক প্রভৃতি প্রত্যেক মহাপুরুষ এই প্রয়াস করেছেন। মহাপুরুষের তিরোধানের পর অনুগামীগণ তাঁর নির্দেশিত পথে না চলে তাঁর জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান ও যেখানে যেখানে তিনি বিচরণ করেছেন, সেই স্থানগুলির পূজা করা শুরু করেন। ক্রমশঃ তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করা শুরু করেন। যদিও আরম্ভে ভক্তেরা তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে এইরূপ করেন; কিন্তু কালান্তরে সমাজ ভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও শেষে ভ্রম গোঁড়ামীর রূপ নিয়ে নেয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও তৎকালীন সমাজে সত্যের নামে প্রচলিত রীতি-নীতির খণ্ডন করে সমাজকে কল্যাণের প্রশস্ত পথ দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে তিনি বলেছেন, অর্জুন! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই ও সত্যের তিনকালে অভাব নেই। আমি ভগবান সেইজন্য বলছি না, বরং এর ভেদ তত্ত্বদর্শীগণ অনুভব করেছেন;

ও সেই সত্য সম্বন্ধেই আমি বলছি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা সেইভাবেই করেছেন, যা '**ঋষিভির্বহুধাগীতম্‌**'- ঋষিগণ দ্বারাও প্রায়ই গায়ন করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগ ও সন্ন্যাস তত্ত্ব বুঝিয়ে তিনি তৎকালীন প্রচলিত চারটি মতের মধ্যে থেকে একটি চয়ন করে সেটিতেই নিজের সমর্থন দিলেন।

সন্ন্যাস–কৃষ্ণকালে অগ্নিত্যাগী ও ঈশ্বর চিন্তনের ত্যাগীগণ নিজেদের যোগী, সন্ন্যাসী বলে একটা কর্মত্যাগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল। এর খণ্ডন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ, উভয়মার্গের মধ্যে একটির অনুসারেও কর্মত্যাগ করার বিধান নেই।" উভয়মার্গেই কর্ম করতেই হবে। কর্ম করতে করতে একসময় সাধনা এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে সঙ্কল্পের অভাব হয়ে যায়, এই স্থিতিকেই পূর্ণ সন্ন্যাস বলে এর আগে কাউকে সন্ন্যাসী নাম দেওয়া যেতে পারে না। কেবল ক্রিয়াত্যাগ করলে ও অগ্নিস্পর্শ না করলে কেউ সন্ন্যাসী হয় না বা যোগী হয় না। (এই বিষয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও বিশেষ করে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।)

কর্ম–এইরূপ ভ্রান্তি কর্মের প্রতিও ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২/৩৯শ শ্লোকে যোগেশ্বর বলেছেন যে, অর্জুন! এহে বুদ্ধির কথা তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে হয়েছে, এখন একেই তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি কর্ম-বন্ধনের নাশ উত্তমরূপে করতে পারবে। এই কর্মের অল্প আচরণও জন্ম-মৃত্যুর মহাভীতি থেকে উদ্ধার করে। এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া একটাই, বুদ্ধি ও দিক্‌ও একটাই; কিন্তু অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হয়, সেইজন্য তারা কর্মের নামে অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। অর্জুন! তুমি নিয়ত কর্ম কর। অর্থাৎ ক্রিয়া তো অনেক আছে কিন্তু সে সমস্ত কর্ম নয়। কর্ম হল একটা নির্ধারিত দিক্‌। কর্ম জন্ম-জন্মান্তরের দেহযাত্রা সমাপ্ত করে। যদি এরপরে আর একটা মাত্রও জন্ম নিতে হয়, তাহলে যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে কোথায়?

যজ্ঞ–এই নিয়ত কর্মটি কি? শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করেছেন যে, '**যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।**'-অর্জুন! যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এই কর্ম ভিন্ন জগতে যা কিছু অনুষ্ঠান করা হয়, তা ইহলোকেরই বন্ধন, সেগুলি কর্ম নয়। কর্ম তো এই সংসার-বন্ধন থেকে মোক্ষ প্রদান করে। এখন প্রশ্ন যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্ম সম্পাদন হবে? চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের তেরো-চৌদ্দটি পদ্ধতির সম্বন্ধে

বলেছেন যা হল পরমাত্মায় প্রবেশের বিধি-বিশেষ-এর বর্ণনা, এ সমস্তই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যান, চিন্তন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এও স্পষ্ট করলেন যে, ভৌতিক (সাংসারিক) দ্রব্যগুলির সঙ্গ এই যজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নেই। ভৌতিক দ্রব্যগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা অত্যল্প। আপনি কোটি টাকার হোম করুন না কেন। সম্পূর্ণ যজ্ঞ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অন্তঃক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়ে। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার পর যজ্ঞ থেকে যে অমৃত-তত্ত্ব লাভ হয়, সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে জানাকেই জ্ঞান বলে। যে যোগী সেই জ্ঞানামৃত পান করনে, তিনি সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ পান। যিনি সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ করেছেন, সেই পুরুষের কর্ম করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, সেইজন্য যাবন্মাত্র কর্ম সেই সাক্ষাৎকারসহিত জ্ঞানে সমাহিত হয়ে যায়। তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইরূপ নির্ধারিত যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়া কর্ম। কর্মের শুদ্ধ অর্থ হল—আরাধনা।

এই নিয়ত কর্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম অথবা তদর্থ কর্মের অতিরিক্ত গীতাশাস্ত্রে অন্য কোন কর্ম নেই। এর উপর শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্থানে জোর দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এটিকেই তিনি 'কার্যম্ কর্ম' বলেছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে বলেছেন যে কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করলেই সেই কর্ম আরম্ভ হয়, যা পরমশ্রেয় প্রদান করে। সাংসারিক কর্মগুলিতে যে যত ব্যস্ত, তার মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ সেই পরিমাণেই থাকে, সমৃদ্ধ দেখা গেছে। এই নিয়ত কর্মকে তিনি শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্মের নাম দিয়েছেন। গীতা স্বয়ং পূর্ণ শাস্ত্র। সর্বোপরি শাস্ত্র বেদ, বেদের সার উপনিষদ্ এবং সেগুলির সারাংশ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী গীতাশাস্ত্র। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়েও শাস্ত্রবিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্ম, নিয়ত, কর্ম, কর্তব্য কর্ম ও পুণ্যকর্মদ্বারা ইঙ্গিত করে তিনি বারংবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিয়ত কর্মই পরমকল্যাণকর।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এত জোর দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা সেই নিয়ত কর্ম না করে, শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুসারে না চলে কপোলকল্পিত অনুমান করেন যে, যা কিছু কার্য করা হয় এই সংসারে, সেগুলিই কর্ম। কিছু ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই কেবল কর্মফলের কামনা ত্যাগ কর, তবেই হবে নিষ্কাম কর্মযোগ। কর্তব্য ভেবে করে গেলেই কর্তব্যযোগ হবে। সমস্ত ক্রিয়া নারায়ণকে সমর্পণ করে করলেই সমর্পণ যোগ হবে। এইরূপ যজ্ঞের নামে আমরা ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, বিষ্ণুর নিমিত্তে যজ্ঞ কল্পনা করি এবং সেই ক্রিয়াতে স্বাহা বলে উঠে পড়ি। যদি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

স্পষ্ট করে না বলতেন, তাহলে আমরা যা খুশি করতাম ক্ষতি ছিল না; কিন্তু যখন বলেছেন, ও যতটা বলেছেন, ততটাই মেনে চলুন। কিন্তু আমরা সেই অনুসারে চলতে পারি না। বংশ-পরম্পরায় বহু রীতি-নীতি, পূজা-পদ্ধতি আমরা মেনে চলে আসছি যেগুলি আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। সাংসারিক বস্তু আমরা ত্যাগ করতে চাইলে হয়ত করতেও পারি; কিন্তু এই পূর্বসংস্কার আমরা মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের বাণীও আমরা সেই অনুসারেই গ্রহণ করি। গীতা অত্যন্ত সহজ বোধগম্য, সরল সংস্কৃতে লিখিত শাস্ত্র, যদি আপনি শুধু এতে নিহিত যথার্থকেই গ্রহণ করেন, তবুও আর কখনও মনে সংশয় জাগবে না। এই প্রয়াসই প্রস্তুত পুস্তকে করা হয়েছে।

যুদ্ধ—যদি যজ্ঞ ও কর্ম এই দুটি প্রশ্নই যথার্থ বোধগম্য হয়, তাহলে যুদ্ধ, বর্ণ-ব্যবস্থা, বর্ণ সঙ্কর, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ অথবা সংক্ষেপে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রই আপনাদের সহজবোধ্য হবে। অর্জুন যুদ্ধে ইচ্ছুক ছিলেন না, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের পশ্চাৎভাগে গিয়ে বসেছিলেন; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কর্মের শিক্ষা দিয়ে কেবল কর্ম করার পথই দেখালেন না বরং অর্জুনকে সেই কর্মপথে চালিতও করেছিলেন। যুদ্ধ হয়েছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গীতাশাস্ত্রে ১৫-২০টা শ্লোক এমন আছে যেগুলিতে বার বার বলা হয়েছে যে, অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। কিন্তু একটা শ্লোকও এমন নেই, যা বাহ্য যুদ্ধের সমর্থন করে। (দ্রষ্টব্য-অধ্যায় ২, ৩, ১১, ১৫ এবং ১৮) কারণ যে কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে—তা ছিল নিয়ত কর্ম, যা নির্জনে বাস, চিত্তকে সংযত করে ধ্যান করলেই হয়। যদি কর্মের স্বরূপ এটাই, নির্জনে চিত্ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকবে, তাহলে যুদ্ধ কিরূপে হবে? গীতোক্ত কল্যাণ যদি কেবল যোদ্ধাদের জন্যই, তাহলে গীতা থেকে আপনার লাভ কি হবে? আপনার সমক্ষে অর্জুনের মত কোন যুদ্ধের পরিস্থিতিও তো নেই। বস্তুতঃ তখনও যে পরিস্থিতি ছিল আজও তেমনি আছে। যখন চিত্তকে সর্বদিক্ থেকে একাগ্র করে আপনি হৃদয়-দেশ-এ ধ্যান করা শুরু করবেন, তখন কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদি বিকার আপনার চিত্তকে স্থির হতে দেবে না। সেই বিকারগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ, তাদের নিশ্চিহ্ন করাই যুদ্ধ। বিশ্বে কোথাও না কোথাও যুদ্ধ লেগেই আছে; কিন্তু তা থেকে কল্যাণ নয় বরং বিনাশই হয়। এর পরিণাম শান্তি বলুন অথবা পরিস্থিতি। অন্য কোন উপায়ে শান্তিলাভ হয় না। শান্তি তখনই লাভ হয়, যখন এই আত্মা নিজের

শাশ্বত স্থিতিলাভ করে। এটাই একমাত্র শান্তি যার পশ্চাতে অশান্তি নেই। কিন্তু এই শান্তি সাধনগম্য, এর জন্য নিয়ত কর্মের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

বর্ণ—এই কর্মকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সাধক চিন্তন-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে-এর গতি রুদ্ধ করতে সমর্থ হন; তো কেউ বা দুই ঘন্টা চিন্তনে বসেও দশ মিনিটের জন্য একাগ্রচিত্ত হতে পারেন না। এইরূপ স্থিতিযুক্ত অল্পজ্ঞ সাধক শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর সাধকগণ নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা পরিচর্যা থেকেই কর্ম আরম্ভ করবেন। ক্রমোন্নতি দ্বারা এই শূদ্র শ্রেণীর সাধকই বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও বিপ্র শ্রেণীর যোগ্যতালাভ করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেণীও দোষযুক্ত; কারণ এই শ্রেণীতে সাধক ও ব্রহ্ম ভিন্নভিন্নই থাকেন। ব্রহ্মে স্থিতিলাভ হলে সাধক তার পর ব্রাহ্মণও থাকেন না।

বর্ণের অর্থ আকৃতি। এই দেহটা আপনার আকৃতি নয়। যেমন আপনার বৃত্তি, আপনার আকৃতিও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—অর্জুন! পুরুষ শ্রদ্ধাবান্ হয়, তার শ্রদ্ধা কোথাও না কোথাও অবশ্যই স্থির থাকে। যেরূপ শ্রদ্ধা সেই পুরুষের সেইরূপ সে নিজেও হয়। যেমন বৃত্তি, তেমনি হয় পুরুষ। বর্ণ কর্মের ক্ষমতার আন্তরিক মানদণ্ড; কিন্তু লোকে নিয়ত কর্মত্যাগ করে বাহ্য সমাজে জন্মের আধারের উপর জাতিকে বর্ণ বলে তাদের জীবিকা নির্ধারিত করে দিয়েছে, যা শুধু একটা সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। তারা কর্মের যথার্থরূপকে বিকৃত করে, যাতে তাদের সারহীন সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার উপর কোন প্রভাব না পড়ে। কালান্তরে বর্ণের নির্ধারণ কেবল জন্ম থেকে হতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু এরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—চার বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। ভারতবর্ষের বাইরে কি এই সৃষ্টি নেই? অন্যত্র কোথাও এইরূপ জাতি-ব্যবস্থা নেই। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থার অন্তর্গত সহস্র জাতি-উপজাতি বিদ্যমান। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ মানুষের বিভাগ চার শ্রেণীতে করেছেন? না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**'—গুণের আধারে কর্মের বিভাগ করেছেন। '**কর্মাণি প্রবিভক্তানি**'—কর্মকে ভাগ করা হয়েছে। কর্ম কি তা বুঝতে পারলে বর্ণও স্পষ্ট হবে এবং বর্ণ বুঝলে বর্ণসঙ্করের যথার্থরূপ আপনি অবগত হবেন।

বর্ণসঙ্কর—এই কর্মপথ থেকে বিচ্যুত হওয়াই বর্ণসঙ্কর। আত্মার শুদ্ধবর্ণ পরমাত্মা। যে কর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে সেই কর্ম থেকে বিচলিত হয়ে প্রকৃতিতে জড়িয়ে যাওয়াই বর্ণসঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করলেন যে, এই কর্মের অনুষ্ঠান

না করে কেউই সেই স্বরূপলাভ করতে পারে না এবং প্রাপ্তিযুক্ত মহাপুরুষকে কর্ম করলে না কোন লাভ হয় এবং ত্যাগ করলে না কোন লোকসান হয়। তাসত্ত্বেও লোক-সংগ্রহের জন্য তাঁরা কর্ম করেন। সেই মহাপুরুষদের মত আমারও প্রাপ্তযোগ্য কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নেই; কিন্তু তবুও আমি অনুগামীদের হিতার্থে কর্মে প্রবৃত্ত থাকি। যদি কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি তবে সকলেই বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে। স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় একথা শোনা যায়; কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ কর্ম না করলে অনুগামীগণ বর্ণসঙ্কর হবে। সেই মহাপুরুষকে কর্ম না করতে দেখে তারাও কর্মত্যাগ করে প্রকৃতিতে ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে, বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে; কারণ এই কর্ম করেই পরম নৈষ্কর্ম্যের স্থিতি, নিজের শুদ্ধবর্ণ পরমাত্মাকে লাভ করা যেতে পারে।

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ– কর্ম একটাই, নিয়ত কর্ম, আরাধনা; কিন্তু এই কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টিকোণ দুটি। নিজের সামর্থ্য অনুসারে, লাভ-লোকসানের নির্ণয় করে এই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া 'জ্ঞানযোগ'। এই মার্গের সাধক জানেন যে, "আজ আমার এই স্থিতি, এর পর এই ভূমিকায় পৌঁছাব। তার পর স্বরূপলাভ করব।" এইরূপ ভাব নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হন। নিজ স্থিতি অবগত হয়ে চলেন, সেইজন্য এদের জ্ঞানমার্গী বলা হয়। সমর্পণের সঙ্গে সেই একই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, লাভ-লোকসানের দায়িত্ব ইষ্টের হাতে তুলে চলা নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিমার্গ। উভয়মার্গেরই প্রেরক সদ্‌গুরু। একই মহাপুরুষের নিকট শিক্ষা নিয়ে একজন স্বাবলম্বী হয়ে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং অন্যজন তাঁর নিকট শিক্ষা নিয়ে, তাঁর উপর নির্ভর করে প্রবৃত্ত হন। পার্থক্য কেবল এইটুকুই। সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন! সাংখ্যযোগদ্বারা যে পরমসত্য লাভ হয়, সেই পরমসত্য নিষ্কাম কর্মযোগদ্বারাও লাভ হয়। যিনি দুটিকেই এক দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। দুটি ক্রিয়ার বক্তা তত্ত্বদর্শী একজনই, ক্রিয়াও একটা-আরাধনা। উভয়মার্গীই কামনাগুলিকে ত্যাগ করেন এবং পরিণামও একটাই। কেবল কর্ম-এর করার দৃষ্টিকোণ দুটি।

একমাত্র পরমাত্মা—নিয়ত কর্ম হচ্ছে, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একটা নির্ধারিত অন্তঃক্রিয়া। যখন এটাই কর্মের স্বরূপ, তখন মন্দির, মসজিদ; চার্চ নির্মাণ করে দেবী-দেবতার মূর্তি অথবা প্রতীক পূজা কতটা সঙ্গত? ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ (বস্তুতঃ এরা সনাতনধর্মী। তাদের পূর্বপুরুষগণ পরমসত্যের দিগ্‌দর্শন করে দেশে-বিদেশ-এ

তা প্রচার করেছেন। সেই পথের পথিক, বিশ্বে যেখানেই থাক, সে সনাতনধর্মী। এত গৌরবশালী হিন্দুসমাজ) কামনাদ্বারা অভিভূত হয়ে বিবিধ ভ্রান্তিতে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন ! দেবস্থানে দেবতা বলে কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। যেখানেই মানুষের শ্রদ্ধা স্থির হয়, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমিই ফলপ্রদান করি, তার শ্রদ্ধা পুষ্ট করি; কারণ সর্বত্র আমি। কিন্তু তার সেই পূজা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্য ফল নষ্ট হয়ে যায়। কামনাদ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, সেই মূঢ়গণই অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ-রাক্ষসগণের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেত-এর পূজা করে। কঠিন তপস্যা করে; কিন্তু অর্জুন ! তারা দেহস্থিত ভূতসমুদায় এবং অন্তঃকরণে স্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে কৃশ করে, পূজা করে না। তাদের তুমি নিশ্চয় আসুরিক স্বভাবযুক্ত জানবে। এর থেকে বেশী শ্রীকৃষ্ণ কি বলতেন ? তিনি স্পষ্ট বলেছেন—অর্জুন ! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন, কেবল তাঁর শরণে যাও। পূজাস্থলী হৃদয়, বহির্জগৎ নয়। তা সত্ত্বেও লোকে প্রস্তর-জল, মন্দির-মসজিদ, দেবী-দেবতার পূজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিরও পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে চলার জন্য জোর দিতেন এবং যারা সারাজীবন মূর্তি-পূজার খণ্ডন করেছেন সেই বুদ্ধের অনুযায়ীগণও যথাক্রমে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরী করে পূজা করা আরম্ভ করেছেন। যদিও বুদ্ধদেব তাঁর নিকট শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন-আনন্দ! তথাগতের শরীর-পূজায় সময় নষ্ট করো না।

মন্দির, মসজিদ, চার্চ, তীর্থ, মূর্তি এবং স্মারকসমূহদ্বারা পূর্ববর্তী মহাপুরুষ-গণের স্মৃতিরক্ষা হয়ে থাকে, যাতে তাঁদের উপলব্ধির কথা স্মরণ হতে থাকে। মহাত্মা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই হয়েছেন। জনককন্যা 'সীতা' পূর্বজন্মে এক ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। পিতাদ্বারা প্রেরিত হয়ে পরমব্রহ্ম লাভের জন্য তিনি তপস্যা করেছিলেন; কিন্তু সেই জন্মে সফল হতে পারেন নি। পরের জন্মে তিনি রামকে পেয়েছিলেন এবং চিন্ময়, অবিনাশী, আদিশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঠিক সেই প্রকার রাজকুলে উৎপন্ন মীরার মধ্যে পরমাত্মার প্রতি ভক্তির প্রস্ফুটন হয়েছিল। সবকিছু ত্যাগ করে তিনি ঈশ্বর-চিন্তনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পথের সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি সফল হয়েছিলেন। এঁদের স্মৃতি রক্ষার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, স্মারক তৈরী হয়েছে, যাতে সমাজ এঁদের স্মরণ করে এঁদের উচ্চাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত

হতে পারে। মীরা, সীতা অথবা এই পথের যত শোধকর্তা মহাপুরুষ আমাদের আদর্শ। আমাদের সর্বদা এঁদের পদচিহ্নের অনুসরণ করা উচিত; কিন্তু এর চাইতে বড় ভুল কি হবে, যদি আমরা কেবল তাঁদের চরণে ফুল অর্পণ করে, চন্দন লাগিয়ে নিজেদের কর্তব্যের ইতি বলে মনে করি।

প্রায়ই এরূপ হয় যে, যিনি যাঁর আদর্শ হন, তাঁর মূর্তি, ছবি, খড়ম, তাঁর স্থান অথবা সম্বদ্ধ কোন বস্তু-দর্শনে, শ্রবণে মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এটা স্বাভাবিক। আমরাও আমাদের গুরুদেবের ছবির অপমান করতে পারি না; কারণ তিনি আমাদের আদর্শ। তাঁরই প্রেরণা ও কথনানুসারে আমাদের চলতে হবে। তাঁর যে স্বরূপ, ক্রমশ: চলে সেই স্বরূপের প্রাপ্তি আমাদেরও অভীষ্ট এবং এটাই হল তাঁর যথার্থ পূজা। এতদূর পর্যন্ত তো ঠিক আছে যে, বস্তুতঃ যিনি আদর্শ, তাঁকে অনাদর করা উচিত নয়; কিন্তু শুধু পত্র-পুষ্প অর্পণ করাটাই ভক্তি মনে করে সেটাকেই কল্যাণের সাধন বলে মেনে নেওয়া, আমাদের লক্ষ্য থেকে বহুদূরে সরিয়ে দেবে।

নিজের আদর্শের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এবং সেই অনুসারে চলার প্রেরণা গ্রহণ করার জন্যই এই স্মারকগুলির উপযোগিতা আছে; তা সেই স্থানকে আশ্রম, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, মঠ, বিহার, গুরুদ্বারা যা-ই বলুন না কেন। শর্ত এই যে, সেই কেন্দ্রগুলির সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে থাকবে। যাঁর প্রতিকৃতি আছে, তিনি কি করেছেন ? কিরূপে তপস্যা করেছেন ? কিরূপে লাভ করেছেন ? কেবল এতটা জানার জন্যই তো আমরা সেখানে যাই এবং যাওয়াও উচিত; কিন্তু যদি এই স্থানগুলিতে মহাপুরুষের পদচিহ্ন অনুসরণের বিষয়ে বলা না হয়, করে শেখানো না হয়, কল্যাণের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেইসব স্থানের কোন উপযোগিতা নেই। সেখানে কুরীতি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। সেখানে গেলে ক্ষতিই হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ঘরে-ঘরে, অলিতে-গলিতে গিয়ে উপদেশ দেওয়া থেকে সামুহিক উপদেশ কেন্দ্ররূপে এই ধার্মিক সংস্থাগুলির স্থাপনা করা হয়েছিল; কিন্তু কালান্তরে এই প্রেরণাস্থলী সমূহই মূতি-পূজা ও গোঁড়ামীর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, ও এখান থেকেই যত ভ্রম উৎপন্ন হয়ে চলেছে।

গ্রন্থ—সেইজন্য শাস্ত্রানুশীলন আবশ্যক, যাতে আপনি সেই নির্দিষ্ট ক্রিয়া বুঝতে পারেন, সেই নির্দিষ্ট ক্রিয়াকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত কর্ম বলেছেন এবং যখন বুঝতে পারবেন সেই নিয়ত কর্ম কি, তখন কর্মে প্রবৃত্ত হবেন। যখনই বিস্মৃত হবেন,

তখনই আবার অধ্যয়ন করে নিন। এমন করবেন না যে গ্রন্থটিকে প্রণাম করে অক্ষত, চন্দনাদি দ্রব্য দিয়ে পূজা করে তুলে রেখে দেবেন। গ্রন্থ পথ-নির্দেশক, যা সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। এই গ্রন্থের সাহায্যেই এগিয়ে যান নিজের গন্তব্যের দিকে। যখন হৃদয়ে ইষ্টকে ধারণ করতে সক্ষম হবেন, তখন সেই ইষ্টই গ্রন্থের স্থান গ্রহণ করবেন। অতএব স্মৃতিরক্ষা করা লোকসানের কিছু নয়; কিন্তু এই স্মৃতিচিহ্নগুলির শুধু পূজা করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়াতে কোন লাভ হয় না।

ধর্ম–(অধ্যায় ২/১৬-২৯) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে, অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সত্যের কোনকালে অভাব নেই। পরমাত্মাই সত্য, শাশ্বত, অজর, অমর, এমন অপরিবর্তনশীল এবং সনাতন; কিন্তু সেই পরমাত্মা অচিন্ত্য এবং অগোচর, চিত্তের তরঙ্গের অতীত। চিত্ত নিরোধ কিরূপে সম্ভব? চিত্ত নিরুদ্ধ করে পরমাত্মাকে লাভ করার বিধি-বিশেষের নাম কর্ম। এই কর্মকে করে যাওয়াই ধর্ম ও দায়িত্ব।

গীতা (অধ্যায় ২/৪০)তে বলেছেন যে, অর্জুন! এই কর্মযোগে আরম্ভে নাশ নেই। এই কর্মরূপ ধর্মের অল্প সাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে অর্থাৎ এই কর্মকে করে যাওয়াই ধর্ম।

এই নিয়ত কর্ম (সাধন-পথ) কে সাধকের স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কর্ম অবগত হয়ে মানুষ যখন থেকে কর্মের অনুষ্ঠান করে, তখন সেই আরম্ভিক অবস্থাতে সে শূদ্র। ক্রমশঃ যখন বিধি আয়ত্তে আসে, তখন সেই বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃতির সংঘর্ষকে সহ্য করার ক্ষমতা এবং শৌর্যযুক্ত হলে সেই ব্যক্তিই ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মের তদ্রূপ হওয়ার ক্ষমতা, জ্ঞান (বাস্তবিক জানা), বিজ্ঞান (ঈশ্বরীয় বাণী শোনা) সেই অস্তিত্বের উপর নির্ভর থাকার ক্ষমতা-এরূপ যোগ্যতা লাভ হলে সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (গীতা, অধ্যায় ১৮/৪৬-৪৭) বলেছেন যে, স্বভাবে যে ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া স্বধর্ম। গুরুত্ব কম হলেও স্বভাবে উপলব্ধ স্বধর্ম শ্রেয়স্কর ও ক্ষমতালাভ না করে অন্যের উন্নত কর্মের অনুকরণ ক্ষতিকর। স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর; কারণ বস্ত্র পরিবর্তন করলে পরিবর্তন কর্তার তো পরিবর্তন হয় না। তার সাধনার ক্রম আবার সেখান থেকেই আরম্ভ হবে, যেখানে ছেদ পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে চলে তিনি পরমসিদ্ধি অবিনাশী পদলাভ করেন।

এরই উপর জোর দিয়ে বলছেন যে, যে পরমাত্মা থেকে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, যিনি সর্বব্যাপ্ত, স্বভাবে যে ক্ষমতা বিদ্যমান সেই ক্ষমতানুসারে তাঁকে উত্তমরূপে পূজা করে মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করে। অর্থাৎ নিশ্চিত বিধিদ্বারা এক পরমাত্মার চিন্তনই ধর্ম।

ধর্মে প্রবেশ কাদের? ধর্মের আচরণ করার অধিকার কাদের?- এ বিষয়ে যোগেশ্বর স্পষ্ট বলেছেন যে, "অর্জুন! অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে (অনন্য অর্থাৎ অন্য নয়), আমা ভিন্ন অন্য কারও ভজনা করে না, কেবল আমাকে ভজনা করে, **'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'**—সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়, তার আত্মা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।" অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে—ধর্মাত্মা সেই, যে এক পরমাত্মাতে অনন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত। ধর্মাত্মা সেই, যে একমাত্র পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য নিয়ত কর্মের আচরণ করে। ধর্মাত্মা সেই, যে স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে পরমাত্মার খোঁজে রত।

অবশেষে বলছেন যে— "**সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**"—অর্জুন! সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। অতএব একমাত্র পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত ব্যক্তিই ধার্মিক। একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির করাটাই ধর্ম। সেই এক পরমাত্মার প্রাপ্তির নিশ্চিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা ধর্ম। এইরূপ স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষগণের সিদ্ধান্তই সৃষ্টিতে একমাত্র ধর্ম। তাঁদের শরণাগত হওয়া উচিত তাঁরা কিরূপে সেই পরমাত্মাকে লাভ করেছেন? কোন পথে গমন করেছেন? সেই মার্গ একটাই, সেই মার্গে চলা ধর্ম।

ধর্ম আচরণের বিষয়। সেই আচরণ কেবল একটাই—"**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।**" (২/৪১) এই কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা ক্রিয়া একটাই—ইন্দ্রিয়সমূহের চেষ্টা এবং মনের কার্যকে সংযম করে আত্মাতে (পরাৎপর ব্রহ্মে) প্রবাহিত করা (৪/২৭)।

ধর্ম-পরিবর্তন— সনাতন ধর্মের আদিদেশ ভারতবর্ষে একসময় কুপ্রথা-কুরীতি এতবেশী প্রচলিত ছিল যে, মুসলমানদের আক্রমণের সময় তাদের ধর্ম আক্রমণকারীদের হাতের এক গ্রাস ভাত খাওয়াতে, দুঢোক জল পান করাতেই নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। ধর্মভ্রষ্ট ঘোষিত হাজার হাজার হিন্দু আত্মহত্যা করে নিয়েছিল।

ধর্মের জন্য তারা আত্মবলিদান করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ধর্ম বুঝে করলে তবে তো। ধর্ম লজ্জাবতী লতার মত হয়ে গিয়েছিল। লজ্জাবতী লতার পাতা ছুঁলেই তার পাতা সঙ্কুচিত হয়ে যায়, হাত সরালেই আবার বিকশিত হয়; কিন্তু তাদের সনাতন ধর্ম তো এমন লোপ পেল যে তার আর বিকাশ হলই না। যে সনাতন আত্মাকে ভৌতিক বস্তুগুলি স্পর্শও করতে পারে না, তা কি কখনও ছোঁয়া-খাওয়াতে নষ্ট হয়? আপনার মৃত্যু তো তরবারির আঘাতে হবে আর ধর্মের ছোঁয়াতেই মৃত্যু হবে? সতি কি ধর্ম নষ্ট হয়েছিল? কখনও না, ধর্মের নামে যে কুরীতি প্রচলিত ছিল, তা নষ্ট হয়েছিল। ফিরোজ তুগলকের শাসনকালে বয়ানার কাজী মুগীসুদ্দীন ব্যবস্থা দিয়েছিল যে, হিন্দুদের মুখ খুলে চলা উচিত, কারণ যদি কোন মুসলমান থুতু ফেলতে চায়, তাহলে সেই হিন্দু ধর্মাত্মা হয়ে যাবে কারণ তার কোন ধর্ম নেই। কি খারাপ বলেছিল সে? মুখে থুতু ফেললে তো একজনই মুসলমান হবে, কুয়োতে থুতু ফেললে তো হাজার হাজার লোক মুসলমান হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সেই কাজী আততায়ী ছিল অথবা সেই সময়ের হিন্দু সমাজ?

সেই যুগে যারা এইভাবে ধর্ম-পরিবর্তন করে নিয়েছিল, তারা কি সত্যি কোন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল? হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া অথবা এক প্রকারের আচার-ব্যবহার থেকে অন্য প্রকারের সমাজ ব্যবস্থায় চলে যাওয়াটা ধর্ম নয়। এই প্রকার পরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে যারা তাদের ধর্মান্তরণ করেছিল, তারা কি ধর্মাত্মা ছিল? তারা তো আরও বেশী কুরীতির শিকার ছিল। হিন্দুরা আরও বেশী কুপ্রথায় জড়িয়ে পড়েছিল। অবিকসিত ও পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে সভ্য করার জন্য মহম্মদ বিবাহ, তালাক, উইলের কাগজ দেনা-পাওনা, সুদ, সাক্ষী, প্রতিজ্ঞা, প্রায়শ্চিত্ত, অন্নসংস্থান, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে এক সামাজিক ব্যবস্থা দিয়েছিলেন এবং মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, চুরি, মদ, জুয়া, মা-ঠাকুরমার সঙ্গে বিবাহে করতে নিষেধ করে ছিলেন। সমলৈঙ্গিক এবং রজস্বলা স্ত্রীর সঙ্গে মৈথুন নিষেধ করে, রোজার দিনগুলিতেও এই নিয়ম শিথিল করেছিলেন। স্বর্গে বহু সমবয়স্ক, অপূর্ব সুন্দরী ও কিশোর বালকদের প্রলোভন দিয়েছিলেন। এটা ধর্ম ছিল না, এক প্রকারের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কিছু কিছু বলে তিনি বাসনায় নিমজ্জিত সমাজকে সেদিক থেকে বিমুখ করে নিজের দিকে উন্মুখ করার চেষ্টা করেছিলেন। স্ত্রীজাতিকে নিয়ে কোন চিন্তাই করেননি যে, তারা স্বর্গে গিয়ে কতগুলো পুরুষলাভ

করবে? এদোষ তাঁর নয়, দোষ সেই দেশকাল ও পরিস্থিতির, যখন স্ত্রী জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ধ্যান দেওয়া হত না।

মহম্মদ সাহেব যেটাকে ধর্ম বলেছেন, সেদিকে কারও ধ্যানই নেই। তিনি বলেছিলেন যে, যে পুরুষের একটা শ্বাসও সেই খোদার নাম ছাড়া ব্যর্থ যায়, তাকে খোদা সেইভাবেই প্রশ্ন করে, যেভাবে কোন পাপীকে তার পাপের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার শাস্তি হল সর্বদার জন্য (দোজখ) নরকে বাস। কয়জন সত্যিকার মুসলমান, কোটি-কোটি ব্যক্তির মধ্যে দু'একজনই এমন রয়েছেন, যাঁরা শ্বাস-এ নিরন্তর খোদার নাম জপ করে চলেছেন। বাকী সকলের শ্বাস ব্যর্থই যায়। পাপীদের জন্য যে শাস্তির বিধান এদের ক্ষেত্রেও সেটাই, তা'হল নরক (দোজখ)। মহম্মদ বলেছিলেন যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না, পশুদের আঘাত করে না সে আকাশ থেকে খোদার যে আওয়াজ আসে, তা শুনতে পায়। এটা প্রত্যেক স্থানের জন্য প্রযোজ্য ছিল; কিন্তু অনুগামীগণ এটাকে অন্যভাবে বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে, মক্কাতে একটা মসজিদ আছে, সেখানে সবুজ ঘাস তোলা উচিত নয়, সেই মসজিদে কোন পশুকে হত্যা করা উচিত নয়, সেস্থানে কাউকে আঘাত করা উচিত নয় এবং যে অবস্থাতে আগে ছিল, আবার সেই অবস্থাতেই গিয়ে পৌঁছেছিল। মহম্মদ খোদার আওয়াজ শোনার আগে কি কোন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন? কখনও কোন মসজিদে কি কোরানের বাক্যও শুনেছে কেউ। এই মসজিদ তো সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। মহম্মদ সাহেবের আশয় তবরেজ বুঝেছিলেন, মনসুর বুঝেছিলেন, ইকবাল বুঝেছিলেন; কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের যাতনা দেওয়া হয়েছিল। সুকরাতকে বিষ দেওয়া হয়েছিল; কারণ তিনি লোকেদের নাস্তিক করে দিচ্ছিলেন, যীশুর উপরও এইরূপ দোষারোপ করা হয়েছিল, তাঁকে শূলে চড়ানো হয়েছিল; কারণ তিনি বিশ্রাম সব্বাথের দিনেও কাজ করতেন, অন্ধদের চক্ষুদান করতেন। এই ভারতেও হয়। যখনই কোন প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেন, তখনই এই মন্দির, মসজিদ, মঠ, সম্প্রদায় ও তীর্থস্থানের ভরসায় যাদের জীবিকা চলে, তারা হায় হায় করতে শুরু করে, অধর্ম অধর্ম বলে চিৎকার আরম্ভ করে দেয়। কারও-কারও এগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার আয় হয়, আবার কারও ডাল-রুটির ব্যবস্থা কোন রকমে হয়ে যায়। বাস্তবিকতার প্রচারে তাদের জীবিকা সংকটে পড়তে পারে ভেবে তারা সত্যটিকে প্রকাশ হতে দেয় না

আর দেবেও না। এছাড়া তাদের বিরোধিতার আর কোন কারণ নেই। সুদূরকালে এইসব স্মৃতি কেন রক্ষা করা হয়েছিল, সেসব কারণ তাদের জানা নেই।

গৃহস্থের অধিকার—প্রায়ই লোকে জিজ্ঞাসা করে যে যদি কর্মের স্বরূপ এটাই, যাতে নির্জনে বাস, ইন্দ্রিয়সংযম, নিরন্তর চিন্তন ও ধ্যান আবশ্যক, তবে তো গীতাশাস্ত্র গৃহস্থদের জন্য নয়, অনুপযোগী। তবে তো গীতাশাস্ত্র কেবল সাধুদের জন্যই। কিন্তু তা নয়। গীতাশাস্ত্র মূলতঃ তাদের জন্য, যারা এই পথের পথিক ও অংশতঃ তাদের জন্যও, যে এই পথের পথিক হতে ইচ্ছুক। গীতাশাস্ত্রের আশয় মানুষমাত্রের জন্য সমান। সদ্‌গৃহস্থের জন্য তো এর উপযোগিতা বিশেষ; কারণ কর্ম গৃহস্থাশ্রম থেকেই আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের নাশ নেই। এর অল্পসাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। আপনিই বলুন, অল্প সাধন কে করবে, গৃহস্থ অথবা বৈরাগী? গৃহস্থই এরজন্য অল্পসময় দেবে, এটা তার জন্যই। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে তিনি বলেছেন—অর্জুন! যদি তুমি সকল পাপী থেকে অধিক পাপিষ্ঠ হও, তবুও জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হবে। অধিক পাপী কে? যে অনবরত নিযুক্ত সে অথবা যে এখন নিযুক্ত হবে সে? অতএব সদ্‌গৃহস্থ আশ্রম থেকেই কর্ম আরম্ভ হয়। সষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৩৭ থেকে ৪৫ এর মধ্যে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! শিথিল প্রযত্নশীল শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ পরমগতি লাভ না করে কোন গতি প্রাপ্ত হন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন! যোগ থেকে বিচলিত শিথিল প্রযত্নশীল পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ শ্রীমানদের ['শুচীনাম্'-শুদ্ধ (সত্য) আচরণযুক্ত যে সেই শ্রীমান্।] ঘরে জন্মগ্রহণ করে যোগীকুলে প্রবেশ পান, সাধনার দিকে আকর্ষিত হয়ে বহুজন্ম ধরে চলে সেই স্থানে পৌঁছে যান, যাকে পরমগতি, পরমধাম বলা হয়। শিথিল প্রযত্নশীল কে? যোগভ্রষ্ট হয়ে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? গৃহস্থই তো হন। সেখান থেকেই তিনি সাধনোন্মুখ হন। নবম অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে তিনি সাধুই; কারণ তিনি নিশ্চয় করে সঠিক পথে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অতি দুরাচারী কে? যিনি ভজনে প্রবৃত্ত তিনি অথবা সেই ব্যক্তি যে প্রবৃত্তই হয়নি। নবম অধ্যায়ের ৩২শ শ্লোকে বলেছেন— স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিযুক্তই হোক না কেন, আমাকে আশ্রয় করে সাধন করলে

পরমগতিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেননি যে, তাকে হিন্দু, খৃষ্টান অথবা মুসলমান হতে হবে। তিনি বলেছেন, অতি দুরাচারী পাতকী হোক না কেন, আমার শরণাগত হলে পরমগতিলাভ করে। অতএব গীতাশাস্ত্র মানুষ মাত্রের জন্য। সদ্গৃহস্থ আশ্রম থেকেই এই কর্ম আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ সেই সদ্গৃহস্থই যোগী হন, পূর্ণত্যাগী হন ও তত্ত্বের দিগ্দর্শন করে তাতেই প্রবেশ পান, যাঁর সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'জ্ঞানী আমারই স্বরূপ'।

নারী—গীতা অনুসারে মানবশরীর হ'ল বস্ত্রের সমান। ঠিক যেভাবে আমরা মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করি, সেইভাবেই সকল প্রাণীর শ্বামী জীবাত্মাও পুরনো শরীর (বস্ত্র) বর্জন করে নতুন দেহে (বস্ত্রে) প্রবেশ করে। আপনার কায়িক আকার পুরুষের হোক বা নারীর-তা শুধু জীবাত্মার পরিধেয় মাত্র।

জগতে পুরুষের শ্রেণী দুটি—ক্ষর ও অক্ষর। সকল প্রাণীর দেহ ক্ষর পুরুষ অথবা পরিবর্তনশীল পুরুষ। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যখন কুটস্থ হয়, তখন পুরুষ অক্ষর হন। সেই অক্ষর পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। এটা ভজনার অবস্থা-বিশেষ।

বিভিন্ন সময়ে সমাজে নারীজাতিকে সম্মান বা অসম্মানের চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু গীতার অপৌরুষেয় বাণীতে একথা উল্লিখিত—যেকোন জীবাত্মা তা সে শূদ্র (অল্পজ্ঞ) হোক, বৈশ্য (বিধিপ্রাপ্ত) হোক, স্ত্রী-পুরুষ যে কেউ আমার শরণাপন্ন হয়ে পরমগতি লাভ করে। তাই আধ্যাত্মিক পথে নারীজাতিরও পুরুষের পাশে সমান স্থান রয়েছে।

ভৌতিক সমৃদ্ধি—গীতাশাস্ত্র পরমকল্যাণকর, তার সঙ্গে মানুষের জন্য আবশ্যক ভৌতিক বস্তুগুলির বিধানও করে। নবম অধ্যায়ের ২০ থেকে ২২শ শ্লোকপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, বহুলোক নির্ধারিত বিধি দ্বারা আমাকে পূজা করে পরিবর্তে স্বর্গ কামনা করে, আমি তাদের বিশাল স্বর্গলোক প্রদান করি। যা চাইবে, আমি তা-ই দেব; কিন্তু উপভোগের পর ফুরিয়ে যাবে, কারণ স্বর্গের ভোগও নশ্বর। তাদের আবার জন্ম নিতে হবে। হ্যাঁ যেহেতু তারা আমার সঙ্গে যুক্ত, সেইজন্য তারা নষ্ট হবে না; কারণ আমি কল্যাণস্বরূপ। আমি তাদের ভোগবস্তু প্রদান করি ও ধীরে ধীরে সে সমস্ত থেকে নিবৃত্ত করে আবার তাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করি।

ক্ষেত্র—যে পরমাত্মার শ্রীমুখের বাণী এই গীতা, তিনি স্বয়ং পরিচয় দিয়েছেন যে, "**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**"- অর্জুন! এই দেহটাই ক্ষেত্র (খেত) এতে ভাল-মন্দ কর্মের যে বীজ বপন করা হয়, তা সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয় ও কালান্তরে সুখ-দু:খরূপ ভোগের রূপে তা লাভ হয়। আসুরী সম্পদ্ অধম যোনিতে জন্মের কারণ, কিন্তু দৈবী সম্পদ্ পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করতে সাহায্য করে। সদ্গুরুর সান্নিধ্য থেকেই এদের মধ্যে নির্ণায়ক যুদ্ধের আরম্ভ হয়, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-এর যুদ্ধ এটাই।

টীকাকারগণ বলেন- এক কুরুক্ষেত্র বহির্জগতে স্থিত ও অন্যটি মনের অন্তরালে, গীতাশাস্ত্রের একটা অর্থ বাহ্য , অন্যটা আন্তরিক; কিন্তু এরূপ নয়। বক্তা বলেন এক কথা; কিন্তু শ্রোতাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিষয়বস্তু ভিন্নভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে। সেইজন্য বহু অর্থ প্রতীত হয়। সাধন-পথে ক্রমশঃ চলে যে পুরুষই শ্রীকৃষ্ণের স্তরে পৌঁছবেন, তাঁর সম্মুখেও সেই দৃশ্যই হবে যা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ছিল। সেই মহাপুরুষই তাঁর মনোগত ভাবগুলি, গীতা শাস্ত্রের সংকেতগুলি বুঝতে পারবেন ও বোঝাতে পারবেন।

গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য জগতের চিত্রণ করে না। খাওয়া, পরা ও থাকা সম্বন্ধে আপনি অবগত। জীবনযাত্রার রীতি, মান্যতা, লোকরীতি-নীতিতে দেশকাল ও পরিস্থিতির অনুকূল পরিবর্তন প্রকৃতির অধীন। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি ব্যবস্থা দেবেন? কোথাও মেয়েদের বাহুল্য, সেখানে বহুবিবাহ হয়, আবার কোথাও তাদের সংখ্যা কম। সেখানে কয়েকজন ভাই একটিমাত্র মেয়েকে বিবাহ করে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ কি ব্যবস্থা দেবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে জনসংখ্যার ন্যূনতা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন সেখানে তিরিশটি সন্তানের জননীকে 'মাদারল্যাণ্ড' (দেশমাতা) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। বৈদিককালীন ভারতে দশটি সন্তান উৎপন্ন করার বিধান ছিল, এখন "এক অথবা দো বচ্চে, হোতে হ্যায় ঘরমেঁ আচ্ছে", সরকারী প্রচার অভিযান চলেছে। যদি তারা বেঁচে না-ও থাকল, তাতে চিন্তার কিছু নেই, সমস্যার সমাধানই হয়। শ্রীকৃষ্ণ এতে কি ব্যবস্থা দেবেন?

শ্রেয়—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি বিকারের সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য কোথাও বিদ্যালয় খোলা হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিকারসমূহের বিষয়ে বয়োবৃদ্ধদের থেকে ছোটরাই অনেক সময় বেশী প্রবীণ দেখা গেছে। এ বিষয়ে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি শিক্ষা দেবেন? এসব তো প্রকৃতিদ্বারা স্বচালিত। একসময় বেদ প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হত, ধনুর্বিদ্যা-গদাযুদ্ধ শেখানো হত, বর্তমানে এগুলি কে শিখতে চায়? আজকের যুগে পিস্তল চালাচ্ছে। স্বচালিত যন্ত্রের যুগ এটা। কখনও রথ-সঞ্চালন শেখার প্রয়োজন ছিল, ঘোড়ার বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে হত—আজকের যুগে মোটরের তেল পরিষ্কার করা হয়। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি বলবেন? পূর্বকালে স্বাহা বললে বর্ষা হত, আজকের যুগে বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণের সাহায্যে মনের মত ফসল উৎপাদন করা হয়। যোগেশ্বর বলছেন যে, প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের বশীভূত হয়ে মানুষ পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য স্থাপিত করে চলেছে। এই গুণগুলি স্বত-ই তাদের গড়ে নিতে সক্ষম। ভৌতিকশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি মানুষ রচনা করতেই থাকে। একটা বস্তুই এমন, যা মানুষ জানে না, চেনে না, আছে তার কাছেই; কিন্তু সে সম্বন্ধে সে বিস্মৃত। গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করে অর্জুনের স্মৃতিলাভ হয়েছিল। সেই স্মৃতি হল পরমাত্মার স্মৃতি, যা হৃদয়-দেশে থাকলেও বহুদূরে আছে। মানুষ তা-ই পেতে চায়; কিন্তু পথ খুঁজে পায়না। কেবল কল্যাণের পথ সম্বন্ধে মানুষ অনভিজ্ঞ। মোহ-এর আবরণ এত ঘন যে, সে বিষয়ে চিন্তা করার সময়ই জোটে না। সেই মহাপুরুষ আপনার জন্য সময় দিয়েছেন, সেই কর্ম স্পষ্ট করেছেন, যার অনুষ্ঠান করার নির্দেশ গীতাশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। গীতা মুখ্যতঃ এটাই প্রদান করে। ভৌতিক বস্তুও লাভ হয়; কিন্তু শ্রেয়-এর তুলনায় প্রেয় নগণ্য।

যোগপ্রদাতা—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে, কল্যাণপথের পরিচয়, এর সাধন ও প্রাপ্তি সদ্‌গুরু দ্বারাই সম্ভব। তীর্থভ্রমণ, এদিক্-সেদিক্ ভ্রান্ত হয়ে ঘুরলে অথবা কায়-ক্লেশ দ্বারাও সেই কল্যাণপথের জ্ঞান ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ কোন সন্তদ্বারা নির্দেশিত না হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অর্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হয়ে উত্তমরূপে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে, নিষ্কপটভাবে সেবা করে, প্রশ্ন করে সেই জ্ঞান লাভ কর। প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হল, কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্য এবং তাঁর সেবা। তাঁর অনুসারে চলে যোগের সংসিদ্ধিকালে সেই তত্ত্বলাভ হবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, জ্ঞান অর্থাৎ জানার বিধি ও জ্ঞেয় পরমাত্মা তিনটিই কর্মের প্রেরক। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে মহাপুরুষই কর্মের মাধ্যম, কেবল পুস্তক নয়। পুস্তকে বিধি মাত্র থাকে। ঔসুধের বিবরণ লিখিত কাগজে পড়লেই যেমন রোগ

আরোগ্য হয় না, বরং নিয়ম মেনে চলতে হয়।

নরক—ষোড়শ অধ্যায়ে ১৬শ শ্লোকে আসুরী সম্পদের বর্ণনা করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, বহু চিত্তবিভ্রান্ত, মোহজালে আবৃত আসুরী স্বভাবযুক্ত মানুষ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, নরক কিরূপ ও কাকে বলে? এই ক্রমেই স্পষ্ট করেন যে, যারা আমাকে দ্বেষ করে, সেই নরাধমদিগকে আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত করি, অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। এটাই নরক। নরকের দ্বার কি? বলছেন—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ। এদের সাহায্যেই আসুরী সম্পদের গঠন হয়। অতএব বারংবার কীট-পতঙ্গ, পশু ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করাই নরক।

পিণ্ডদান—প্রথম অধ্যায়ে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন আশঙ্কিত হয়েছিলেন যে, যুদ্ধজনিত নরসংহারে পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডদান ও তর্পণ থেকে বঞ্চিত হবেন, নরকে পতিত হবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! এই অজ্ঞান তোমার কোত্থেকে উৎপন্ন হল? পিণ্ডোদক ক্রিয়াকে যোগেশ্বর অজ্ঞান বলেছেন ও আরও বলেছেন যে, যেরূপ জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্রত্যাগ করে মানুষ নতুন বস্ত্র ধারণ করে ঠিক সেইরূপ এই আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে তৎকাল দেহরূপ নতুন বস্ত্র ধারণ করে। এখানে দেহটা বস্ত্রমাত্র এবং যখন আত্মা কেবল বস্ত্র পরিবর্তন করলেন তখন তাঁর মৃত্যু হল কোথায়? নশ্বর দেহটাই শুধু পরিবর্তন করেছেন, তাঁর ব্যবস্থা পূর্ববৎ থাকল, তবে এই ভোজন (পিণ্ডদান), আসন, শয্যা, বাহন, আবাস অথবা জল ইত্যাদি দ্বারা কাকে তৃপ্ত করা হয়? এই কারণেই এগুলিকে যোগেশ্বর অজ্ঞান বলেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে এর উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই আত্মা আমার সনাতন অংশ, স্বরূপ এবং মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্যকলাপজন্য সংস্কার আকর্ষণ করে অন্যদেহ ধারণ করে ও মনসহিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়দ্বারা নতুন দেহে বিষয়-ভোগসমূহ উপভোগ করে। আত্মা যখন অন্যদেহ ধারণ করে তখন সেখানেও ভোগ-সামগ্রী থাকেই, তাহলে পিণ্ডদান কেন করা হয়? এদিকে দেহত্যাগ, অন্যদিকে নতুন দেহ ধারণ, আত্মা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহে প্রবেশ করে, মাঝে বিরামের কোন স্থান নেই, তাহলে হাজার হাজার পিতৃগণের অনাদিকাল ধরে পতিত থাকার কল্পনা ও তাদের জীবিকা বংশ-পরম্পরার হাতে নির্ধারিত করে এবং খাঁচার পাখীর মত তাদের ক্রন্দন, পতন অজ্ঞানেরই পরিচয় মাত্র। তা-ই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একে অজ্ঞান বলেছেন।

পাপ ও পুণ্য—এই বিষয়ে সমাজে বহুভ্রান্তি প্রচলিত; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে রজোগুণজাত এই কাম ও ক্রোধ, ভোগ-উপভোগ করে কখনও তৃপ্ত হয় না, দু:খদায়ক। অর্থাৎ কাম হল পাপের একমাত্র কারণ। পাপের উদ্‌গম কাম অর্থাৎ কামনাসমূহ। এই কামনাগুলি থাকে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধিকে কামনার বাস-স্থান বলা হয়। যখন বিকার দেহে থাকে না মনে থাকে, তখন দেহটাকে ধুয়ে কি হবে?

শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে নামজপদ্বারা, ধ্যানদ্বারা, সমকালীন কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবাদ্বারা, তাঁর প্রতি সমর্পণের ভাবদ্বারা মন শুদ্ধ হয়, তার জন্য তিনি ৪/৩৪-এ প্রোৎসাহিত করেছেন যে, '**তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন**' সেবা ও প্রশ্ন করে সেই জ্ঞানলাভ কর, যার দ্বারা সকল পাপনাশ হয়।

অধ্যায় ৩/১৩-তে তিনি বলেছেন যে, সন্তগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন এবং যারা দেহের জন্য অন্নপাক করে, সেই পাপাচারীগণ পাপান্ন ভোজন করে। এখানে যজ্ঞ চিন্তনের একটি নিশ্চিত ক্রিয়া, যার দ্বারা মনের মধ্যে নিহিত চরাচর জগতের সংস্কার ভস্ম হয়ে যায়। শুধু ব্রহ্মই থাকেন। অতএব দেহের উৎপত্তির কারণ হল পাপ এবং যা সেই অমৃত তত্ত্ব প্রদান করে, যারপর আর দেহধারণ করতে হয় না, তা-ই পুণ্য।

অধ্যায় ৭/২৯-এ তিনি বলেছেন যে, যাঁরা জরামৃত্যু এবং দোষ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমার শরণাগত হয়ে সাধনা করেন, যে পুণ্যকর্মা পুরুষগণের পাপনাশ হয়েছে, তাঁরা সম্পূর্ণ ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ কর্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম এবং উত্তমরূপে আমাকে জানেন ও জেনে আমাতেই স্থিত থাকেন। অতএব পুণ্যকর্ম তা-ই যা জরা-মৃত্যু ও দোষ থেকে মুক্ত করে শাশ্বতের অনুভূতি ও তাতেই সর্বদার জন্য স্থিতি প্রদান করে। যে কর্ম জন্ম-মৃত্যু, জরা-মরণ, দুঃখ-দোষের পরিধির মধ্যেই ঘোরাতে থাকে সেই কর্মকে পাপকর্ম বলে।

অধ্যায় ১০/৩-এ বললেন—যিনি আমাকে জন্ম-মৃত্যুরহিত, আদি-অন্তরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করে অবগত হন, মরণধর্মা মনুষ্য মধ্যে সেই পুরষই জ্ঞানবান্, এইরূপ জেনে তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। অতএব সাক্ষাৎকারের পরেই সর্বপাপ থেকে নিবৃত্তি হয়।

সারাংশতঃ বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণই পাপ, ও তার থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত পরমাত্মার দিকে এগিয়ে দেয়, পরমশান্তি প্রাপ্ত করায়, তা-ই পুণ্যকর্ম। সত্য বলা, কেবল স্ব উপার্জিত অন্নগ্রহণ, স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব, সত্যতা ইত্যাদিও এই পুণ্যকর্মের সহায়ক অঙ্গ; কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট পুণ্য হল পরমাত্মার প্রাপ্তি। যা একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাকে ভঙ্গ করে, তা-ই পাপ।

সকল সন্তই এক–গীতা, অধ্যায় ৪/১-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কল্পের আদিতে এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণপূর্বকালীন অথবা অন্য কোনও শাস্ত্রে কৃষ্ণের নামোল্লেখ নেই।

বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ যোগেশ্বর ছিলেন। তিনি অব্যক্ত ও অবিনাশীভাবের স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ। যখনই পরমাত্ম-প্রাপ্তির ক্রিয়া অর্থাৎ যোগের সূত্রপাত করা হয়েছে, তখন তা স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষই করেছেন, তা তিনি রাম হোন অথবা ঋষি জরথুস্ত্র। পরবর্তীকালে এই উপদেশই যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, গুরুনানক ইত্যাদি যার দ্বারাই বলা হয়েছে, তা শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন।

অতএব সকল মহাপুরুষই এক। সকলেই এক বিন্দুর স্পর্শ করে একটাই স্বরূপ লাভ করেন। এই পদ একটি একক। বহুপুরুষ এই পথে গমন করবেন কিন্তু যখন লাভ করবেন, তখন সকলেই এক পদলাভ করবেন। এরূপ অবস্থাযুক্ত সন্তের দেহ বাস-স্থান মাত্র, তিনি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। এরূপ স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ যখনই কিছু বলেছেন, তখন তা সেই এক যোগেশ্বরই বলেছেন।

সন্তপুরুষ কোন না কোন স্থানে জন্মগ্রহণ তো করেনই। পূর্ব অথবা পশ্চিমে, শ্যাম অথবা শ্বেত পরিবারে, পূর্ব প্রচলিত কোন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অথবা অবোধ যাযাবর পরিবারে, গরীব অথবা ধনীর গৃহে জন্ম নিয়েও সন্তপুরুষ পরিবারের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হয় না। তিনি নিজের লক্ষ্য পরমাত্মাকে অবলম্বন করে স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান ও শেষে তা-ই হন। তাঁদের উপদেশ জাতি-ভেদ, বর্গ-ভেদ ও ধনী-গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এমনকি তাঁদের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষের ভেদও থাকে না। (দেখুন গীতা-১৫/১৬-"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে।")

মহাপুরুষগণের দেহত্যাগের পর তাঁদের অনুগামীগণ স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কোন মহাপুরুষের অনুগামীগণ ইহুদী হয়, কারও

খৃষ্টান, মুসলমান, সনাতনী ইত্যাদি হয়ে যায়; কিন্তু এই বিভেদের সঙ্গে সন্তের কোন সম্পর্ক থাকে না। সন্ত কোন সম্প্রদায় অথবা জাতি নন। সন্ত, সন্তই হন। তাঁদের কোন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়।

অতএব সম্পূর্ণ সংসারের সন্তদের, তা যে কোন সম্প্রদায়েই তাঁর জন্ম হোক না কেন, কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর বেশীই পূজা করুন না কেন, কোন সাম্প্রদায়িক প্রভাবে এসে এরূপ সন্তদের আলোচনা করা উচিত নয়; কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ। সংসারে যে কোন স্থানে উৎপন্ন হোন, সন্ত নিন্দার যোগ্য নন। যদি কেউ এরূপ করে, তাহলে সে অন্তরে স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দুর্বল করে, স্বীয় পরমাত্মা থেকে দূরে সরে যায়, স্বয়ং নিজের ক্ষতি করে। সংসারে জাত কোন ব্যক্তি যদি সত্যই আপনার হিতৈষী, তাহলে সন্তই সেই ব্যক্তি-বিশেষ হবেন। অতএব তাঁদের প্রতি সহৃদয় হওয়া সম্পূর্ণ সংসারের লোকেদের মূলকর্তব্য। এর থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া।

বেদ—গীতাশাস্ত্রে বেদের উদাহরণ অনেকবার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এই সকল পথ-প্রদর্শক চিহ্ন (Mile Stone) মাত্র। গন্তব্যে উপনীত ব্যক্তির জন্য এই পথ-প্রদর্শক চিহ্ন এর উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়। অধ্যায় ২/৪৫-এ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন! বেদ ত্রিগুণ পর্যন্তই আলোকপাত করতে পারে, তুমি বেদের কার্যক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে ওঠ। অধ্যায় ২/৪৬-এ বলেছেন—পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুসের ছোট জলাশয়ের যতটা প্রয়োজন থাকে; তদ্রূপ উত্তম প্রকার ব্রহ্মজ্ঞাতা মহাপুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বেদের ততটাই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য এর উপযোগিতা থাকেই। অধ্যায় ৮/২৮-এ বলেছেন—অর্জুন! আমাকে তত্ত্বসহিত উত্তম প্রকারে অবগত হওয়ার পরে যোগী বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদির পুণ্যফল অতিক্রম করে সনাতন পদলাভ করেন। অর্থাৎ যতক্ষণ বেদ জীবিত, যজ্ঞ অসম্পূর্ণ, ততক্ষণ সনাতন পদলাভ করা সম্ভব নয়। অধ্যায় ১৫/১-এ বলেছেন—ঊর্ধ্বে পরমাত্মা যার মূল, নিম্নে কীট-পতঙ্গপর্যন্ত প্রকৃতি যার শাখা-প্রশাখা, এই সংসার সেইরূপ অশ্বত্থরূপ অবিনাশী বৃক্ষ। যিনি এই বৃক্ষকে মূলসহিত জানেন, তিনিই বেদের জ্ঞাতা। একে অবগত হওয়ার একমাত্র স্রোত মহাপুরুষ, তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট ভজন। পুস্তক অথবা পাঠশালাও তাঁর দিকেই প্রেরণ করে।

ওঁ–শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মত ওঁ জপ করার বিধান পাওয়া যায়। অধ্যায় ৭/৮-এ বলেছেন–ওঁকার আমি। ৮/১৩-এ বলেছেন–ওঁ জপ ও আমার চিন্তন কর। অধ্যায় ৯/১৭-এ বলেছেন–জানার যোগ্য পবিত্র ওঁকার আমি। অধ্যায় ১০/৩৩-এ বলেছেন–আমি অক্ষরসমূহতে অকার। ১০/২৫-এ বলেছেন–শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর। অধ্যায় ১৭/২৩-এ বলেছেন–ওঁ, তৎ ও সৎ ব্রহ্মের পরিচায়ক। ১৭/২৪-এ বলেছেন–যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম ওঁ থেকে আরম্ভ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে ওঁ জপ করা নিতান্ত আবশ্যক, এর বিধি স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের কাছ থেকে অবগত হোন।

গীতোক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি–গীতা আদিমানব মহারাজ মনুরও পূর্বে উদ্ভাসিত হয়েছিল-'**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।**' (৪/১) অর্জুন! আমি এই অবিনাশী যোগ-সম্বন্ধে কল্পারম্ভে সূর্যকে বলেছিলাম এবং সূর্য মনুকে বলেছিলেন। মনু তা স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন, কারণ শ্রবণ করার পর বিষয়-বস্তু স্মৃতিতেই সুরক্ষিত করে রাখা সম্ভব ছিল। এই জ্ঞান সম্বন্ধেই মনু রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ইক্ষ্বাকুর কাছ থেকে পরবর্তীকালে রাজর্ষিগণ জানতে পারেন এবং এই মহত্ত্বপূর্ণ কালে এই অবিনাশী যোগ এই পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আদিকালে বক্তার কাছে শ্রবণ করে তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার পরম্পরার ছিল। লিপিবদ্ধ করে রাখার কথা কল্পনার বাইরে ছিল। মনু মহারাজ এই জ্ঞান স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন এবং স্মৃতি-পরম্পরার প্রবর্তন করেছিলেন। অতএব এই গীতোক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি।

এই জ্ঞান-সম্বন্ধে ভগবান মনুরও পূর্বে সূর্যকে বলছিলেন, তবে কেন এই স্মৃতিকে 'সূর্যস্মৃতি' বলা হয় না? বস্তুতঃ সূর্য জ্যোতির্ময় পরমাত্মার সেই অংশ, যার থেকে মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিই পরমচেতন বীজরূপ পিতা এবং প্রকৃতি গর্ভধারিণী মাতা।" বীজরূপ পিতা সূর্য। পরমাত্মার সেই প্রশক্তি সূর্য, যে শক্তি মানুষ সৃষ্টি করেছে। এই শক্তি ব্যক্তি-বিশেষ নয়। পরমাত্মার জ্যোতির্ময় তেজ থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। সেই তেজের মাধ্যমেই গীতোক্ত জ্ঞানও প্রসারিত করেছেন অর্থাৎ সূর্যকে বলেছেন। সূর্যপুত্র মনুকে তা বলেছেন, সেইজন্য এটি 'মনুস্মৃতি'। এখানে সূর্যের তাৎপর্য ব্যক্তি-বিশেষ নয়, বীজকে সূর্য বলা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন! সেই পুরাতন যোগসম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। তুমি আমার প্রিয়ভক্ত, অনন্য সখা। অর্জুন মেধাবী এবং যোগ্য ছিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তিনি একটার পর একটা প্রশ্ন করে গিয়েছিলেন। যেমন—আপনার জন্ম অনেক পরে হয়েছে এবং সূর্যের জন্ম বহুপূর্বে হয়েছিল। যোগসম্বন্ধে আপনিই সূর্যকে বলেছিলেন, তা কিরূপে বুঝব? এইরূপ কুড়ি-পঁচিশটি প্রশ্ন তিনি করেছিলেন। গীতার সমাপনপর্যন্ত তাঁর সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গিয়েছিল। যে প্রশ্ন অর্জুন করতে পারেননি সে সকল প্রশ্নের সমাধান ভগবান স্বয়ং করেছেন। অতপর ভগবান বললেন—অর্জুন! তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ করেছ? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহের বিনাশ হল কি? এই প্রসঙ্গে অর্জুন বলেছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ৎবৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।১৮/৭৩।।

ষভগবন্! আমার মোহনাশ হয়েছে এবং স্মৃতিলাভ হয়েছে। কেবল শ্রবণ করিনি বরং স্মৃতিতে ধারণ করেছি। আমি আপনার আজ্ঞাপালন করব, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। তিনি ধনুর্ধারণ করেছিলেন, যুদ্ধ হয়েছিল, বিজয়ী হয়ে, বিশুদ্ধ ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন এবং একমাত্র ধর্মশাস্ত্ররূপে আদি ধর্মশাস্ত্র গীতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গীতা আদি ধর্মশাস্ত্র। এটাই মনুস্মৃতি, যা অর্জুন নিজের স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। মনুর দুটি কৃতির উল্লেখ রয়েছে, প্রথমতঃ পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত গীতা, দ্বিতীয়তঃ বেদ মনুর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েছিল। তৃতীয় কোন কৃতি মনুর কালে ছিল না। সেইকালে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রচলন ছিল না, কাগজ, কলমের প্রচলন ছিল না, সেইজন্য জ্ঞান শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণ করে স্মৃতিতে সুরক্ষিত করে রাখার পরম্পরা ছিল। সৃষ্টির প্রথম মানুষ মনু মহারাজ যাঁর থেকে অন্যান্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে তিনি বেদকে শ্রুতি এবং গীতা শাস্ত্রকে স্মৃতির সম্মান দিয়েছেন।

বেদ মনুর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েছিল। বেদ শ্রবণযোগ্য, শ্রবণ করুন। যদি পরবর্তীকালে ভুলেও যান কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু গীতা স্মৃতিগ্রন্থ, সর্বদা স্মরণ রাখবেন। এই গ্রন্থ শাশ্বত জীবন, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন জীবন প্রদানকারী ঈশ্বরীয় গায়ন।

ভগবান বলেছেন—অর্জুন! যদি তুমি অহংকারবশতঃ আমার উপদেশ শ্রবণ না কর তবে বিনষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ গীতার উপদেশ যে অবহেলা করে, তার নাশ হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক (১৫/২০)-এ ভগবান বলেছেন, **'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।'**— এইরূপ অতিগোপনীয় শাস্ত্র আমার দ্বারা বলা হল। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে তুমি পূর্ণজ্ঞান এবং পরমশ্রেয় লাভ করবে। ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের অন্তিম দুটি শ্লোকে বলেছেন—**'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।'** এই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিহিতের আচরণ করেন না অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি সিদ্ধিলাভের যোগ্য নন। সুখ, সমৃদ্ধি কিছু লাভ করতে পারেন না।

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।' অতএব অর্জুন! কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে যে-'কি করা উচিত-কি করা উচিত নয়, শাস্ত্রই এ বিষয়ে তোমার জ্ঞাপক। অতএব শাস্ত্রবিধির স্বরূপ জেনে তোমার নিয়ত কর্ম করা উচিত। তুমি তাহলে আমাকে লাভ করবে এবং শাশ্বত জীবন, শান্তি এবং সমৃদ্ধিলাভ করবে।

গীতাশাস্ত্রই মনুস্মৃতি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে গীতাই ধর্মশাস্ত্র। অন্য কোন গ্রন্থকে শাস্ত্র অথবা স্মৃতি বলা যেতে পারে না। সমাজে প্রচলিত বহু স্মৃতিগ্রন্থ গীতা বিস্মৃত হওয়ারই দুষ্পরিণাম। প্রচলিত অন্যান্য স্মৃতি কিছু রাজার সংরক্ষণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা সমাজে উঁচু-নীচু, জাতিভেদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এটা বজায় রাখার উপায়-বিশেষ। মনুর নামে প্রচারিত এবং কথিত মনুস্মৃতিতে মনুকালীন সমাজ-ব্যবস্থার চিত্রণ নেই। মূল মনুস্মৃতি গীতা একমাত্র পরমাত্মাকে সত্য বলে, তাঁতে বিলীন করিয়ে দেয়; কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত প্রায় ১৬৪ টি স্মৃতিতে পরমাত্মাকে লাভ করার উপায়ের উপর আলোকপাত করা হয়নি এমনকি পরমাত্মার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখায়। 'ন অস্তি'-যেগুলির অস্তিত্ব নেই সে সমস্ত লাভেরই জন্য প্রোৎসাহিত করে। স্মৃতিগুলিতে মোক্ষ-এর উল্লেখপর্যন্ত নেই।

মহাপুরুষ—মহাপুরুষ বাহ্য ও আন্তরিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক, লোক-রীতি ও যথার্থ বেদ-রীতি দুটিই জানেন। এই কারণেই সমস্ত সমাজকে মহাপুরুষগণ আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির বিধান দিয়েছেন এবং একটা মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়েছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর স্বামী, মহাত্মা বুদ্ধ, মূসা, যীশু, মহম্মদ, রামদাস, দয়ানন্দ, গুরু গোবিন্দ সিংহ ও এইরূপ সহস্র

মহাপুরুষ-এইরূপ করেছেন; কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সাময়িক। পীড়িত সমাজকে ভৌতিক বস্তু প্রদান করলে, তারা স্থায়ীরূপে লাভান্বিত হতে পারে না। এই ভৌতিক উপলব্ধি ক্ষণস্থায়ী, শাশ্বত নয়। সেইজন্য সে সকলের সমাধানও তৎসাময়িক হয়। তা চিরন্তন ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

ব্যবস্থাকার – সমাজে প্রচলিত কুরীতিগুলি মহাপুরুষগণ দূর করেন। এগুলির সমাধান না করলে জ্ঞান-বৈরাগ্যজাত পরম-এর সাধনা সম্বন্ধে কে শুনবে? মানুষ যে পরিবেশে রয়েছে, সেখান থেকে তার মনকে সরিয়ে যথার্থ কি, তা অবগত হওয়ার অবস্থাতে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন উপায়ে আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। এই অভিপ্রায়ে মহাপুরুষগণ যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন, কোন বিধান দেন, তা ধর্ম নয়। এই বিধান একশ, দু'শ বছর পর্যন্ত চলে, চার ছ'শ বছরের জন্য উদাহরণ হয়ে যায় এবং হাজার দু' হাজার বছরের মধ্যে নতুন পরিস্থিতিতে সেই সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গুরু গোবিন্দ সিং-প্রদত্ত ব্যবস্থানুসারে শস্ত্র ধারণ অনিবার্য, কিন্তু এখন শস্ত্রের স্থানে তরবারি বেমানান। যীশু গাধার পিঠে বসতেন (মত্তী ২১) গাধার সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, বর্তমানে এর উপযোগিতা কি? তিনি বলেছিলেন কারও গাধা চুরি কোরো না। বর্তমানে ক'জন গাধা পোসে। এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎকালীন সমাজকে সর্বপ্রকারে ব্যবস্থিত করেছিলেন, এর উল্লেখ মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে করা হয়েছে, এই সঙ্গে গ্রন্থগুলিতে তিনি যথার্থের ও যত্র-তত্র চিত্রণ করেছেন। পরমকল্যাণকর সাধনা ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ গুলিয়ে ফেললে লোকে তত্ত্ব নির্ণায়ক ক্রম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না। সামাজিক ব্যবস্থাগুলিকে সমাজ প্রয়োজনের অতিরিক্তই মেনে চলে; কারণ তা জাগতিক। "মহাপুরুষ বলেছেন"–এইরূপ বলে এই ব্যবস্থাগুলি যাতে ত্যাগ করতে না হয়, তারজন্য মহাপুরুষগণের দোহাই দেয়। মহাপুরুষ প্রদত্ত বাস্তবিক ক্রিয়া নিজেদের সুবিধে মত পরিবর্তন করে, সেই ক্রিয়া ভ্রান্তিযুক্ত করে দেয়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, কোরান প্রত্যেকটিতে শুধু ভ্রান্ত, যুক্তিহীন, ধারণা রয়ে গেছে। বহির্মুখী সমাজ এই গ্রন্থগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে পারে না। এই কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত ধাম, অনন্তজীবন, শাশ্বত শান্তি প্রদায়িনী গীতাশাস্ত্রকে জাগতিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করেছেন। ভারতের বৃহৎ ইতিহাস এবং মহত্ত্বপূর্ণ সংস্কৃতি শাস্ত্র হল মহাভারত। তিনি এই বৃহৎ ইতিহাসের মাঝেই গীতাশাস্ত্রের গায়ন করেছেন। যাতে

উত্তরপুরুষেরা এই ধর্মশাস্ত্রকে ধার্মিক ধরাতলে যথাবৎ বুঝতে পারে। কালান্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি এবং আরও বহু মহাপুরুষ পরমশ্রেয় লাভের যথার্থ বিধিকে সামাজিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে প্রস্তুত করেছেন।

গীতা মানুষ মাত্রের জন্য- ভগবান এই ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ **'প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে' (গীতা, ১/২০)** শস্ত্র-সঞ্চালনের সময়ই করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন জীব-জগতে কখনও শান্তি এবং সুখ লাভ হয় না। কেউ যদি অর্বুদ লোকের হত্যা করে জয়লাভ করেও তবুও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না এবং শেষে দু:খপ্রদই হবে, সেইজন্য তিনি গীতা শাস্ত্রের মাধ্যমে এইরূপ শাশ্বত যুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন; এতে একবার জয়লাভ করলে শাশ্বত বিজয়, অনন্ত জীবন এবং অক্ষয়ধাম লাভ হয়, যা মানুষমাত্রের জন্য সর্বদা সুলভ; যা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এর যুদ্ধ, প্রকৃতি এবং পুরুষের সংঘর্ষ, অন্তরে অশুভ এর নাশ এবং শুভ পরমাত্মস্বরূপের প্রাপ্তির সাধন।

উত্তম অধিকারীর প্রতিই শ্রীকৃষ্ণ একে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন যে, তোমার মত অতিশয় প্রিয় ভক্তের হিত কামনায় বলব। এ বিষয় অতি গোপনীয়। শেষে তিনি বললেন, যে ভক্ত নয়, তাকে ভক্তে রূপান্তরিত করে তবে তাকে বোলো। মানুষ মাত্রের জন্য যথার্থ কল্যাণের একমাত্র উপায়, যার ক্রমবদ্ধ বর্ণনা হল শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতাশাস্ত্র।

প্রস্তুত টীকা—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রসারিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অর্থ যথাবৎ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত টীকার নাম 'যথার্থ গীতা'। এই ভগবানের অন্ত:প্রেরণা উপর আধারিত। গীতা স্বয়ং পূর্ণ সাধনগ্রন্থ। সম্পূর্ণ গীতাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। বোধগম্য না হওয়ার জন্য সন্দেহ জাগতে পারে। অতএব কোথাউ বোধগম্য না হলে কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে বোঝার প্রয়াস করুন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!